হাকিমুল উম্মত মাওলানা
আশরাফ আলী থানবী রচিত

মুফতি মুহাম্মদ জায়েদ মাজাহেরি নাদভী সংকলিত
আতাউর রহমান খসরু অনুদিত

'মাহফিল' / 'দিলরুবা' কর্তৃক সম্পাদিত

মুসলিম বর-কণে
ইসলামী বিয়ে

আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

সঙ্কলনঃ মুফতি মোহাম্মদ জায়েদ মাজাহেরি নাদভী

অনুবাদঃ আতাউর রহমান খসরু

মুসলিম
বর-কনে
ইসলামিবিয়ে

মুসলিম বর-কণে

ইসলামী বিয়ে

সংকলকের কথা

মুফতি মোহাম্মদ জায়েদ মাজাহেরি নাদভি

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ— মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ সবার জীবনে বিয়ে-শাদি আসে। বর্তমানে বিয়ে নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। ধনী-দরিদ্র, ধর্মমুখী-ধর্মহীন সবাই বিয়ে নিয়ে চিন্তিত। বিয়ে-শাদিকেই মানবজীবনের সবচেয়ে বড়ো চিন্তার কারণ মনে করা হয়। দরিদ্রের প্রসঙ্গ না হয় বাদই দিলাম, ধনীর বিয়েতে যা কিছু হয় এবং যে পরিমাণ ঝামেলা পোহাতে হয়, তা তারাই ভালো জানে।

ইসলাম বিয়েকে সবচেয়ে ঝামেলামুক্ত সহজ কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। হজরত রাসুলেকারিম [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও হজরত সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] ঝামেলামুক্ত সহজ বিয়ের দৃষ্টান্তস্থাপন করে গেছেন। অথচ আজ বিয়ে সবচেয়ে কঠিন ও ঝামেলার কাজে পরিণত হয়েছে।

বিয়ে মূলত একটি আনন্দের বিষয় কিন্তু আজ তা বিপদ ও দুশ্চিন্তার উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতো যুবতী গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করছে, কতোজন আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিচ্ছে আর কতো ধনীপিতা কন্যাসন্তান জন্মের কথা শুনে তেলে-বেগুনে গরম হয়ে উঠছে; শুধু কন্যাসন্তান প্রসবের অপরাধে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে। পরিতাপের বিষয়! এ যুগেও কন্যাসন্তান প্রসব করা বিপদের কারণ ও অপরাধ রয়ে গেছে।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

"তাদেরকে যখন কন্যাসন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন রাগে তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়।"

প্রাক-ইসলামযুগে কাফেরদের যেঅবস্থা ছিলো আজকের পরিস্থিতি তার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। এর একমাত্র কারণ, মেয়ে হওয়া মানেই এখন তাকে বিয়ে দেয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে। আর বিয়ে মানে ভূরিভোজ। মেয়ের পাত্র নির্বাচন ও তার মাপকাঠি নির্ধারণ, মেয়ে সাজিয়ে দেয়ার চিন্তা, বংশ ও বংশের লোকদের সন্তুষ্টি, তাদেরকে দাওয়াতপ্রদানে সতর্কতা, বিভিন্ন সামাজিক প্রচলন রক্ষা করা, বিয়েতে পানির মতো পয়সা উড়ানো এখন আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দরিদ্রমানুষের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? শুধু দরিদ্র কেনো ধনাঢ্যব্যক্তিরাও এ ধরনের ঝামেলা থেকে রেহাই পান না। মোটকথা, বিয়ে-শাদি নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আজ অস্থির ও চিন্তিত। কারণ, আমরা বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা, শরিয়তের শিক্ষা, রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও সাহাবায়ে কেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর আদর্শ ও দৃষ্টান্ত ভুলে গেছি। বিয়ের সময় আমরা খেয়াল করি না বিয়ের ইসলামি

রীতি কী। বিয়ের সময় রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কর্মপন্থা ও আদর্শ কী। যখন ইসলামি শরিয়ত পূর্ণতালাভ করেছে এবং যেধর্মে শুধু ইবাদত নয় বরং লেনদেন ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে নির্দেশনা পাওয়া যায় তখন একজন দীনদার মুসলমান কীভাবে তা থেকে বিমুখ হতে পারে। কেননা দীন শুধু নামাজ পড়া আর রোজা রাখার নাম নয় বরং বিয়ে-শাদিও ইবাদত ও দীনের অংশ। এ ক্ষেত্রেও রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর আদর্শ অনুসরণ করা আবশ্যক।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তমআদর্শ।"

আজ রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর উত্তমআদর্শ পরিহার করার কারণেই সমস্ত পৃথিবীতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আজ দীন-শরিয়তের পরিবর্তে মানবরচিত প্রচলনকেগ্রহণ করা হয়েছে। যার কারণে আমাদের পরকালতো নষ্ট হয়েছেই ইহকালও নষ্ট হয়েছে। আরো কতোরকম অস্থিরতা আমাদের জীবনকে গ্রাস করেছে।

বিয়ে-শাদি বিষয়ে শরিয়তবেত্তা মনীষীগণও বিভিন্ন বই লিখেছেন।

'ইসলামি বিয়ে'তে কোরআন-হাদিস ও যুক্তির আলোকে বিয়ের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিয়ের ধর্মীয় উপকারিতা, সম্পদ ও বংশের বিবেচনা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও তার ভিত্তি, বরযাত্রী, যৌতুক, ওলিমা [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] ইত্যাদি প্রচলন সম্পর্কে বিস্তারিত ও গঠনমূলক আলোচনা পাবেন। এই বইটি মূলত হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর বিভিন্ন বাণী, উপদেশ, রচনার নির্বাচিত একটি সংকলন। অধম যা অনেক পরিশ্রম করে বিন্যস্ত করেছে। আল্লাহর দরবারে আশা, বিয়ে বিষয়ে বইটি অত্যন্ত গঠনমূলক ও উপকারী হবে।

যারা কোরআন ও হাদিসের নীতি-আদর্শ মেনে বিয়ে করবে তারা পৃথিবীতেও সুখ-শান্তিতে জীবনযাপন করবে পরকালেও উত্তম প্রতিদানলাভ করবে। অমুসলিমরাও যদি ইসলামের নীতি অনুসরণ করেন তবে তারা জাগতিক সুখলাভ করবে। বইটি ঘরে ঘরে ও প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের হাতে পৌঁছানো প্রয়োজন। যেহেতু মানুষ উর্দুভাষা সম্পর্কে কম জানেন তাই অন্যভাষায় অনূদিত হলে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবে। আল্লাহতায়ালা এই সংকলনটি গ্রহণ করুন এবং তা মুসলিমজাতির সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য নিয়ামক করুন! আমিন!!

মুসলিম বর-কণে

ইসলামী বিয়ে

সূচি

অধ্যায় ॥ ১ ॥

অধ্যায় ॥ ৩ ॥

● বিধবানারীর আলোচনা

অধ্যায় ॥ ৪ ॥

● কুফু বা সমতাবিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অধ্যায় ॥ ৫ ॥

• পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অধ্যায় ॥ ৬ ॥

• বিয়ের আগে দোয়া ও ইস্তেখারার প্রয়োজনীয়তা

অধ্যায় ॥ ৯ ॥

অধ্যায় ॥ ১০ ॥

অধ্যায় ॥ ১১ ॥

• মহর

অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

● নারী ও প্রথাপালন

প্রথম পরিচ্ছেদ

অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

অধ্যায় ॥ ২০ ॥

অধ্যায় ॥ ২১ ॥

অধ্যায় ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলিম বর-কণে

ইসলামী বিয়ে

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস

১. "হজরত আবুনাজি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, তোমাদের মধ্যে যেব্যক্তি বিয়ের সামর্থ রাখে অথচ বিয়ে করে না তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" [তারগিব]

২. "হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যখন কোনো বান্দা বিয়ে করলো তখন তার দীনদারির [ধর্মপালনের] অর্ধেক পূর্ণ করলো। এখন বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় পাওয়া প্রয়োজন।" [তারগিব]

৩. "হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণদানে সক্ষম তার বিয়ে করে নেয়া উচিত। কেননা বিয়ে দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান পবিত্র রাখে। আর যে ভরণ-পোষণদানে সক্ষম নয় সে যেনো রোজা রাখে। কেননা রোজা তার জন্য পৌরষহীনতার মতো [উত্তেজনা প্রশমিত করে]।"

[মেশকাত, ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৫৮]

বিয়ের জাগতিক ও পরকালীন উপকারিতা

৪. হজরত আবুনাজি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, মুখাপেক্ষী! মুখাপেক্ষী! ওইপুরুষ যার স্ত্রী নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, যদি তার অনেক সম্পদ থাকে তবুও কি সে মুখাপেক্ষী?

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'যদিও তার অনেক সম্পদ থাকে তবুও সে মুখাপেক্ষী।

তিনি আরো বলেন, মুখাপেক্ষী! মুখাপেক্ষী! ওইনারী যার স্বামী নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, যদি তার অনেক সম্পদ থাকে তবুও কি সে মুখাপেক্ষী? রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'যদিও তার অনেক সম্পদ থাকে তবুও সে মুখাপেক্ষী।" [রাজিন]

কেননা সম্পদের উপকারিতা, প্রশান্তি বা পার্থিব চিন্তামুক্ত থাকা সেই পুরুষের ভাগ্যে জুটে না যার স্ত্রী নেই। সে নারীর ভাগ্যেও জুটে না যার স্বামী নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বিয়েতে জাগতিক ও পরকালীন অনেক বড়ো বড়ো উপকার রয়েছে। [হায়াতুল মুসলিমিন; পৃষ্ঠা: ১৮৭]

বিয়ে আল্লাহর বিশেষ দান বা উপহার। বিয়ের দ্বারা জাগতিক ও ধর্মীয় জীবন দুটোই ঠিক হয়ে যায়। মন্দচিন্তা ও অস্থিরতা থাকে না। সবচেয়ে বড়ো উপকার হলো, অঢেল পুণ্য অর্জন। কেননা স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসে ভালোবাসার কথা বলা, খুনসুটি করা নফল নামাজ পড়ার চেয়েও পুণ্যময়।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪]

৫. "হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, নারীকে বিয়ে করো' সে তোমার জন্য সম্পদ টেনে আনবে।"

পাদটীকা : সম্পদ টেনে আনার উদ্দেশ্য হলো, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই জ্ঞানসম্পন্ন এবং একে অপরের কল্যাণকামী হয়ে থাকে। স্বামী এ কথা স্মরণ রাখে– আমার দায়িত্বে খরচ বেড়ে গেছে; তখন বেশি-বেশি উপার্জন করার চেষ্টা করে। নারীও এমন কিছুব্যবস্থাগ্রহণ করে যা পুরুষগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা প্রশান্তি ও চিন্তামুক্ত হতে পারে। আর সম্পদের মূল উদ্দেশ্যই এটি। [হায়াতুল মুসলিমিন]

৬. "হজরত মাকাল ইবনে ইয়াসার [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, তোমরা অধিক সন্তানপ্রসবকারী নারীকে বিয়ে করো। কেননা আমি তোমাদের অধিক্যতা দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো যে, আমার উম্মত এতো বেশি!"

[আবুদাউদ, নাসায়ি, হায়াতুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ১৮৯]

বিয়ে না করা ক্ষতি

৭. "হজরত আবুজর গিফারি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আক্কাফ [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলেন, হে আক্কাফ! তোমার স্ত্রী আছে?

তিনি বলেন, 'না।'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, 'তোমার কি সম্পদ ও সচ্ছলতা আছে?'

সে বললো, 'আমার সম্পদ ও সচ্ছলতা আছে।'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, 'তুমি এখন শয়তানের ভাইদের দলভুক্ত। যদি তুমি খ্রিস্টান হতে তবে তাদের রাহেব [পাদ্রী] হতে। নিঃসন্দেহে বিয়ে করা আমাদের ধর্মের রীতি। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওইব্যক্তি যে অবিবাহিত। মৃতব্যক্তিদের মধ্যেও নিকৃষ্টব্যক্তি যে অবিবাহিত। তোমরা কি শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও? শয়তানের কাছে নারীর চেয়ে ভয়ংকর কোনো অস্ত্র নেই। যা ধর্মভীরু মানুষের ওপরও কার্যকরী। তারাও নারীসংক্রান্ত ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যারা বিয়ে করেছে তারা নারীর ফেতনা থেকে পবিত্র। নোংরামি থেকে মুক্ত।'
এরপর বলেন, 'আক্কাফ! তোমার ধ্বংস হোক। তুমি বিয়ে করো নয়তো তুমি পশ্চাৎপদ মানুষের মধ্যে থেকে যাবে।"
[মোসনাদে আহমাদ, জামেউল ফাওয়ায়েদ, ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৫৯]

বিয়ে একটি ইবাদত ও ধর্মীয় বিষয়

যেকাজের প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে তথা ওয়াজিব; অথবা যেকাজে উৎসাহপ্রদান করা হয়েছে তথা মোস্তাহাব; বা যেকাজের বিনিময়ে সোয়াব প্রদানের অঙ্গীকার এসেছে তা ধর্মীয়কাজ। আর যেকাজের ব্যাপারে এমনটি বলা হয়নি তা জাগতিক কাজ। এই ভিত্তিতে পর্যালোচানা করলে স্পষ্ট হবে যে, বিয়ে ধর্মীয়কাজ। কেননা শরিয়ত কখনো বিয়ের জোর তাগিদ দিয়েছে, কখনো উৎসাহ দিয়েছে। কখনো সোয়াবের অঙ্গীকার করেছে। উপরন্তু বিয়ে না করার প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করেছে। এটা বিয়ে ধর্মীয়কাজ হওয়ার প্রমাণ। এ কারণে ফকিহ বা ধর্মবেত্তা মনীষীগণ বিয়ের যে প্রকার ও বিধান বর্ণনা করেছেন সেখানে বিয়ে মোবাহ [যা করলে পুণ্য বা পাপ কোনোটাই হয় না] হওয়ারও কোনো স্তর বর্ণনা করেননি। এটা ভিন্ন কথা যে, কোনো কারণবশত কখনো কখনো বিয়ে করা শরিয়তের দৃষ্টিতে মাকরুহ [অনুচিত]। প্রকৃতপক্ষে বিয়ে করা ইবাদত। ইবাদত বলেই ধর্মবেত্তা মনীষীগণ ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ করা, অন্যকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া এবং নীরবে আল্লাহর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম বলেছেন।
[ফতোয়ায়ে শামি, ইমদাদুল ফতোয়া]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ে একটি লেনদেন তবে তা জাগতিক অর্থে নয়

রোজা– যা ইবাদত হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত; কোনো কোনো অবস্থাতে তাতেও শাস্তির বিধান প্রদান করা হয়। শরিয়তের নীতি-নির্ধারকগণ কাফফারার রোজার [যে রোজা পাপমোচনের নিমিত্তে রাখতে হয়] ক্ষেত্রে যেমনটি বলেছেন। তারপরও কেউ রোজাকে জাগতিক বিষয় বলে না। তাহলে বিয়ের 'লেনদেন' বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে জাগতিক বিষয় বলা হবে কেনো? বরং ভাবার বিষয় হলো, লেনদেনের বিপরীতে শাস্তির বিধান ইবাদতের তুলনায় অনেক দূরের। যখন ইবাদতের বিপরীতে শাস্তির বিধান আসার পরেও তা জাগতিক হয় না তাহলে ইবাদতে [বিয়েতে] 'লেনদেন' বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়াতে তা জাগতিক হয়ে যাবে না। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২; পৃষ্ঠাঃ ২৬৮]

বিয়ের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

পবিত্রকোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন–

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"আল্লাহপাক তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া [সঙ্গী] সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের থেকে শান্তিলাভ করো। আর তিনি তোমাদের মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও দয়ার্দ্রতা।"

অন্যত্র বলেন–

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

"তোমাদের স্ত্রীগণ (সন্তান উৎপাদনের জন্য) তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ।"

১. স্ত্রীকে বানানো হয়েছে পুরুষের আরাম ও শান্তির জন্য। বিষণ্ণতা, দুঃশ্চিন্তা ও নানা কর্মব্যস্ততার মাঝে স্ত্রী শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম। মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের অনুরাগী। স্ত্রীর সঙ্গে মানুষের বিরল ও আশ্চর্য ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়।

মেয়েরা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। সন্তানপ্রতিপালন, গৃহব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল ও সবকাজের শ্রেষ্ঠ সহযোগী। ফলে তার সঙ্গে ভালোব্যবহার করতে হবে। স্ত্রী ইজ্জত, সম্মান, সম্পদ ও সন্তান সংরক্ষণকারী ও এর পরিচালক। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্পদ, সম্মান ও দীনের সংরক্ষণ করে।

২. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে জৈবিকচাহিদা বা কামভাবের অধিকারী। স্ত্রী পুরুষের কাম-চাহিদা পূরণ করে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ।' তারা বীজ উৎপাদনের উপযোগী। যেভাবে ক্ষেতের সেবা-যত্ন করা হয় এবং তার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তেমনিভাবে স্ত্রীরও বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে যা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।

৩. নারীর প্রতি পুরুষের যে আগ্রহ ও চাহিদা রয়েছে এবং পুরুষের প্রতি নারীর যে আগ্রহ ও চাহিদা রয়েছে তা প্রাকৃতিক। বিয়ের মাধ্যমে তা পূরণ করলে মানুষের অন্তরে প্রকৃত ভালোবাসা ও পবিত্র চিন্তা-চেতনা তৈরি হয়। আর অবৈধভাবে পূরণ করা হলে তা মানুষকে অপবিত্র জীবনের প্রতি নিয়ে যায়। অন্তরে নোংরা চিন্তা ও কল্পনা সৃষ্টি করে। সুতরাং বিয়ে পবিত্র জীবনের অনুগামী করে এবং নোংরা জীবন থেকে ফিরিয়ে রাখে। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৯২]

বিয়ে করবে কোন নিয়তে

৪. পবিত্র কোরআনে বিয়ের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, সংযম ও পবিত্রতা অর্জন করা, শারীরিক সুস্থতা ও বংশধারা ঠিক রাখা ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য হলো, সংযম ও সুসন্তান লাভ করা। যেমন বলা হয়েছে–

مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"তোমরা সংযম ও পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করো। শুধু যৌনচাহিদা মেটাতে বিয়ে করো না।"

৫. অন্যত্র বলা হয়েছে–

ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

"(সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা) সন্তান কামনা করো। আল্লাহ যা তোমাদের ভাগ্যে রেখেছেন।"

৬. বিয়ে করলে মানুষের জীবন একটি রুটিনের মধ্যে চলে আসে। সে নিয়মানুবর্তী হয়, অধিক উপার্জনের চিন্তা করে, অযথা কাজ করে না; তার মধ্যে ভালোবাসা, লজ্জা, আনুগত্য সৃষ্টি হয়। মানুষ সমৃদ্ধ ও সুস্থ জীবনযাপন করে।

৭. বিয়ে সুস্থতা, আত্মপ্রশান্তি, আনন্দমুখর সুখী জীবন ও উভয় জগতে সফলতালাভের মাধ্যম।

৮. বিয়ে মানবসভ্যতার জন্য আল্লাহর অনন্য উপহার। দেশপ্রেমের শক্তভিত্তি। দেশ ও জাতির উচ্চতর সেবা। নানারকম রোগ-বালাই থেকে বেঁচে থাকার কার্যকরী মাধ্যম বা পথ্য। আল্লাহতায়ালা যদি মানবসমাজে বিয়ের বিধান দান

না করতেন তবে পৃথিবী আজ বিরান হয়ে যেতো। না কোনো মানুষ বা সমাজ থাকতো; না কোনো বসতি বা বাগান থাকতো।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা লিল আহকামিল নকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৯৫]

বিয়ের উপকারিতা

মানুষের ভেতরে যে জৈবিক চাহিদা থাকে যদি তা পূরণের একটি বৈধ মাধ্যম না থাকে তবে সে তা যথেচ্ছা পূরণ করবে। তার থেকে নির্লজ্জতা প্রকাশ পাবে। এজন্য শরিয়ত বিয়ে বৈধ করে মানুষের জৈবিকচাহিদাপূরণের একটি বৈধমাধ্যম নির্ধারণ করেছে। বিয়ের বৈধতা প্রমাণ করে শরিয়ত মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের তুলনায় অধিক কল্যাণকামী।

বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা হলে বিবেক বিয়েকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেবে না। কেননা একজন অপরিচিত পুরুষের সামনে একজন নারী কীভাবে বিবস্ত্র হবে? বিবেকের বিচারে যা সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। তবে বিবেকের এই বিচারকে গুরুত্ব দিলে বা সে অনুযায়ী কাজ করলে অনেক রকম বিশৃংখলা বেড়ে যাবে। এখন একজন অপরিচিত নারী-পুরুষ বিবস্ত্র হচ্ছে। জানা নেই তখন কতো নারী-পুরুষ পরস্পরের সামনে বিবস্ত্র হবে। কেননা একজন নারী বা পুরুষ কতোক্ষণ ধৈর্যধারণ করতে পারবে? নিজেদের কামচাহিদা দমন করে রাখবে? এই পরিণতির দিকে লক্ষ রেখে ইসলামিশরিয়ত বিয়ে অনুমোদন করেছে। যাতে মানুষের চাহিদাপূরণের নির্ধারিত মাধ্যম থাকে। সমাজে বিশৃংখলা ছড়িয়ে না পড়ে। ইসলামিশরিয়ত খোদাপ্রদত্ত-ঐশী হওয়ার প্রমাণ হলো, তার দূরদৃষ্টি সর্বদা পরিণতির দিকে। যে আইন ও নিয়ম মানুষের মেধাপ্রসূত তার দৃষ্টি পরিণতিতে আবদ্ধ থাকে না। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৫৪, রফউল আলবাস]

স্বাভাবিকভাবে বিবেক লজ্জাশীল হওয়া কামনা করে। আর বিয়ে নির্লজ্জ বলে মনে হয়। কিন্তু শরিয়ত বিয়ের বিধান প্রণয়ন করেছে লজ্জাকে রক্ষা করতে। কারণ যদি একজায়গায়ও মানুষ লজ্জা পরিহার না করে তবে সমগ্র মানবসভ্যতা নির্লজ্জ হয়ে যাবে। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৫৬]

ইসলামিবিধান

হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ

"যারা বিয়ের সামর্থ রাখে তারা যেনো বিয়ে করে নেয়। কেননা তা দৃষ্টি অধিক অবনত করে, লজ্জাস্থান অধিক সংরক্ষণ করে। তথা দৃষ্টি ও সতীত্ব রক্ষা সহজ করে দেয়।"

সাধারণত বিয়ে করলে সুস্থপ্রকৃতির মানুষের জন্য সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা সহজ হয়ে যায়। যারা নোংরা প্রকৃতির অধিকারী; যারা এক বিয়ে, দুই বিয়ে, চার বিয়ে করেও পবিত্র জীবনে অভ্যস্ত হতে পারে না বরং 'মোতয়া বিয়ে'তে [টাকার বিনিময়ে সাময়িকভাবে বিয়ে করা। পূর্বআরবে এর প্রচলন ছিলো। ইসলাম পরে এটি হারাম করে। এটি ব্যভিচারের মতোই হারাম।] লিপ্ত হয় তাদের আলোচনা এখানে করা হয়নি। কারণ, এখানে মানুষের আলোচনা করা হয়েছে কোনো পশু বা বাঁদরের আলোচনা করা হয়নি। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৫৭]

বিয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

"আল্লাহর অসীমত্বের নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের থেকে শান্তিলাভ করো। তিনি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও সহানুভূতি।" [বয়ানুলকোরআন]

নারীকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাদের মাধ্যমে তোমাদের মন শান্ত ও স্থির হয়। হৃদয় আপ্লুত হয়। স্ত্রীরা পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য। আমি বলি, ভালোবাসার সময় যৌবনকাল। এ সময় উভয়ের মধ্যে আবেগ থাকে। সহানুভূতির সময় উভয়ের বৃদ্ধকাল। বাস্তবেও দেখা গেছে, বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী বা স্বামী ছাড়া কেউ পাশে থাকে না। [নুসরাতুন নিসা, হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৫৫১]

বিয়ের ভ্রান্তউদ্দেশ্য

নারীদের জানা-ই নেই যে, বিয়ের উদ্দেশ্য ভরণ-পোষণ না-কি বৈবাহিকজীবনের কল্যাণ? যদি খাওয়া-পরার সংস্থান হওয়া বিয়ের উদ্দেশ্য হতো, তবে তারা বিয়ে করতো না যারা খাওয়া-পরায় স্বচ্ছল বা যে নারীরা ধনী। অথচ রাজার মেয়েও বিয়ে করে। ফলে বুঝা গেলো, বিয়ের উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণ। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৪]

বিয়ের সবচেয়ে বড়োউদ্দেশ্য

বিয়ের সবচেয়ে বড়োউদ্দেশ্য সন্তানলাভ করা। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ

“তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো যারা অধিক সন্তান প্রসব করে এবং অধিক বাসে। কেননা কেয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা আমি অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করবো।” [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৭]

বিয়ে সম্মান অর্জনের মাধ্যম

পোশাক যেমন মানুষের শোভা বা সৌন্দর্য তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীর জন্য শোভা। স্ত্রীও স্বামীর জন্য শোভা। স্ত্রী স্বামীর জন্য শোভা বা সৌন্দর্য এভাবে যে, স্ত্রী-সন্তান থাকলে মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখে। কারো কাছে ধার বা আর্থিক সাহায্য চাইলে সহজে পায়। কারণ, মানুষ জানে সে একা নয়। বরং তার সঙ্গে আরো দু'-একজন মানুষের রুটি-রুজি সম্পৃক্ত। তাকে সাহায্য না করলে তাদের কী হবে। অবিবাহিত মানুষকে সহজে ঋণ দেয়া হয় না। দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতেও সে কম সম্মানের অধিকারী।

বিবাহিতপুরুষকে মানুষ চরিত্রহীন মনে করে না। তাদের থেকে নিজের স্ত্রী-সন্তানকে নিরাপদ মনে করে। অবিবাহিতপুরুষকে মানুষ লালায়িত ও চরিত্রহীন মনে করে। তাদেরকে নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য হুমকি মনে করে।

এমনিভাবে স্বামীর দ্বারা স্ত্রীরও সম্মান বাড়ে। মেয়েদের বিয়ে হলে মানুষ তাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ করে না। স্বামী পাশে থাকুক বা দূরে থাকুক যতো সন্তান হবে তা স্বামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। তাছাড়া বিয়ের আগপর্যন্ত মেয়েদের ইজ্জত-অনিরাপদ থাকে। [রফউল ইলবাসঃ পৃষ্ঠাঃ ১৬৫]

অবিবাহিত থাকার ক্ষতি

বিয়ে পোশাকতুল্য হলে অবিবাহিত থাকা উলঙ্গ থাকার নামান্তর। বিয়েকে পোশাকতুল্য বলার উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো, সামর্থ থাকার পরও কোনো নারী-পুরুষের জন্য অবিবাহিত থাকা দোষণীয়। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৬৬]

যেহেতু বিয়ের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই বিয়ে না করলে বিভিন্ন ফেতনা বা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। নানা কুমন্ত্রণা ও আশংকা দেখা দেয়। যা ইবাদতের স্বাদ ও স্থিরতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। এসব আশংকা ও কুমন্ত্রণার ফলে অনেক মানুষের কাছে ইবাদত করা বোঝা মনে হয়। কেউ কেউ নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। আবার কেউ সামাজিক সম্মানরক্ষার জন্য নারীঘটিত সম্পর্ক এড়িয়ে চললেও অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। যা নারীঘটিত সম্পর্ক থেকেও মারাত্মক অপরাধ ও পাপ। কেননা নারী পুরুষের জন্য বৈধ একটি মাধ্যম। আর পুরুষ পুরুষের জন্য সবসময় হারাম বা অবৈধ। অনেকে মূল অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকলেও তার পূর্বকাজ যেমন, চুমু

খাওয়া, স্পর্শ করা ইত্যাদি করে থাকে, যাতে মানুষের সন্দেহ না হয়। এমনকি তারা নিজেরাও তাকে স্নেহসুলভ ভালোবাসা মনে করে।

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ

"আমরা আল্লাহর কাছে সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করি।" [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৪২]

অনেকে প্রয়োজন ও সামর্থ উভয় থাকার পরও বিয়ে করে না। কেউ কেউ প্রথম থেকেই বিয়ে করে না। কেউ কেউ স্ত্রী মারা গেলে বা তালাক দিলে পুনরায় বিয়ে করে না। অথচ প্রয়োজন ও সামর্থ–উভয় থাকলে বিয়ে করা ফরজ।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৯]

নব্বই বছর বয়সে বিয়ে

শাহজাহানপুরে নব্বই বছর বয়সে একবৃদ্ধ বিয়ে করে। ছেলেরা আপত্তি জানায়। মেয়ে-পুত্রবধূরা বিরোধিতা করে বলে, আমরা সবাই আপনার সেবার জন্য আছি। এই বয়সে বিয়ের কী প্রয়োজন? সেবার জন্য আপনার সন্তানেরা যথেষ্ট। বৃদ্ধ বললো, আমার ভালো-মন্দ তোমরা কী বুঝো? তোমরা জানো না, কেউই পুরুষকে স্ত্রীর সমান শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারবে না।

ঘটনাক্রমে বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকটির ডায়রিয়া হয়। পায়খানায় এতো দুর্গন্ধ হয় যে, পুরো বাড়িতে তা ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেমেয়ে কেউ ঘৃণায় পাশে আসলো না। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা সবাই বৃদ্ধকে ছেড়ে চলে গেলো। কিন্তু স্ত্রী তখনো সেবা করে যায়। বেচারি ক্লান্তিহীন সেবা করলো। সামান্য ঘৃণা করলো না। যদিও তার নতুন বিয়ে হয়েছিলো এবং তার বয়স কম ছিলো তবুও সে বৃদ্ধকে আগলে রাখতো। পায়ের কাছে বসে থাকতো। পায়খানা করিয়ে শরীর পরিষ্কার করে দিতো। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতো। বৃদ্ধ দিনে বিশ-পঁচিশবার পায়খানা করতো। প্রতিবার সে পরিষ্কার করতো। কাপড় ধুয়ে দিতো। তখন বৃদ্ধলোকটি বললো, আমি এই দিনটির জন্যই বিয়ে করেছিলাম। এরপর বৃদ্ধ সুস্থ হয়ে ছেলেদের ডেকে বললো, তোমরা নিজেদের সেবার অবস্থাতো দেখলে। আর এই সেবার জন্য তোমরা বলেছিলে, আপনার বিয়ের কী প্রয়োজন? এখন তোমরা বিয়ের প্রয়োজন বুঝতে পারলে? তখন যদি আমি বিয়ে না করতাম তাহলে তোমরা ছেড়ে চলে গেলে আমি একা পড়ে থাকতাম।

প্রকৃতপক্ষে, অসুস্থতায় পুত্রবধূ-কন্যা কখনো স্ত্রীর সমান উপকারে আসে না। আল্লাহতায়ালা এই শান্তি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝেই রেখেছেন। পৃথিবীর সুখ-শান্তি স্ত্রীর মাধ্যমে অর্জিত হয়।

অপর একটি ঘটনা

একবৃদ্ধ বিয়ে করেছিলো। কিন্তু তার শারীরিক অক্ষমতা থাকায় সে বিভিন্ন যৌনউত্তেজক ওষুধগ্রহণ করতো। একজন ডাক্তার তাকে অত্যন্ত গরম উত্তেজক ওষুধ দেয়। ফলে তার কুষ্ঠরোগ হয়। তার সারা শরীরে ঘা হয়ে যায়। কেউ তার পাশে যাওয়ারও কল্পনা করতো না। এমন মুহূর্তেও স্ত্রী সামান্য ঘৃণা করেনি। যেকোনো প্রয়োজনে সেবায় অপারগতা প্রকাশ করেনি। এই পবিত্র সম্পর্কের এবং একে অপরকে প্রাধান্য দেয়ার শেষ কোথায়? যে নারীর স্বামী তার কোনো মূল্যায়ন করে না, সম্পর্কও খুব হালকা–সেও তার স্বামীর যে সেবা করে অন্যকেউ এমন সেবা ও ত্যাগ স্বীকার করবে না।
[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৬১ ও ৫৫২; আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: পৃষ্ঠা: ২০৬]

মাওলানা ফজলুর রহমান একশো বছর বয়সে বিয়ে করেন

হজরত মাওলানা ফজলুর রহমান [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি শেষজীবনে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স একশো বছরেরও বেশি ছিলো। কারণ, তাঁর একটি ক্ষত থেকে সবসময় রক্ত ঝরতো। স্ত্রী ছাড়া অন্যকেউ তার দেখাশোনা করতে পারতো না। তার সেই স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দিনে-রাতে কয়েকবার নিজহাতে তা পরিষ্কার করে দিতো। কোনো ধরনের ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা ছিলো না। পৃথিবীর অন্যকোনো সম্পর্কের দৃষ্টান্ত এমন হতে পারে না। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৫৫৩; আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৪]

হাজি ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরেমক্কি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বৃদ্ধবয়সে দ্বিতীয় বিয়ে করেন

হজরত হাজি সাহেব [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] শেষবয়সে একটি বিয়ে করেছিলেন। কারণ, হজরতের স্ত্রী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তখন হজরত কেবল সেবার উদ্দেশে বিয়ে করেন। নতুন স্ত্রী হজরত ও প্রথম স্ত্রীর সেবা করতো। এর দ্বারা বুঝে আসে, স্ত্রী কেবল যৌনচাহিদা পূরণের জন্য নয় বরং এখানে অনেক কল্যাণ ও রহস্য রয়েছে। [নুসরাতুন নিসা: পৃষ্ঠা: ৫৫৩]

বিয়ের না করার হুঁশিয়ারি

হাদিসশরিফে এসেছে–

مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا

“যে অবিবাহিত রইলো সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”

যেব্যক্তি বিয়ের চাহিদা ও সামর্থ থাকার পরও বিয়ে করলো না সে আমাদের পথের অনুসারী নয়। কেননা এটা খ্রিস্টানদের নিয়ম। তারা বিয়েকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথে বাধা এবং বিয়ে পরিহার করা ইবাদত মনে করে।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩৮৬]

অনেকে বিয়ে না করা ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করে অথচ এটা বৈরাগ্যবাদী বিশ্বাস ও বেদাতের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়ত যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে তা পরিহার করা ইবাদত হতে পারে না।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪০]

হুঁশিয়ারির কারণ

প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করলে সমাজে নানা বিশৃংখলা ও পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে। কেননা চাহিদা দুই ধরনের– ১. প্রবল চাহিদা, ২. সাধারণ চাহিদা। মানুষের সাধারণ চাহিদা [যা স্বভাবজাত হয়] তা কখনোই শেষ হয়ে যায় না। যতোই কঠোর সাধনা করুক না কেনো, যেকোনো চিকিৎসাগ্রহণ করুক না কেনো–তা থেকে যায়। আমি সত্তর বছরের একবৃদ্ধকে দেখেছি, সে একছেলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখতো। অথচ তার যৌনচাহিদা পূরণের ক্ষমতা ছিলো না। সে তার দিকে কামাতুর হয়ে থাকতো। আর কামচাহিদার সঙ্গে তাকিয়ে থাকা সম্পূর্ণ হারাম।

যৌনচাহিদা আত্ম-সাধনা দ্বারা শেষ হয়ে যায় না। বরং বার্ধক্য, ওষুধ ও স্বল্প আহারের দ্বারাও শেষ হয়ে যায় না। সাধনার লাভ হলো, চাহিদা হালকা হয়। চরিত্রের ওপর টিকে থাকা সহজ হয়। যদি চাহিদা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় তাহলে সাধনার সোয়াব দেয়া হবে কিসের ওপর ভিত্তি করে। সাধনার প্রতিদান তো এজন্য যে, মানুষ জাগতিক চাহিদা উপেক্ষা করে ভালোকাজে অটল থাকবে। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৫৮]

বিয়ে থেকে যারা বিরত থাকতে পারবে

যদি কেউ শরিয়তসম্মত কোনো অপারগতার কারণে বিয়ে থেকে বিরত থাকে তবে সে হাদিসের হুঁশিয়ারি থেকে ব্যতিক্রম। যেমন, শারীরিক, আর্থিক ও ধর্মীয় সমস্যা। শারীরিক ও আর্থিক সমস্যা স্পষ্ট। দীনিসমস্যা হলো, বিয়ের পর দুর্বল মনোবলের কারণে ঠিকমতো ধর্মপালন করতে না পারা বা ধর্মীয় ব্যস্ততার কারণে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে না পারা ইত্যাদি।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩৮৬]

মোটকথা, যদি কারো ভয় হয় সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না–তা মানবিক হোক বা আর্থিক হোক; তাহলে তার জন্য বিয়ে করা নিষেধ।

[ইসলাহে ইনকিলাব; পৃষ্ঠা: ৪০]

বিয়ের অপারগতাসম্পর্কিত হাদিস

হজরত ইবনে মাসউদ ও আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষের পতন স্বীয়-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের হাতে হবে। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতাকে লজ্জাজনক মনে করা হবে। তাকে সাধ্যাতীত কাজ করতে বলা হবে। ফলে সে এমন কাজে লিপ্ত হবে যা তার দীনদারি তথা ধর্মনিষ্ঠা শেষ করে দেবে। পরিশেষে তার পতন হবে।"

হজরত আবু সাঈদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি তার মেয়েকে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে নিয়ে এলো। সে অভিযোগ করলো, 'আমার মেয়ে বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। আপনি তাকে বিয়ে করতে বলুন!'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তার মেয়েকে বিয়ের নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'তোমার পিতার কথা মেনে নাও!'

সে বললো, 'ওই সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি ততোক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে করবো যতোক্ষণ না আপনি বলে দেবেন স্ত্রীর দায়িত্বে স্বামীর কী অধিকার রয়েছে।'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] অধিকারের বর্ণনা দিলে সে বললো, 'ওই সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি কখনোই বিয়ে করবো না।'

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, 'মেয়েদের অনুমতি ছাড়া তাদেরকে বিয়ে করো না [যখন তারা শরিয়তের দৃষ্টিতে আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারী হবে]।'

প্রথমহাদিসে পুরুষের অপারগতার কথা বলা হয়েছে। যা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহলো, ধর্মীয় ক্ষতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। আর দ্বিতীয় হাদিসে নারীর অপারগতার কথা বলা হয়েছে। সে মহিলার এই আত্মবিশ্বাস ও সাহস ছিলো না যে, সে স্বামীর অধিকার আদায় করতে পারবে। এজন্য রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাকে বাধ্য করেননি। এমনিভাবে কোনো বিধবা নারীর যদি আশংকা হয়, সে বিয়ে করলে তার সন্তানদের ক্ষতি হবে তবে অপর এক হাদিসের ভাষ্যমতে এটিও একটি অপারগতা। যার দরুন সে বিয়ে থেকে বিরত থাকতে পারবে। [হায়াতুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ১৯২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের ফিকহিবিধান

ওয়াজিব বিয়ে : যখন বিয়ে প্রয়োজন তথা দেহ-মনে তার চাহিদা থাকে এবং তার এই পরিমাণ সামর্থ থাকে যে, প্রতিদিনের খরচ প্রতিদিন উপার্জন করে খেতে পারে, তখন তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। বিয়ে থেকে বিরত থাকলে গোনাহগার হবে।

ফরজ বিয়ে : যদি সামর্থ থাকার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা এতো বেশি থাকে যে, বিয়ে না করলে হারামকাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বিয়ে করা ফরজ।

مِنَ الْفِعْلِ الْحَرَامِ اَلنَّظْرُ الْمُحَرَّمُ وَالْاِسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ

"কুদৃষ্টি ও হস্তমৈথুন হারাম কাজের অন্তর্ভুক্ত।"

সুন্নত বিয়ে : যদি বিয়ের চাহিদা না থাকে কিন্তু স্ত্রীর অধিকার আদায়ের সামর্থ্য রাখে তবে বিয়ে করা সুন্নত।

নিষিদ্ধ বিয়ে : যদি কারো আশংকা হয় সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না, চাই তা দৈহিক হোক বা আর্থিক তবে তার জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

মতভেদপূর্ণ বিয়ে : যদি চাহিদা ও প্রয়োজন থাকে কিন্তু সামর্থ না থাকে তাহলে তার বিয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। অধমের মতে ওয়াজিবের মতটিই অগ্রগণ্য। সামর্থ কষ্ট-শ্রম ও ঋণ করার দ্বারা অর্জন হয় যদি সে তা আদায় করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা রাখে। আদায়ের চেষ্টাও করে। যদি সে আদায় করতে না পারে তবে আশা করা যায় আল্লাহ তার ঋণদাতাকে রাজি করিয়ে দেবেন। কেননা দীনের সংরক্ষণের জন্য ঋণ করেছিলো। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য ঋণ করা নাজায়েজ। বরং ভরণ-পোষণ ও মহর আদায় করার জন্য যদি তা নগদ প্রদান করতে হয় তাহলে ঋণ করতে পারবে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯-৪০]

বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে করণীয়

একব্যক্তি আমার কাছে এলো। যার বিয়ের প্রবল চাহিদা ছিলো। কিন্তু এতোটা গরিব ছিলো যে, বিয়ের সামর্থ ছিলো না। সে আমার কাছে নিজের অবস্থা খুলে

বলে চিকিৎসা চাইলো। আমি এখনো তার উত্তর দিইনি। আমার বলার আগে তার আলোচনা শুনে তিনি [উপস্থিত একজন] বললেন, 'রোজা রাখো। কেননা হাদিসে এসেছে–

'مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ'

"যে বিয়ের সামর্থ রাখে না তার উচিত রোজা রাখা।"

লোকটি উত্তর দিলো, 'আমি রোজা রেখেছিলাম তবুও আমার দেহ-মনের চাহিদা কমেনি।' তার কথা শুনে তিনি আর উত্তর দিতে পারলেন না। আমি তাকে শুনিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কতোদিন রোজা রেখেছিলেন?'

সে বললো, 'দু'টি রোজা রেখেছিলাম।'

আমি বললাম, 'এজন্যই আপনি সফল হতে পারেননি। কেননা বেশি পরিমাণ রোজা রাখা প্রয়োজন ছিলো। একথা সরাসরি হাদিস থেকে প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ' এখানে عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ শব্দটি আবশ্যকের অর্থ প্রদান করে। আর لَازِمْ বা আবশ্যকীয় বিষয় দুই প্রকার। এক. বিশ্বাসগত, দুই. কর্মগত। বাক্যের ভাব-ভঙ্গি থেকে বুঝে আসে এখানে لُزُوْمِ اِعْتِقَادِىْ বা বিশ্বাসগত আবশ্যকীয় বিষয় উদ্দেশ্য নয়। কর্মগত আবশ্যকীয় কাজ উদ্দেশ্য। কারণ এই রোজা রাখা ফরজ নয়। বরং রোগের নিরাময়ের জন্য রাখতে বলা হয়েছে। আর যেকাজ কর্মগতভাবে আবশ্যক তা অধিক পরিমাণে বারবার করতে হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কাজ বারবার করে তখন বুঝতে হবে লোকটি সেই কাজটি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে। ফলে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর উদ্দেশ্য–বারবার রোজা রাখো।'

বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, পশুশক্তি [যৌনচাহিদা] দুর্বল করার জন্য অল্পরোজা রাখা যথেষ্ট নয়। অধিক পরিমাণ রোজা রাখালেই সুফল পাওয়া যায়। এজন্য রমজান মাসের শুরুভাগে তা দুর্বল হয় না শেষভাগে কমে যায়। পরীক্ষা করে জানা গেছে, রমজানের শুরুতে পশুশক্তি [যৌনচাহিদা] দমিত হয় না বরং কোষ্ঠ-কাঠিন্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে তা আরো বেড়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে তা কমে আসে। শেষ পর্যন্ত তা পুরোপুরি দুর্বল হয়ে যায়। তখন পশুশক্তি পরাজিত হয়। কারণ তখন অধিক রোজা রাখা হয়ে যায়।

প্রশ্নকারী চলে গেলো। কিন্তু মুজতাহিদ সাহেব [যারা সরাসরি শরিয়তের মূল উৎস কোরআন-হাদিস থেকে মাসয়ালা বের করার যোগ্যতা রাখেন, যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।] কিছু বললেন না। পরবর্তীতে তার চিঠি এসেছিলো, 'আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। ওই দরিদ্রব্যক্তির মাধ্যমে তা হয়ে গেছে।

[আল ইফাজাতুল য়াওমিয়্যাঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ১৬৫ ও খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ২২১]

ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়া কি বাবা-মায়ের দায়িত্ব? বিয়েতে বিলম্ব হলে কী পরিমাণ গোনাহ হবে

মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো তাগিদ আছে কী? বিলম্ব করলে কি কোনো গোনাহ হবে? যদি হয় তাহলে কী পরিমান গোনাহ হবে? কোরআন ও হাদিস থেকে পৃথক পৃথক উত্তর চাই।

উত্তর : বিয়ের তাগিদ দিয়ে কোরআন ও হাদিসে পৃথক পৃথকভাবে সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে ছেলে-মেয়ে উভয় অন্তর্ভুক্ত। মেয়েদের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ এসেছে, আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ

"তোমরা অবিবাহিত নারী-পুরুষকে বিয়ে দিয়ে দাও।"

এটা আদেশসূচক শব্দ। যা উদ্দিষ্ট বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ। الأيامى শব্দটি الأَيِّمُ-এর বহুবচন। হাদিসে যার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে–

الْأَيِّمُ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَيُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ إِنْ كَانَ كَذٰلِكَ

"এমন নারী যার স্বামী নেই; চাই সে কুমারী হোক বা বিবাহিত হোক এবং এমন পুরুষ যার স্ত্রী নেই।"

বাকি থাকলো হাদিস। মেশকাতশরিফের 'বাবুত তাজিলুস সালাত' বা তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ার অধ্যায়ে হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত–

১.

يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا

"রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, আলি! তিনটি কাজে বিলম্ব করবে না। নামাজ– যখন তার সময় হয়ে যায়। জানাজার নামাজ– যখন লাশ উপস্থিত হয়। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের বিয়ে– যখন উপযুক্ত ঘর পাওয়া যায়।"

[তিরমিজি]

২.

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيْهِ

"হজরত ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যার কোনো সন্তান হলো [ছেলে বা মেয়ে] সে যেনো তার সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিয়ে দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তানকে যদি বিয়ে না দেয় এবং সে পাপে লিপ্ত হয় তাহলে পিতা গোনাহগার হবে।" [মেশকাত]

৩.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوْبٌ: مَنْ بَلَغَتْ اِبْنَتُهُ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

"হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব ও আনাস ইবনে মালেক [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'তাওরাতে লেখা ছিলো– যার মেয়ে বারো বছরে উপনীত হলো অথচ সে মেয়েকে বিয়ে দিলো না তখন মেয়ে কোনো পাপে লিপ্ত হলে পিতাও গোনাহগার হবে।"

এসব বর্ণনা থেকে ওপর্যুক্ত আদেশ আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণ। আর আবশ্যিক আদেশ পরিহার করলে জবাবদিহিতার [শাস্তির] মুখোমুখি হতে হয়। শেষ হাদিস থেকে গোনহ'র পরিমাণ জানা যায়। সন্তান যে প্রকার পাপেই লিপ্ত হবে পিতা সমপরিমান গোনাহ পাবে। চাই তা চোখের গোনাহ হোক, মুখের গোনাহ হোক বা অন্তরের গোনাহ হোক। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৩৪]

অধ্যায় ।.২।.

স্ত্রীর গুরুত্ব ও উপকারিতা
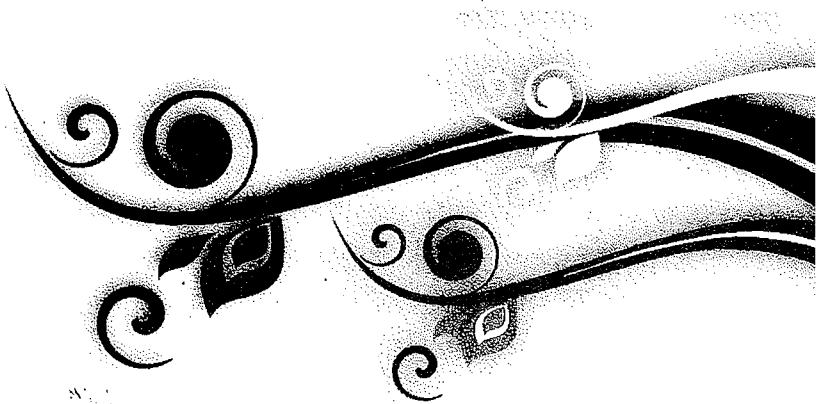
প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহতায়ালা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন পবিত্র সম্পর্ক দান করেছেন যে, মানুষ স্ত্রী থেকে বেশি প্রশান্তি অন্যকিছুতে পেতে পারে না। অসুস্থতার সময় সব প্রিয়জন নাক ধরে সরে পড়ে। বিশেষ করে বন্ধু অসুস্থ হলে অপর বন্ধু কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু এমনটি কখনো হবে না– স্ত্রী স্বামীকে ফেলে রেখে চলে যাবে। অসুস্থার সময় স্ত্রীই সবচেয়ে বেশি সহমর্মিতা প্রদান করে। তবে যে স্ত্রী স্বামীকে রেখে চলে যায় সে মূলত স্ত্রীই নয়, স্ত্রীর যোগ্যতাই সে রাখে না।

[আততাবলিগ : চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৬]

স্ত্রীই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু

স্ত্রীর চেয়ে আপন কোনো বন্ধু হতে পারে না। বাস্তবতা হলো, দুঃখ-দুর্দশার সময় সব বন্ধু দূরে সরে যায়। কিন্তু স্ত্রী কখনো স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে না। অসুস্থতার সময় স্ত্রী যতোটা প্রশান্তি দেয় কোনো বন্ধুতো দূরের কথা প্রিয়আত্নীয়স্বজনও তা দিতে পারে না। সুতরাং পুরুষের জীবনে স্ত্রীর মতো পরমবন্ধু আর কেউ হতে পারে না। [হুকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ২২]

নারীর সেবার মূল্যায়ন

নারীর সেবা আমার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, আমাকে ভাবিয়ে তুলে। তারা দাসীর মতো সেবা করে যায়। সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকে। যদি তারা নিজেদের মর্যাদা জেনে সেবা করতো তবে অনেক ওপরে উঠে যেতো। তাদের সেবা সম্পর্কে আমি বলে থাকি, তাদের প্রতি আমাদের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত, নয়তো পুরুষের সামর্থের বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যাবে। হাদিসশরিফে এসেছে–

حُبِّبَ إِلَيَّ ثَلَاثٌ اَلنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَالسِّوَاكُ

"রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয়। নারী, সুগন্ধী, মেসওয়াক।"

অর্থাৎ নারীর চলাফেরা, জীবনাচার ও সঙ্গ উপভোগ্য। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কেবল জৈবিকচাহিদার কারণে নারীকে পছন্দ করতেন না।

[মালহুজাতে জাদিদ মালফুজাত: পৃষ্ঠা: ২৮]

স্ত্রী অনুগ্রহশীল

প্রথমত নারী উত্তমব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। কারণ তারা নিরীহ ও দুর্বল প্রকৃতির। দ্বিতীয়ত তারা পুরুষের বন্ধু। আর বন্ধুত্বের কারণে মানুষের অধিকার বেড়ে যায়। এছাড়াও তারা পুরুষের ধর্মপ্রতিপালনে সহযোগী। নারীর মাধ্যমে পুরুষের দীনদারি রক্ষা পায় এবং পাপচিন্তা থেকে বিরত থাকে। এই বিবেচনায় তারা বড়ো অনুগ্রহশীল। ধর্মপরায়ণ মানুষ অনুগ্রহ ও অবদানের মূল্যায়ন করে। স্ত্রীর মূল্যায়ন ও সম্মান করা প্রয়োজন। কারণ, তারা ধর্ম ও জীবন তথা ইহকাল ও পরকালের সহযোগী। নারীর অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক। কারণ, তাদের মধ্যে এমন অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার প্রত্যেকটি মূল্যবান ও মূল্যায়নযোগ্য। [আততাবলিগঃ খণ্ডঃ ১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৪১ ও ১৪৯]

স্ত্রীর ত্যাগ

স্ত্রী যেমনই হোক, অবাধ্য হোক বা অবিবেচক হোক; সে স্বামীর জন্য পিতা-মাতাকে ছেড়ে এসেছে। পরিবারকে ত্যাগ করেছে। এখন তার দৃষ্টি কেবল স্বামীর ওপর। তার জীবনের সবকিছু এখন একমাত্র স্বামীর জন্য উৎসর্গিত। সুতরাং মানবতার দাবি হলো, এমন অনুগত ও ত্যাগী মানুষকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

[আততাবলিগঃ খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৫৭]

স্ত্রীর সবচেয়ে বড়ো গুণ ও ত্যাগ হলো, সে স্বামীর জন্য সবধরনেরর বন্ধন ছিন্ন করে আসে। এজন্য যদি বাবা-মা বা অন্যকোনো আত্মীয়ের সঙ্গে স্বামীর মনোমালিন্য হয় তাহলে স্ত্রী সাধারণত স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করে। বাবা-মায়ের পক্ষ নেয় না। এতোটা ত্যাগের পরও অনেক পুরুষ তাদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে। অনেকে তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করে যেনো তারা দাস-দাসীরও অধম। আবার অনেকে স্ত্রীর ভাত-কাপড়েরও খবর রাখে না। এগুলো খুবই গর্হিত এবং অমানবিক কাজ।

[মাজালিসে হাকিমুলউম্মতঃ পৃষ্ঠাঃ ১২ ও আত তাবলিগঃ খণ্ডঃ ১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৪০]

নারীর অবদানসমূহ

নারী যদি ঘরে কোনো কাজ না-ও করে; কেবল ব্যবস্থাপনা ও দেখাশোনা করে তবুও তা মূল্যায়নযোগ্য। পৃথিবীতে অনেক ক্ষেত্রে শুধু ব্যবস্থাপনার জন্য মোটা অংকে লোক নিয়োগ করা হয়। ব্যবস্থাপকদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাহ্যিকদৃষ্টিতে কোনো কাজ করেন না। কারণ, তার অধীনে এতো বড়ো অফিসারগণ কাজ করেন যে, তার নিজের কোনো কাজে হাত দিতে হয় না। কিন্তু তাকে মোটা অঙ্কের বেতন ও সম্মান দেয়া হয় তার

সার্বিক দায়িত্বগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য। স্ত্রীর দায়িত্বও এতো বড়ো যে, ভাত-কাপড়ে তার বিনিময় দেয়া সম্ভব নয়। অনেক সম্ভ্রান্ত নারীকে দেখা যায়, তারা নিজহাতে ঘরের অনেক কাজ করে। বিশেষ করে অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তান লালন-পালন করে। যা বেতনভুক্ত কোনো লোককে দিয়ে স্ত্রীর মতো করে করানো সম্ভব নয়। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৪৯]

একজন মৌলভি সাহেব বলতেন, স্ত্রীর জন্য খাবার তৈরি করা ওয়াজিব [আবশ্যক কর্তব্য]। আমার মতে, তাদের ওপর খাবার তৈরি করা ওয়াজিব নয়। আমি ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে নিচেযুক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করি।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

মোটকথা, নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর মনোরঞ্জন করা। আত্মিকপ্রশান্তি প্রদান করা। খাবার তৈরি করার জন্য নয়। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৫৫]

স্ত্রী ছাড়া ঘরের ব্যবস্থাপনা সুন্দর হয় না

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, স্ত্রী ছাড়া ঘরের ব্যবস্থাপনা সুন্দর হয় না। পুরুষের কাজ কেবল উপকরণ যুগিয়ে দেয়া আর নারীর কাজ তা বাস্তবে রূপ দেয়া। আমি অনেক ধনাঢ্যব্যক্তিকে দেখেছি তাদের অঢেল অর্থবিত্ত ছিলো কিন্তু স্ত্রী না থাকায় ঘরে কোনো শ্রী ছিলো না। লাখো বাবুর্চি রাখা হোক সেই প্রশান্তি কীভাবে পাওয়া যাবে স্ত্রীর মাধ্যমে যা অর্জন করা হয়? বাবুর্চি বেতনের চাকরি করে। একদিন তাকে কঠোর কথা বললে সে হাত ছেড়ে দিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। তখন বিপদ সামলাও! নিজের হাতে রুটি বানিয়ে চুলায় সেঁকো। নিজেই হাঁড়ি-পাতিল পরিষ্কার করো। স্ত্রী থাকলে এটা কি কখনো হতে পারে যে, স্বামী নিজে খাবার তৈরি করবে? অভিজ্ঞতার আলোকে এটাও দেখা গেছে যে, স্ত্রীর উপস্থিতিতে যদি চাকর দিয়ে কোনো কাজ করানো হয় এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে যদি ওই কাজই করানো হয় তবে উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়। ঘরের মালিকের [মেয়েলোকের] কাজের লোকেরা বেশি চুরি করতে পারে না। তাদের অনুপস্থিতিতে ঘর শূন্য হয়ে যায়। যদি কোনো পুরুষ ঘরের কাজ জানেন তবু চাকর-বাকর তাকে সামান্য হলেও ধোঁকা দেয়। মহিলাদের মতো ব্যবস্থাপনা পুরুষ করতে না। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪৮]

শুধু ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে স্ত্রীরা পুরুষের যে পরিমাণ সেবা করে বিপুল পরিমাণ বেতনের বিনিময়ে কোনো চাকর-চাকরানি তা করবে না। কারো সন্দেহ থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পারে, স্ত্রী ছাড়া ঘরের ব্যবস্থাপনা কতোটুকু সুন্দর হয়। অনেক মানুষকে দেখা গেছে, তাদের পর্যাপ্ত বেতন ও আয় ছিলো কিন্তু স্ত্রী ছিলো না। খরচ ছিলো চাকরের হাতে। এতে তাদের সংসারের খরচ সীমাহীন বেড়ে যায়। বিয়ে করার পর খরচে ভারসাম্য আসে। পুরো ব্যবস্থাপনা ঠিক হয়ে যায়। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৪৯]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রাম্যবধূর মহত্ত্ব

গ্রাম্যমহিলারা সাধারণত বক্রস্বভাব, স্বল্পবুদ্ধি ও অসামাজিক হয়। কিন্তু তাদের মহত্ত্ব হলো, তারা চতুর ও প্রতারক হয় না। অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়। [মালফুজাতে খায়রাতঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৫]

পবিত্র কোরআনে মহিলাদের প্রশংসায় বলা হয়েছে الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ-এর দ্বারা বুঝে আসে, বাইরের জগত সম্পর্কে অজ্ঞ বা বিমুখ থাকা নারীর সহজাত প্রকৃতি। বরং আয়াতে عَنِ الْفَوَاحِشِ তথা অশ্লীলতা থেকে বিমুখতা উদ্দেশ্য, সাধারণ বিমুখতা উদ্দেশ্য নয়।

অশ্লীলতা থেকে বিমুখ থাকা পুরুষের কাছেও কাম্য। তারপরও তা নারীর প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরুষের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, বাইরের জগত সম্পর্কে সাধারণ বিমুখতাই নারীর জন্য অধিক উপযোগী। এখন নারীকে বলা হয়– পর্দা ছাড়ো, পর্দাহীন হও; জীবনের উন্নতি করো। আশ্চর্য একচিন্তা তাদের মাথায় ঢুকেছে।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১৪১]

নারী সবগুণ অর্জন করতে পারে কিন্তু লজ্জা না থাকলে সে নারী বলে গণ্য হবে না। বিয়ের উপকারিতা পেতে হলে বিয়ের কল্যাণকামিতার প্রতি নারীকে সবচেয়ে লক্ষ রাখতে হবে। যে নারী নির্লজ্জ হবে তার সবকিছু নিষ্ফল।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৭]

ভারতবর্ষের অধিকাংশ নারীই তাদের চারপাশের খোঁজখবর জানে না। ফলে তারা আল্লাহতায়ালার ঘোষিত মহত্ত্বের অধিকারী হবে। আল্লাহতায়ালা বলেন–

اَلْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"তারা পূতঃপবিত্র, আত্মভোলা; ইমানদার।"

যখন মহানআল্লাহ নারীর সরলতা ও আত্মভোলা হওয়ার প্রশংসা করেছেন তখন বিশ্বাস করতে হবে আবশ্যই এতে কল্যাণ রয়েছে। সেই চতুরতা ও

সচেতনতার মধ্যে কল্যাণ নেই আজ যার প্রচলন হচ্ছে। বাস্তবতার দাবি এমনই। কোরআনে নারীর বাইরের জগত সম্পর্কে বিমুখ থাকা ও আত্মভোলা হওয়ার প্রশংসা করা হয়েছে। আর ভারতবর্ষের নারীর মাঝে তা অতুলনীয় মাত্রায় রয়েছে। [হুকুকুল বাইতঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৪]

চরিত্রহীন ও কপট নারীর সৌন্দর্য

একলোক বললো, নারীরা অনেক সময় অসামাজিক হয়। তার চলাফেরায় অনেক সময় স্বামীর মন-মানসিকতা নষ্ট হয়। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, 'নারীর বদমেজাজি হওয়া একটি বিশেষ দিক বিবেচনায় অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যায়নযোগ্য গুণ। তা হলো, তাদের পবিত্র হওয়া। অধিকাংশ বদমেজাজি নারী চারিত্রিক পবিত্রতার অধিকারী। বিপরীত হলো অসতী নারী। তারা সারাক্ষণ সাজ-সজ্জা, রূপচর্চা, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

এমনিভাবে কিছু কিছু মহিলা বদমেজাজি হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরনের নারীদের পবিত্রতার ব্যাপারে আমার কোনো সংশয় নেই। অসতী মহিলারা মিষ্টভাষী হয়। তাদের বাহ্যিকআচরণও সুন্দর হয়। এরা ভয়ংকর। বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিড়ালের নখের মতো নিজের অনিষ্টতা লুকিয়ে রাখে। পুরুষকে বোকা ও বশ করে রাখে। এমন নারীর প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। বদমেজাজি ও মূর্খনারীর অসামাজিকতাও স্বভাবগতভাবে হয়ে থাকে। কারণ তাদেরকে বাঁকা হাড় থেকে বানানো হয়েছে। যদিও তার কথায় কোনো রস না থাকে, তার উঠা-বসায় কোনো শিষ্টচার ও সৌন্দর্য না থাকে, সন্তানের লালন-পালন ও স্বামীর সেবা করতে না জানে তবুও তার পবিত্রতার গুণে সব ত্রুটি উপেক্ষা করা যায়। এমন নারীর প্রতি আমার আস্থা সীমাহীন। পবিত্র হওয়ার কারণে তারা বানোয়াট কথাবার্তা থেকে মুক্ত। এমন নারী বড়োই মূল্যবান সম্পদ। তারা সত্যিই মূল্যায়নযোগ্য। [নুসরাতুন্নেসা]

আমার অভিজ্ঞতা হলো, যেসব নারী সামাজিকতা ও ব্যবস্থাপনায় অদক্ষ হয় তাদের মধ্যে পবিত্রতার সম্পদ পুরোপুরি থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি এমন স্ত্রী পেয়ে থাকে তবে সতীত্ব ও পবিত্রতার কথা স্মরণ রাখবে। যাতে মনের কষ্ট দূর হয়ে যায়। এটাই কোরআনের শিক্ষা। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

عَسٰٓى اَنْ يَّجْعَلَ فِيْهِنَّ خَيْرًا كَثِيْرًا

"অসম্ভব নয় আল্লাহতায়ালা তাদের মাঝেই অনেক বরকত ও কল্যাণ দান করবেন।" [মাজালিসে হাকিমুলউম্মত]

বৃদ্ধস্ত্রীর মূল্য

বর্তমানে অনেক লোক বৃদ্ধস্ত্রীর প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। তাদেরকে ঘৃণা করে। অথচ তাকে স্বামীই বৃদ্ধা করেছে। মাওলানা ফজলুর রহমান বলেন, পুরনো স্ত্রী দাসী হয়ে যায়। প্রথমজীবনে যদিও আনন্দ বেশি হয় কিন্তু শেষজীবনে উপকার বৃদ্ধি পায়। অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়। সেবাপরায়ণ হয়। জ্ঞানীরা উপকারকে প্রাধান্য দেয়, আনন্দকে নয়।

আমি বলি, ভালোবাসার সময় যৌবনকাল। এ সময় উভয়ের মাঝে আবেগ থাকে। পরস্পর সহানুভূতির সময় হলো উভয়ের দুর্বলতা তথা বার্ধক্যকাল। দেখা যায়, বার্ধক্যে স্ত্রী ছাড়া অন্যকেউ উপকারে আসে না। মাজাহেরে উলুম মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ মাজহার সাহেবের স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে যান। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে মাওলানা সাহেবের সম্পর্ক এতো আন্তরিক ছিলো যে, স্ত্রী অসুস্থ হলেই তিনি মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়ে চলে যেতেন। নিজহাতে স্ত্রীর সেবা করতেন। কখনোই স্ত্রীর সেবা-যত্ন চাকর-চাকরানির ওপর ছেড়ে দিতেন না।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪২ ও হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৫৫ ও ৫৫০]

একটি ঘটনা

দুর্বলতা ও সহানুভূতি বিষয়ে একটি ঘটনা মনে পড়লো। একলোক ছিলেন। সরকারের ওপরমহলে তার বড়ো সম্মান ও মূল্যায়ন ছিলো। তার স্ত্রী মারা গেলো। কালেক্টর সাহেব শোক ও সান্ত্বনা জানাতে এসে বললেন, 'আপনার স্ত্রী মারা গেছে, আমরা বড়োই মর্মাহত।'

তখন তিনি ভাঙ্গাকণ্ঠে বললেন, 'কালেক্টর সাহেব সে আমার স্ত্রী ছিলো না। সে আমার সেবিকা ছিলো। গরম গরম রুটি খাওয়াতো, বাতাস করতো, ঠাণ্ডা পানি পান করাতো।' তিনি বলছিলেন আর কাঁদছিলেন।

[নুসরাতুন্নেসায়ে মালফুজ: পৃষ্ঠা: ৫৫২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের স্বামীভক্তি

আমি বলে থাকি, ভারতবর্ষের নারীগণ অপ্সরাতুল্য। বাহ্যিক শোভা-সৌন্দর্যে নয় বরং চারিত্রিক গুণাবলিতে ভারতবর্ষের নারীদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

[আততাবলিগ]

ভারতবর্ষের নারীরা বিশেষত আমাদের অঞ্চলের মেয়েরা প্রকৃতার্থে স্বর্গীয় অপ্সরা। যাদের সম্পর্কে আরবিতে عَاشِقَاتٌ لِأَزْوَاجٍ [যারা নিজস্বামীর ভক্ত] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তারা পুরুষের জন্য নিবেদিত। পুরুষের দেয়া সবধরনের কষ্ট মুখবুজে সহ্য করে, ধৈর্য ধরে। নয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে খোলা [আপোসের মাধ্যমে নারীর তালাক প্রার্থনা]-ও তালাক হয়ে থাকে।

আরবে তালাক ও খোলার পরিমাণ ব্যাপক। আমি একুশ বছরের এক নারীকে দেখেছি, তার স্বামী ছিলো সাতটি। সেখানকার পরিস্থিতি হলো, পুরুষের সঙ্গে নারীর বোঝা-পড়া না হলেই আদালতে মামলা দায়ের করে। বিচারক সাধারণত মেয়েদেরকে নিপীড়িত মনে করে। ফলে রায় তাদের পক্ষে যায়। বিচারক পুরুষকে খোলা বা তালাকে বাধ্য করে।

ভারতবর্ষের মেয়েরা সাধারণত প্রথমেই তালাক বা খোলার কল্পনাও করে না। ভয়াবহ পরিস্থিতিতেই কেবল খোলা বা বিচ্ছেদের দাবি করে। কানপুরের একটি ঘটনা। বিচারকের কথাতে স্বামী খোলা করতে সম্মত হয়। স্বামী যখন তাকে তালাক প্রদান করে তখন মহিলা চাপড় মেরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে এবং বলতে থাকে, 'হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো। আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম।' অথচ তার আবেদনের কারণেই তালাক প্রদান করা হয়েছিলো।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১১৫]

আমি অভিজ্ঞতার আলোকে কসম করে বলছি, ভারতীয় নারীর শিরায় শিরায় স্বামীপ্রেমের ধারা প্রবাহমান।

সতীত্ব ও পবিত্রতা

নারীজীবনে পবিত্রতা ও সতীত্ব একটি গুণ, অমূল্য গুণ। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

"আল্লাহতায়ালা হুরদের প্রশংসা করে বলেন, তাদের নিজদৃষ্টি স্বামীতেই সীমাবদ্ধ রাখবে। পরপুরুষের দিকে তাকাবে না।"

ভারতবর্ষের মেয়েরা এ বৈশিষ্ট্য ও গুণের বিচারে পৃথিবীর সমস্ত দেশের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র। আমি দেখেছি, অনেক পুরুষ কুৎসিত চেহারার অধিকারী হয় কিন্তু তাদের স্ত্রীও স্বামী ছাড়া অন্যের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। বাস্তবে ভারতবর্ষের নারীরা হুরদের মতো স্বামীভক্তির অধিকারী, তাদের স্বামীরা যেমনি হোক না কেনো।

পর্দাশীল নারীরাতো অন্যের দিকে তাকায় না। যারা বাইরে বের হয় তারাও অনেক পুতঃপবিত্র। নিজের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ রাখে। ঘোমটা পরে বের হয়। রাস্তায় কাউকে সালাম পর্যন্ত করে না। তারা পুরুষদেরকে লজ্জা করে। অন্যনারী এবং বৃদ্ধা মলিহাদেরকেও লজ্জা করে। যদি কোনো পুরুষ তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করে তবে বেশির ভাগই উত্তর প্রদান করে না অথবা ইঙ্গিতেই ক্ষ্যান্ত করে। যারা বাইরে যায় তাদের অবস্থা হলো, তারা স্বামী ছাড়া পরপুরুষের প্রতি জীবনে কখনো খেয়াল করে না। শতেকের কেউ যদি খারাপ হয় তবে তা গোনায় পড়ে না। যদি কোনো নারীর মাঝে এমন দোষ পাওয়া যায় তাহলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা হয়। আমি বলি হাজারে একটি পুরুষ পাওয়া যাবে যাকে দৃষ্টি বা খেয়াল [কল্পনা] হেফাজত করে অর্থাৎ পাপদৃষ্টি ও চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকে। আর হয়তো হাজারে এমন একটি নারী পাওয়া যাবে যার চরিত্র ভালো না।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫২ ও খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৩৯]

হিন্দুস্তানের নারীরা স্বামী ছাড়া অন্যকারো দিকে ঝুঁকে পড়ে না। অনেক নারীর সারা জীবনেও পরপুরুষের কল্পনাও আসে না। যদি তারা নিজের প্রতি কারো আকর্ষণ বুঝতে পারে তাহলে তার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মায়। এটাই এখানকার রীতি, সংস্কৃতি ও আদর্শ। কিন্তু ইউরোপের কোনো নারী যদি নিজের প্রতি কারো আকর্ষণ বুঝতে পারে তবে তার খুব খাতির ও আপ্যায়ন করে। ভারতবর্ষের নারীরা স্বামীর সঙ্গেই কেবল এমন সম্পর্ক রাখে। এটা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। সতী-সাধ্বী হওয়ার উদ্দেশ্যও এটা বরং তারা এক ধাপ এগিয়ে। ভারতে নিন্দার বিষয় হলো, পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ। আরবে নিন্দার বিষয় হলো, নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য পারস্যের। তা হলো, পুরুষের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ভারতীয় নারীগণ সাধারণ এতোটা নিরীহ ও অবলা হয়ে থাকে যে, তারা কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পর্যন্ত করে না। যদি কারো বাবা-মা জীবিতও থাকে তবু ভদ্রবংশের মেয়েরা কখনো স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করে না।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪৯]
আরবের মেয়েরা আগে থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আরাম-বিলাসিতাতে কোনো কমতি দেখা দেয় তবে তারা আদালতে নালিশ করে। কিন্তু ভারতীয় নারীরা আদালতের নাম শুনলেই কাঁপতে থাকে। তারা মারা গেলেও আদালতে যাবে না। তারা আত্মীয়-স্বজন ও নিজেদের মাঝে হাজার কথা, হাজার অভিযোগ করবে কিন্তু কোর্ট-কাচারির নাম নিলে কানে হাত দেবে। আল্লাহ না করুন, কোনো বিচারকের কাছে যেনো আমাদের যেতে না হয়। আমি এটা বলি না যে, আমাদের দেশের কোনো নারীই আদালতে যায় না। হাজারে দুই-একজন এমন পাওয়া যাবে। তবে অধিকাংশ নারীই আদালতে যাওয়াকে ভয় করে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৬]

বিনয় ও ত্যাগ

আরব ও হিন্দুস্তানের কিছু অঞ্চলে নারীরা তাৎক্ষণিক আদালতে নালিশ করে দেয়। হয়তো বিচারকের রায় অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেবে নয়তো জোরপূর্বক তালাক আদায় করে নেয়া হবে। কোনো কোনো দেশে অগ্রীম মোহর আদায় করতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মেয়েরা মোহরও ক্ষমা করে দেয় এবং জীবনভর ভরণ-পোষণের কষ্ট সহ্য করে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৪১]
আরবে মোহরের ব্যাপারে প্রচলন হলো, নারীরা পুরুষের বুকের ওপর বসে তা আদায় করে নেয়। কিন্তু ভারতে তা দোষণীয় মনে করা হয়। ভারতের মেয়েরা মোহরের কথা মুখেও আনে না বরং অধিকাংশ মৃত্যুর সময় স্বামীকে মাফ করে দেয়। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৫]

অগ্রাধিকার ও উৎসর্গের মানসিকতা

নারীর মধ্যে, বিশেষত ভারতীয় নারীর মধ্যে শুধু দোষ নয় বরং অনেক গুণও রয়েছে। নারীর আত্মোৎসর্গের পরিমাণ এতো যে তারা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করবে, গলাবাজি করবে, কান্নাকাটি করবে কিন্তু তার সীমা হলো যতোক্ষণ স্বামী শান্ত ও নীরব থাকে। যখন স্বামী একটু গরম হয়ে উঠেন তখন তাদের আর পানাহারেরও হুঁশ থাকে না। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটায়। কখনো হাত থেকে পাখা নড়ে না। সেবার কোনো ত্রুটি হয় না। কেউ দেখে বলতে পারবে না, এই মানুষই কিছু আগে ঝগড়া করেছে। অর্থাৎ তখন তারা নিজেদেরকে বিলীন করে দেয়।
এমনিভাবে মেয়েদের মধ্যে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার গুণ এতো বেশি যে, প্রতিদিন পুরুষরা খাওয়া শেষ করলে তারা খাবার খায়। ভালোখাবার পুরুষের

জন্য রেখে দেয়। খাবারের তলানী ও অবশিষ্ট খাবার তারা গ্রহণ করে। যদি অসময়ে কোনো মেহমান এসে পড়ে তবে স্বামীর কথা ও তার সম্মান রক্ষার চেষ্টা করে। ঘরে যা থাকে সঙ্গে সঙ্গে মেহমানের সামনে পরিবেশন করে নিজে অনাহারে থাকে। এটা এমন পবিত্র গুণ ও বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা অর্জন হয়। অধিকাংশ পুরুষের এই গুণ থাকে না। [আত-তাবলিগঃ খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৫৪]

ভারতবর্ষের নারীদের আনুগত্য

বাস্তবেই ভারতীয় নারীরা পৃথিবীর অন্যসব নারী থেকে ভিন্ন। তারা বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, অধিকাংশ সময় বাবা-মাকে ছেড়ে দেয়। এজন্য যদি কখনো বাবা-মা বা অন্যকোনো আত্মীয়র সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তখন তারা স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করে। বাবা-মায়ের পক্ষ নেয় না। ভারতবর্ষের মেয়েরা মোহর মাফ করে দেয়। সারা জীবন থাকা-খাওয়ায় কষ্ট করে তবু কখনো কারো কাছে কোনো অভিযোগ করে না বরং নিজেরা কষ্ট করে উপার্জন করে স্বামীকে খাওয়ায়।

যদি কখনো স্বামী অবহেলা করে, কোনো রকমের মনোমালিন্যের কারণে বা বন্দি হয়ে ঘরছাড়া হয় এবং পঞ্চাশ বছর নিরুদ্দেশ থাকে, কোনো খবর না দেয় সে বেঁচে আছে না মরে গেছে এবং স্ত্রীর জীবনের কোনো উপায়-উপকরণ না থাকে এরপর স্বামী ফিরে আসে তবে স্ত্রীকে সে কোণাতেই বসে থাকতে দেখবে যে কোণাতে সে রেখে গিয়েছিলো। চোখ মেলে দেখবে কোনো স্বপ্ন ও আশা ছাড়াই সে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। সে তার শোকে পাগল হয়ে আছে। তার অবস্থা পুরুষের চেয়েও গুরুতর। এর অর্থ এই নয় যে, সে কোনো ধররেন খেয়ানত করেছে বা কারো প্রতি নজর দিয়েছে তথা লালায়িত হয়েছে। এটি এমন একটি গুণ যার বিনিময়ে পৃথিবীর সবপুরস্কার অর্জন করা যায়। এর বিনিময়ে সবদোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা যায়। [আততাবলিগ কিসাউন নেসাঃ খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৫৯]

কানপুরে দেখা গেছে, কোনো কোনো মহিলা স্বামীর অত্যাচার ও মারধরে অতিষ্ঠ হয়ে আদালতে তালাকের আবেদন করেছে। আদালতের মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়। যারা জীবনের অত্যাচার ও মারধরের কারণে তালাক নিয়েছে বটে কিন্তু তালাকের সময় হাউমাউ করে কান্নাকাটি করে। যেনো তারা মারা যাচ্ছে। মাটি ভাগ হয়ে গেলে তারা ভেতরে আশ্রয় নেয়।

এটা খুবই সাধারণ কথা– মেয়ে স্বামীভক্ত হয়। ভারতের মেয়েদের স্বামীভক্তি এতো বেশি যে, তারা জ্বলেপুড়ে মরে। এরপরও কি তাদেরকে এতো কষ্ট দেয়া উচিত? অবিবেচকের মতো তাদেরকে পৃথক করে দেয়া যায়?

[আততাবলিগঃ খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ১২]

অধ্যায় ।৩।

বিধবা নারীর আলোচনা

বিধবা নারীর বিয়ে

চরম মূর্খতার কারণে অধিকাংশ মানুষ বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিয়েকে দোষের মনে করে। কোথাও কোথাও এমন অভিশাপের কথাও জানা যায় যে, বাগদানের পর স্বামী মারা গেলেও মেয়েকে সারা জীবন অবিবাহিত রেখে দেয়। অনেক সময় বিয়ের পর মেয়েরা অল্পবয়সে বা যৌবনকালেই বিধবা হয়ে যায়। ব্যস! তার দ্বিতীয় বিয়েকে গোনাহ্ মনে করা হয়। অনেকে আবার ধর্মীয়জ্ঞান ও ওয়াজ-নসিহত শোনার কারণে দ্বিতীয় বিয়ে দোষের মনে করে না। কিন্তু মেয়ের প্রথম বিয়েকে যতোটা আবশ্যক মনে করে দ্বিতীয় বিয়েকে ততোটা গুরুত্ব দেয় না। বরং তার অর্ধেকও দেয় না। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩২]

বিধবা নারীর বিয়ে না করা জাহেলিযুগের রীতি

আরবে এ প্রথা ছিলো, যখন কোনো ব্যক্তি স্ত্রী রেখে মারা যেতো তখন সন্তান মাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে দিতো না নিজের কাছে রাখার জন্য। এই প্রথা ভারতেও আছে, বিধবাকে বিয়ে করতে দেয় না। এর প্রধান কারণ তাতে সম্পদ বণ্টন হয়ে যাবে।

ভাইয়েরা! এর সংস্কার আবশ্যক। আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজের প্রতি খেয়াল করুন এবং জাহেলিপ্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করুন।

[আজলুল জাহেলিয়্যাত ও হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৪৮]

কখন বিধবার ওপর বিয়ে ফরজ

কখনো বিধবার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে প্রথম বিয়ের মতো ফরজ। যেমন, বিধবা যুবতী হয় এবং তার বিভিন্ন আচরণে বিয়ের চাহিদাও প্রকাশ পায়, বিয়ে না দিলে ফেৎনার সম্ভাবনা আছে অথবা খাওয়া-পরার কষ্ট আছে, দারিদ্রের কারণে দীন-ধর্ম ও সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে– নিঃসন্দেহে এমন নারীর দ্বিতীয় বিয়ে করা ফরজ। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ১০৪]

কুমারীর চেয়ে বিধবার বিয়ে বেশি প্রয়োজন

যদি ঠিকভাবে চিন্তা করা হয় তবে প্রথম বিয়ের তুলনায় [যখন সে কুমারী ছিলো] দ্বিতীয় বিয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রথমে তার অভিজ্ঞতা ছিলো না। বিয়ের উপকার সম্পর্কের তার হয়তো কোনো ধারণাই ছিলো না বা শুধু পুঁথিগত

জ্ঞান ছিলো। আর এখন তার চাক্ষুসজ্ঞান তথা বিয়ের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। এই সময়ে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণার সম্ভাবণা বেশি। যার কারণে কখনো স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, কখনো সম্ভ্রম নষ্ট হয়, কখনো ধর্ম আবার কখনো সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৩২]

কুমারী মেয়ের তুলনায় বিধবার প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক

মানুষের সাধারণ ধারণা, কুমারী মেয়ের দেখভাল বেশি প্রয়োজন। বিধবা মেয়ের প্রতি নজরদারির প্রয়োজন মনে করে না। এই ধারণা হিন্দুদের থেকে গৃহীত। এর কারণ, যদি কুমারী মেয়ের নামে কিছু ছড়িয়ে পড়ে তবে তাতে দুর্নাম হবে। কিন্তু বিবাহিত মেয়ের নামে কিছু ছড়ালে বদনাম হবে না কারণ তার স্বামী আছে। বিষয়টা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে। আসলে ধারণার ভিত্তি নিছক অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষ যখন ধর্মবিমুখ হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধিও লোপ পায়। আর যদি বিবেক-বুদ্ধির আলোকেও বিচার করা হয় তবুও দেখা যাবে, বিবাহিত মেয়ের প্রতি লক্ষ রাখা বা নজরদারি করা যতোটা আবশ্যক কুমারী মেয়ের প্রতি লক্ষ রাখা ততোটা আবশ্যক নয়। রহস্য হলো, খোদাপ্রদত্তভাবে কুমারী মেয়ের মধ্যে লজ্জা ও শালীনতার স্তর অত্যন্ত প্রখর হয়। তার মাঝে একটি প্রকৃতিগত প্রতিবন্ধকতা থাকে। বিবাহিত মেয়ের শালীনতার পর্দা খুলে যায়। তার মধ্যে প্রকৃতিগত পর্দা থাকে না। এজন্য তার পবিত্রতা ও নিরাপত্তার জন্য জোরালো নজরদারি প্রয়োজন। যেহেতু কুমারী মেয়ের দুর্নামের সম্ভাবনা বেশি আর বিবাহিত মেয়ের দুর্নামের সম্ভাবনা কম তাই কুমারী মেয়ের তুলনায় বিবাহিত নারীরা যৌনতার প্রতি বেশি আসক্ত। নিরাপত্তাব্যবস্থা কুমারী মেয়ের চেয়ে বেশি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ করে এর উল্টো। আজ তাদের কাছে নারীর পবিত্রতা ও নিরাপত্তার গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব কেবল নিজের সুনাম আর বদনামের। [আজলুল জাহেলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৬৮]

বিধবা নারীর বিয়ে না করার কুফল

অনেক জাতির মধ্যে এই অজ্ঞতা এখনো বিরাজ করছে, তাদের বিধবা মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া হয় না। অনেক সময় তারা দারিদ্রের কারণে খাবার-কাপড়ের প্রয়োজন হয়। সামাজিক মর্যাদার কারণে তারা অন্যের বাড়িতে কাজও করতে পারে না। আর যদি অন্যের বাড়িতে কাজ করে তবে অনেক সময় সে বাড়িতে থাকার প্রয়োজন হয়। যেহেতু তার কোনো আশ্রয় নেই

এজন্য দুশ্চরিত্রের লোকেরা তার ওপর চড়াও হয়। কখনো নিজের আগ্রহে, কখনো ভয়ে বা অন্যকোনো লাভের কথা চিন্তা করে বিশেষ করে তার মধ্যে যখন কাম-প্রবৃত্তি থেকে যায় সে নিজের দীন-ধর্ম ও সম্ভ্রম নষ্ট করে দেয়, বিকিয়ে দেয়। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩২]

বিধবা না চাইলেও তাকে বিয়ে দেয়া উচিত

অনেকে বলেন, আমরা তাকে [বিধবাকে] জিজ্ঞেস করেছিলাম সে রাজি হয়নি। এ ব্যাপারে আমার কিছু কথা আছে। আসলে যেভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় সেভাবে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো? কথার কথা বলে দায়িত্ব শেষ করে দিলেন? জিজ্ঞেস করলে বিধবা অস্বীকার করবে যাতে স্বামীর পক্ষের আত্মীয়রা বলে সে তো অপেক্ষায় ছিলো, স্বামীকে ভয় করতো। দুর্নামের ভয়ে সে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। উচিত হলো, তাকে বারবার বিয়ের উপকার ভালো মতো বুঝানো। মনের দ্বিধা কাটানো। ভালোবাসা ও গুরুত্ব নিয়ে কথা বলা। তাকে বুঝানো– বিয়েতেই লাভ আর একা থাকলে ক্ষতি। যদি এরপরও রাজি না হয় তবে তা অপারগতা হবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৩২]

উপযুক্ত সন্তান থাকলে বিধবার দ্বিতীয় বিয়ে না করলে ক্ষতি নেই

যথাসম্ভব বিধবা নারীকে বিয়ে দেয়াই ভালো। কিন্তু যদি বিধবা সন্তানের মা হয়, পড়ন্ত বয়সের হয়, থাকা-পড়ার ব্যবস্থা থাকে, আবার বিয়ে করতে অমত হয়, আচার-আচরণে স্বামীর প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ না পায় তবে তাকে নিয়ে বিয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩২]

বিধবানারীর প্রতি শ্বশুরবাড়ির অবিচার

কোনো মুসলিমসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলন আছে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষের লোকেরা নিজেদের অধিকার মনে করে। অর্থাৎ মা-বাবা তার অভিভাবক নয়; দেবর-শ্বশুর তার অভিভাবক ও মালিক। সে নারী নিজে নিজের মালিক থাকে না। সে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করতে পারে না। বাবা-মা তাকে বিয়ে দিতে পারে না বরং স্বামীর বড়োভাই যেখানে বিয়ে দিতে চান সেখানে হবে। যেমন, শ্বশুর চাইলো তার ছোটোছেলের সঙ্গে বিয়ে হোক আর মা-বাবা চাইলো অন্যত্র বিয়ে দিতে। তখন বাবা-মায়ের কর্তৃত্ব চলবে না। সাধারণত তারা চায়– এই বউ ঘরের বাইরে না যাক।

কানপুরে একমেয়েকে জোরপূর্বক দেবরের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। মেয়েটি বাধ্য হয়। কারণ যদি শ্বশুরের কথা না শুনে তবে খাবার-কাপড় মিলবে না। আমার

কাছে একলোক এসে বলে, আমার ভাবী আমার হক বা অধিকার। সে অন্যত্র বিয়ে করতে চাচ্ছে। আপনি একটি তাবিজ দিন যাতে সে আমার সঙ্গে বিয়ে করতে রাজি হয়। অন্যএক মহিলা নিজের পুত্রবধূকে একবাচ্চাছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়। আফসোস! মহিলাদের বিবেকের উপরতো পর্দা আগে থেকেই ছিলো এখন পুরুষের বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। তারাও বিষয়টি লক্ষ করে না। তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না।

নানুতা'য় একবিধবা মহিলার বিয়ে হয়। তার অসম্মতিতেই তাকে বিদায় করা হয়। বলা হয়, তাকে সেখানে নিয়ে রাজি করে নিয়ো। এখানে একমহিলার ইদ্দত [স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর মহিলা যে সময়টুকু নতুন বিয়ে থেকে বিরত থাকে] চলাকালীন বিয়ে হয়। আমি জিজ্ঞেস করলে বলে, বিয়ের নিয়তে নয় এমনি সম্পর্কটা জুড়ে দিলাম যাতে অন্যকারো সঙ্গে বিয়ে করতে না পারে। কিন্তু বেকুব এরপর আর বিয়ে করেনি।

মানুষ অভিযোগ করে বলে, ধ্বংস এসে গেছে, মহামারি এসে গেছে। মানুষ যখন এমন বৈধতার আবরণে অবৈধ কাজ করে তখন মহামারি না এসে যাবে কোথায়? [আজলুল জাহিলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৭৪]

অবিচারের ওপর অবিচার

নারীদের ওপর এতোটাই অবিচার হচ্ছে যে, মানুষ তাদের ওপর সবধরনের কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করে এবং তার প্রভাব এতোটাই বিস্তৃত যে, নারীরাও নিজেদেরকে তাদের মালিকানাধীন মনে করে। সে জানেও না তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি

ধরা যাক, কোনো স্বামী মারা গেলো এবং সে কোনো সম্পদ রেখে গেলো না। শুধু স্ত্রী রেখে গেলো। শ্বশুর পুত্রবধূর জন্য কষ্টে পড়ে যায়। তবু স্ত্রী এখান থেকে যায় না। কারণ এটা তার বাড়ি। যেখানে পাল্কি চড়ে এসেছে সেখান থেকে খাটিয়ায় চড়ে বের হবে। যেহেতু সে এদের মালিকানাধীন মনে করে তাই নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক থাকে না। এখন সে শ্বশুরের ওপর নিজের অধিকার কামনা করে এবং যা তাদের ওপর কষ্টকর হয়ে যায়। খুব ভালো! এটাই তোমার শাস্তি। এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে, মালিকানাধীন বস্তুই মালিকের ওপর জুলুম করছে। [আজলুল জাহেলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৮৩]

শরিয়তবিরোধী মূর্খতাপূর্ণপ্রথা

মূর্খমানুষের একটি বোকামি হলো তারা পুত্রবধূকে নিজের মালিকানাধীন জিনিস মনে করে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মেয়েকে নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথাও বলতে দেয় না। নিজেদের অধিকার মনে করে। এটা প্রথম গোনাহ। মা-বাবার অধিকার হরণ করা– এটা দ্বিতীয় গোনাহ। তৃতীয়ত যুবতী তথা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের অধিকার আছে সে যেখানে খুশি বিয়ে করবে। তারা এই অধিকারও হরণ করে। এটা শরিয়তের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ। নারীর স্বাধীনতা হরণ। বাবা-মায়ের অধিকার লংঘন। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আফসোস! তারা নিজেদের প্রশংসার দাবিদার মনে করে যে, তারা বিধবাকে বিয়ে দিয়েছে। অথচ তারা বিয়ের কোনো উপকার ও কল্যাণ অবশিষ্ট রাখেনি। আরবেও এমন অবিচার চলতো। রাসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] আগমন করে তা নির্মূল করেন। তিনি বলেন, "ছয়ধরনের মানুষের ওপর আমি, আল্লাহতায়ালা ও ফেরেশতাগণ অভিশাপ করেন।" তার মধ্যে একজন হলো যারা জাহেলিপ্রথা পুনরুজ্জীবিত করে। আর এখানে তোমরা তা শরিয়তের বিরোধিতার সঙ্গে করছো। আল্লাহর ওয়াস্তে এই কুফরিপ্রথা পরিহার করো। এই জাহেলিপ্রথা নির্মূলের চেষ্টা করো। [আজলুল জাহিলিয়্যাতঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৮৪]

জোরপূর্বক বিয়ে

অনেকে বলেন, আমরা তার [বিধবা] মুখে 'ইজ্ন' বলিয়েছি। অর্থাৎ অনুমতি নিয়েছি। কিন্তু এই অনুমতিগ্রহণ কেবল গা বাঁচানোর জন্য। যাতে কেউ বলতে না পারে– জিজ্ঞেস না করেই বিয়ে দিয়েছে। শরিয়তের বিধান হলো, বিধবার বিয়ে মুখে না বললে বৈধ হয় না। প্রকৃত মনোবাসনা বা সন্তুষ্টির তোয়াক্কা সেখানে করা হয় না। কখনো জিজ্ঞেস না করেই বিয়ে দিয়ে দেয়। অনেকে মুখে স্বীকারোক্তি আদায় করে। তবুও এটা তার প্রতি অবিচার। কারণ এরা নিজেদেরকে মালিক মনে করে স্বীকারোক্তি আদায় করে। অপরদিকে তারা বাবা-মায়ের অধিকার স্বীকার করে না।

বিধবানারীর প্রতি শ্বশুরবাড়ির করণীয়

স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবানারীকে স্বামীর সম্পদের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে। এরপর ইদ্দতপালন শেষে তাকে বাবা-মায়ের কাছে অর্পণ করতে হবে। নিজের ঘরে রাখা যাবে না। কারণ যতোদিন স্বামীর বাড়ি থাকবে ততো মালিকানার ধারণা দূর হবে না। এজন্য আবশ্যক হলো তাকে প্রাপ্যসম্পদ বুঝিয়ে দিয়ে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেয়া। তারা তাকে বসিয়ে রাখুক বা বিয়ে দিক। [আজলুল জাহিলিয়্যাতঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৮৪]

কুফু বা সমতাবিধান

অধ্যায় ।৪।
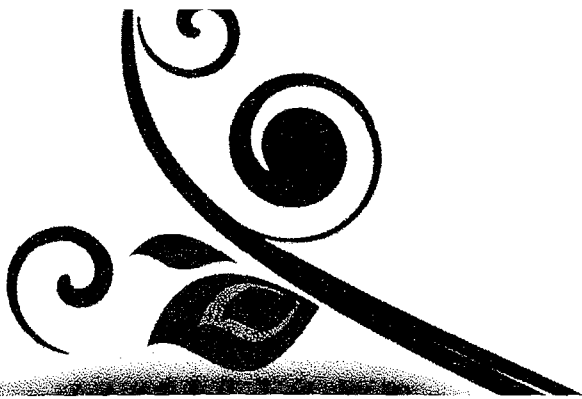
প্রথম পরিচ্ছেদ

কুফুর গুরুত্ব ও অমান্যের কুফল

ইসলামিশরিয়ত কুফু বা বিয়েতে নারী-পুরুষের সমতাবিধানের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুণের বিবেচনা করেছে। উত্তম হলো, নিজের সমপর্যায়ের কোনো নারীকে বিয়ে করা। কারণ, অসম তথা অন্যস্তরের মানুষের চরিত্র ও অভ্যাস অধিকাংশ সময় ভিন্ন হয়। ফলে তাদের মাঝে সবসময় তিক্ততা লেগে থাকে। তাহলে একজন মুসলিমনারীকে সারাজীবন অবমূল্যায়ন করার কী প্রয়োজন? তাছাড়াও সামাজিকভাবে তাদের সন্তান বিয়ে দিতে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে সে দুর্দশায় কেনো জড়াবে?

যদি সন্তান অসম কোনো নারী থেকে হয় তাহলে পরিবারের লোকেরা তাদেরকে সমকক্ষ মনে করে না। তখন তাদের বিয়ে দিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ২৫-১১২]

তাছাড়া অসমপর্যায়ে বিয়ে করা আত্মমর্যাদাবোধ ও কল্যাণপরিপন্থী। সম্ভ্রান্ত মহিলাকে নিচুস্তরের মানুষের শয্যাসঙ্গী হতে হয়। এমন হলে অধিকাংশ সময় নারীরা নিজের স্বামীর মূল্যায়ন করতে পারে না। এতে বিয়ের সবকল্যাণ দূর হয়ে যায়। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ১১২।

কুফুর প্রয়োজনীয়তা ও তার মাপকাঠি

কুফুর ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়– লজ্জা দূর করা। অর্থাৎ মূলভিত্তি হলো লজ্জাস্কর হওয়া না হওয়া। আর লজ্জার ভিত্তি সমাজিক প্রচলন। [এমদাদুল ফতোয়া: পৃষ্ঠা: ৩৭১]

কুফুর ক্ষেত্রে পুরুষের দিক বিবেচনা করা হবে

বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার থেকে নিচু স্তরের হবে না। বরং মহিলা নিচু স্তরের হবে। অনেকে বলেন, নিচু স্তরের ছেলের কাছে মেয়ে দাও। কিন্তু নিচু স্তরের মেয়ে ঘরে এনো না। কেননা নিচু স্তরের মেয়েলোক ঘরে আনলে তার থেকে যে সন্তান হবে তার দ্বারা স্বামীর বংশের অধঃপতন হবে। আর নিচু স্তরের ঘরে মেয়ে যায় তাহলে সে বংশ উজ্জ্বল করবে। অথচ সম্পূর্ণ ভূল। শরিয়তের সঙ্গে ঠাট্টার শামিল। ইসলামিফিকাহ বা আইনে কুফুর বিধান হলো–

اَلْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ جَانِبِهِ اَيِ الرَّجُلِ لِاَنَّ الشَّرِيْفَةَ تَاْبٰى اَنْ يَّكُوْنَ فِرَاشًا لِلدَّنِيِّ
وَلَا تُعْتَبَرُ مِنْ جَانِبِهَا لِاَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَفْرِشٌ فَلَا تُغِيْضُهُ-

"সমতা পুরুষের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। কেননা সম্ভ্রান্ত তথা বংশীয় নারী নিচুস্তরের পুরুষের শয্যাসঙ্গী হতে চায় না। নারীর ক্ষেত্রে সমতা বিবেচ্য নয় কেননা পুরুষ শয্যাধিকারী। সে শয্যা ব্যবহারে অপছন্দ করে না। এটা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য।" [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ১১২]

কুফু ছাড়া বিয়ে হওয়া না হওয়ার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

কুফু বা সমতাহীন বিয়ের কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। কিছু অবস্থায় বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়। কিছু অবস্থায় সঠিক ও আবশ্যক হয়ে যায়। যা ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকে না। কিছু অবস্থায় বিয়ে হয়ে যায় তবে ভেঙ্গে দেয়ার সুযোগ থাকে।

প্রথম অবস্থা : প্রাপ্তবয়স্ক নারী যদি অভিভাবক ও আত্মীয়ের অনুমতি ছাড়া কুফু তথা সমতা ছাড়া কোথাও বিয়ে করে তাহলে ফতোয়া হলো তার বিয়ে ঠিক হবে না বরং বিয়ে সম্পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য হবে। বিয়ের পর যদি অভিভাবক ও আত্মীয় অনুমতি প্রদান করে তবুও বিয়ে ঠিক হবে না। কেননা বিয়ের অনুমতি আগে হওয়া আবশ্যক। এজন্য মেয়েদের উচিত এমন কাজ কখনো না করা। যদি করে তাহলে বিয়ে সঠিক না হওয়ার কারণে সবসময় বিপদে পতিত থাকবে। [দুররুল মুখতার]

দ্বিতীয় অবস্থা : পিতা বা দাদা যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে নিজেদের অদূরদর্শী চিন্তা-ভাবনা থেকে সমতাহীন কোনো জায়গায় বিয়ে দেয় এবং পিতা-দাদা মন্দপ্রকৃতিরলোক হিসেবে পরিচিত না হন। তাহলে এই বিয়ে আবশ্যক হয়ে যায়। তা ভেঙ্গে দেয়ার কোনো অধিকার থাকে না।

তৃতীয় অবস্থা : পিতা বা দাদা ছাড়া অন্যকোনো আত্মীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে অসম কোনো স্থানে বিয়ে দেয় অথবা দাদা অসমস্থানে বিয়ে দেয় কিন্তু সে মন্দলোক হিসেবে পরিচিত হয় বা মাতাল অবস্থায় বিয়ে দেয় তাহলে এই বিয়েও বাতিল বিবেচিত হবে।

চতুর্থ অবস্থা : প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যদি অভিভাবকের অনুমতিতে অসম কোনো স্থানে বিয়ে করে তাহলে বিয়ে সঠিক ও আবশ্যক হয়ে যায়। তা ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার থাকে না। [আলহিলাতুল নাজেজাঃ পৃষ্ঠাঃ ১০৪-১০৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাত-কূলের পরিচয়

ইসলামিশরিয়তে কুফু বা সমতা বিধানের ক্ষেত্রে যেসব গুণের বিবেচনা করা হয় বংশ বা কূল তার অন্যতম। [এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৯]

বংশীয় সমতা সামাজিকভাবে নির্ধারিত হবে। মানুষের প্রকৃতিগত বা সত্ত্বাগত ভদ্রতা ও সম্মান তা ধর্মীয় মানদণ্ডে হোক বা জাগতিক মানদণ্ডে হোক তা-ও বংশের মতো বিবেচ্য বিষয়। যেমন ফিকাহবিদদের ভাষ্য دِيَانَةً وَمَالًا وَحِرْفَةً [ধর্ম, সম্পদ ও পেশাগত দিক থেকে] তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর ভিত্তিও সামাজিক রীতি। [এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৯]

জাতিগত বৈচিত্র্যের রহস্য

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো।"

যার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত আমাদের কাছের বা দূরের আত্মীয়। যাতে তাদের অধিকার আদায় করা হয়। এখানে আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি তৈরির রহস্য বর্ণনা করেছেন। তা হলো পরস্পর পরিচিত হওয়া। সে আনসারি আর তিনি সিদ্দিকি কিংবা ইনি ফারুকি বা থানভি– যদি এমন পার্থক্য না থাকতো তাহলে পৃথক করা কঠিন হয়ে যেতো। কেননা নাম পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এক নামে বহুমানুষ থাকে। কোনো ভিন্ন বাসস্থানের হয় যেমন, একজন দিল্লির অপরজন লক্ষ্মৌ ইত্যাদি। তবুও একশহরে একনামে বহুমানুষ থাকে। তখন মহল্লা হিসেবে পার্থক্য করা যায়। যদি একমহল্লায় একনামে একাধিক লোক থাকে তখন বংশ বা গোত্র হিসেবে পার্থক্য করতে হয় গোত্রের পার্থক্যের কারণে।

কিন্তু আজ মানুষ বংশীয় পরিচয়কে দাম্ভিকতার হাতিয়ার বানিয়েছেন। এখন দুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক বংশ ও বংশীয় মর্যাদার মূলোৎপাটন করে ফেলেছে। তাদের ধারণা, কোরআনশরিফে জাতি-বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য হিসেবে কেবল পরস্পর পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে লক্ষ করে তারা বংশের ভিত্তিতে মর্যাদার পার্থক্য বা বংশীয় মর্যাদা অস্বীকার

করেছে। বরং তাদের কাছে দেহলভি, লৌক্ষ্মবি, হিন্দুস্তানি, বাঙালি সম্বোধন যেমন শুধু পরিচয়ের জন্য, এ দ্বারা কোনো মর্যাদালাভ করা যায় না। তেমনি কোরায়শি, সাইয়েদ, ফারুকি, উসমানি ইত্যাদি উপাধিও পরিচয়ের জন্য, এর দ্বারা কোনো মর্যাদালাভ করা যাবে না। তাদের প্রমাণ لِتَعَارَفُوْا অর্থাৎ বংশ শুধু পরিচয়ের জন্য। এখানে সম্মানের কিছু নেই।

কিন্তু এই আয়াতের সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং হাদিসের প্রতি খেয়াল করতে হবে। [আততাবলিগ : খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ২১৭]

বংশীয় মর্যাদার মূলকথা

১. মহান আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

"এবং আমি নুহ ও ইব্রাহিমকে [নবি হিসেবে] প্রেরণ করেছি। নবুওয়ত ও কিতাব তার বংশের জন্য নির্ধারণ করেছি।"

এর দ্বারা বুঝা যায়, নুহ ও ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর পর নবুওয়ত তাদের বংশের জন্য সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর বংশের জন্য এই মর্যাদা অর্জিত হলো যে, ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত নবুওয়ত ও কিতাব তাঁর বংশের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

২. হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا

"মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মতো খনিতুল্য। তাদের মধ্যে যারা জাহেলিযুগে উত্তম ছিলেন তারা ইসলামের যুগেও উত্তম যখন তারা ইলম অর্জন করে।"

অনেকে ধারণা করেছেন, ওপর্যুক্ত আয়াতের মধ্যে যে শর্ত করা হয়েছে إِذَا فَقِهُوْا অর্থাৎ 'যখন জ্ঞান অর্জন করবে' তখন তা বংশীয় লোকদের প্রতি সম্মানহানীকর। অথচ এটা সম্মানহানীকর নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] জ্ঞানার্জন করার পর জাহেলিযুগের উত্তমব্যক্তিকে ইসলামের যুগে উত্তম বলেছেন। সুতরাং ফিকাহ তথা জ্ঞানার্জন করার পর আর সমতা রইলো না বরং বংশীয় জ্ঞানীব্যক্তি এবং বংশীয় নন এমন জ্ঞানীব্যক্তি সমান নয়। বরং বংশীয় জ্ঞানীব্যক্তি অধিক উত্তম। এখানে প্রাধান্য দেয়ার উপযুক্ত কারণ রয়েছে।

এটাও ঠিক যে, বংশীয় মূর্খব্যক্তি থেকে অবংশীয় আলেম বা জ্ঞানী উত্তম। এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু হাদিস থেকে এটাও জানা যায়, বংশীয় মর্যাদা বলতে একটা জিনিস অবশ্যই আছে। জ্ঞান ও ফিকাহ যোগ হলে অবংশীয় লোক বংশীয় লোক থেকে উত্তম বলে গণ্য হবে।

৩. হাদিসশরিফে আরো বলা হয়েছে,

اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

"ইমাম বা নেতা কোরাইশ থেকে হবে।"

অবশ্যই কোনো কারণেই রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কোরাইশের জন্য নেতৃত্ব নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ জাতীয় নেতৃত্বের জন্য কোরাইশি হওয়া শর্ত করেছেন। আর অন্যান্য নেতৃত্বের জন্য বংশীয় মর্যাদাকে প্রাধান্যের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ঘোষণা থেকে জানা যায়, বংশীয় লোকদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি অধিক পরিমাণ বিদ্যমান। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ১১২]

নেতৃত্ব কোরাইশ থেকে হওয়া রাষ্ট্রীয় শৃখংলার জন্য কল্যাণকর। স্বভাবজাতভাবেই আল্লাহ কোরাইশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যখন তারা নেতা ও সর্দার হবে তখন অন্যদের আনুগত্য করতে লজ্জাবোধ না হয়। অন্যদের আনুগত্য করতে তাদের লজ্জাবোধ হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মানুষ তার বংশীয় ঐতিহ্য গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করে। সুতরাং কোরাইশগণ নেতা হলে ইসলাম দু'ভাবে সংরক্ষিত হবে। **এক.** ইসলাম তাদের ঘরের জিনিস। **দুই.** ধর্মীয় সম্পর্ক। এর থেকে বুঝা গেলো, বংশের মাঝে সামাজিক কল্যাণ ও দায়িত্ববোধ রয়েছে। সুতরাং তা নিষ্ফল নয়। যে পার্থক্য আল্লাহ করে দিয়েছেন তা কে মিটাবে?

[হুকুকুল জাওজাইন, ওয়াজে ইসলাহুন নেসা; পৃষ্ঠা: ১৯৩]

৪. হাদিসের অংশ বিশেষ; রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেছেন,

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ-

"আমি মিথ্যানবি নই। আমি বনু আব্দুলমোত্তালিবের বংশধর।"

হোনাইনের যুদ্ধে যখন হজরত সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] পিছু হটে গেলেন তখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নিজের ঘোড়া সামনে বাড়ালেন এবং বললেন, 'আমি সত্যনবি। আমি আব্দুলমোত্তালিবের বংশধর। অর্থাৎ আমি উচ্চবংশীয় ও উত্তম পরিবারের সদস্য। আমি কখনো পিছু হটবো না। এখানে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নিজ বংশ নিয়ে গর্ব করলেন। শত্রুকে ভয় দেখালেন– আমাকে ছোটো মনে করো না। তিনি

উচ্চবংশের লোক, যাদের বীরত্বের কথা সবাই জানে। যদি বংশের কোনো মর্যাদা না থাকতো তবে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কেনো বললেন, আমি আব্দুলমোত্তালিবের বংশধর?

৫. অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "আল্লাহতায়ালা ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর বংশধরদের মাঝে ইসমাইল [আলায়হিস সালাম]-কে নির্বাচন করেছেন। ইসমাইল [আলায়হিস সালাম]-এর বংশধরদের মাঝে কেনানাকে নির্বাচন করেছেন। আর কেনানার বংশধর থেকে কোরাইশকে নির্বাচন করেছেন। কোরাইশ থেকে বনুহাশেমকে। বনুহাশেম থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন।"

৬. হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِ خَلْقِهِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِ الْفِرْقَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِيْ مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِ بَيْتٍ فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا

"আল্লাহতায়ালা সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে উত্তম সৃষ্টির অন্তর্গত করেছেন। এরপর তাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তমলোকদের দল তথা আরবজাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর আবরদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে রেখেছেন উত্তমগোষ্ঠি তথা কোরাইশে শামিল করেছেন। এরপর তাদেরকে বিভিন্ন বংশে বিভক্ত করেছেন এবং উত্তমবংশ বনুহাশেম থেকে বানিয়েছেন। সুতরাং আমি জাতি, গোষ্ঠি ও বংশের বিবেচনায় সবচেয়ে উত্তমব্যক্তি। [তিরমিজি]

ওপর্যুক্ত উদাহরণ থেকে প্রমাণ হয়, বংশীয় সম্পর্ক সম্মানের দাবিদার। যদিও সম্মান পাওয়া আবশ্যক নয়। কেননা সম্মানের ভিত্তি হলো খোদাভীতি। বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরুলোকেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী।"

[আততাবলিগ ও ওয়াজুল আকরামিয়্যা: খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ২২২]

বংশীয় সম্মান আল্লাহর দয়া, তা নিয়ে অহংকার করা নাজায়েজ

বংশীয় মর্যাদা মানুষের ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় নয়। যা ইচ্ছা করলেই অর্জন করা যায়। সুতরাং তা নিয়ে অহংকর করা যাবে না। কিন্তু তা আল্লাহর বিশেষ দান হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মানবিক যুক্তিতে অহংকার-গর্ব

সেসব বিষয়ে হয়ে থাকে যা মানুষের ইচ্ছাধীন। যেমন, মানুষের জ্ঞান এবং ভালোকাজ। কিন্তু শরিয়তের আলোকে এসব বিষয়েও গর্ব করা উচিত নয়।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৭০]

বংশ নিয়ে গর্ব করা, অহংকার করা সর্বাবস্থায় হারাম। আজ অভিজাত শ্রেণী বংশ নিয়ে অহংকার করেন। আর অভিজাত নয় এমন শ্রেণীর মাঝে অহংকার অন্যভাবে– তারা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণীর সমকক্ষ মনে করে। তাদের সঙ্গে নিজেদের কোনো পার্থক্য স্বীকার করে না। এটাও বাড়াবাড়ি।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৯৩]

বংশ নিয়ে গর্ব করতে নেই। তার অর্থ এই নয় যে, বংশীয় মর্যাদা বলতে কিছু নেই। যেমন, মানুষের সুন্দর ও অসুন্দর হওয়া, অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হওয়া যদিও কোনো ইচ্ছাধীন বিষয় নয় এবং তা নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। তবুও কেউ কি বলবে, সুন্দর হওয়া আল্লাহর বিশেষ দান নয়। নিশ্চয় আল্লাহর অতি মূল্যবান দান। তেমনিভাবে বংশীয় মর্যাদা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় না হওয়ায় তা নিয়ে গর্ব করা যায় না। কিন্তু তা আল্লাহর অনুগ্রহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২১৮]

বংশীয় সমতার ক্ষেত্রে বাবা বিবেচ্য, মা নয়

একটি বড়ো ভুল হলো, বংশের ক্ষেত্রে মাকেও বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ কারো মা অভিজাত না হলে তাকে অভিজাত বলা হয় না। তাকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না। অথচ শরিয়ত কুফু বা সমতার ক্ষেত্রে বাবাকে গণ্য করে, মাকে নয়। এমনিভাবে বংশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে মায়ের বিবেচনা করা হয় না। যেমন, কোনো ব্যক্তির মা শুধু বনুহাশেমের, তার জন্য জাকাত নেয়া বৈধ। সুতরাং কেবল কারো বাবা যদি অভিজাত বংশের হয় তাহলে সে ওইব্যক্তির সমকক্ষ বিবেচিত হবে যার বাবা-মা দুইজনই অভিজাত বংশের।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৮]

শরিয়তের প্রমাণ

আরববাসীরাও নারী তথা মায়ের কারণে বংশ-মর্যাদায় কোনো ত্রুটি ধরেন না। কারণ, আল্লাহতায়ালা মায়ের বংশ বিবেচনা করার মূলোৎপাটন এমনভাবে করেছেন যে, এ ব্যাপারে কারো প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। হজরত ইবরাহিম [আলায়হিস সালাম]-এর দু'জন স্ত্রী ছিলো। একজন সারাহ; তিনি বংশীয় ছিলেন। অপরজন হাজেরা; তিনি ছিলেন দাসী। হজরত ইসমাইল [আলায়হিস সালাম] তাঁরই সন্তান। যিনি আরবজাতির পিতা। সমগ্র আরবের মূলে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন একজন দাসী।

ভারতবর্ষের যেসব জাতি-গোষ্ঠি নারীর ক্রুটির কারণে অন্যবংশের যে সমালোচনা করে তা সমালোচনার ধুম্রজাল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দোষের কিছু নয়। ইসলামিশরিয়তে বংশবিচারে মায়ের কোনো বিবেচনা নেই।

[আততাবলিগ ও ওয়াজুল আকরামিয়্যাঃ খণ্ডঃ ১৮, পৃষ্ঠাঃ ২২৪]

সাইয়েদের মাপকাঠি : প্রকৃত সাইয়েদ কারা

সবার ব্যতিক্রম হলো, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর পবিত্র বংশধারা হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে প্রমাণিত হবে। তাঁর বংশে যারা জন্মগ্রহণ করবে তারা সাইয়েদ এবং বনুহাশেম থেকেও উত্তম। মূলকথা, বংশের ক্ষেত্রে মায়ের কোনো বিবেচনা নেই। কিন্তু হজরত ফাতেমার সন্তানদের ক্ষেত্রে মায়ের বিবেচনা করা হবে। কেননা সাইয়েদ বংশের মহত্ত্বের মূলমন্ত্র হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]। অন্যান্যদের উপর সাইয়েদদের সম্মান তাঁর জন্য।

এখানে আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর অনেক বংশধরের ভুল প্রমাণিত হয়। তারা নিজেদেরকে সাইয়েদ বলেন অথচ সিয়াদাত [সাইয়েদ হওয়া]-এর ভিত্তি হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] নন বরং হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহু]। হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর যেসব সন্তান হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে হয়েছে তারা সাইয়েদ; অন্যান্য স্ত্রীগণ থেকে যারা হয়েছেন তারা সাইয়েদ নন। সুতরাং আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বংশধরদের সাইয়েদ দাবি করা ভুল বরং তারা হাশেমি। বনুহাশেমের মর্যাদা তারা লাভ করবেন।

অনেক উলুয়্যি [হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর এমন সন্তান যারা হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে নয়] নিজেদের নামে সাইয়েদ লিখেন। এটা নাজায়েজ। কেননা সাইয়েদ পরিভাষার সম্মান রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] থেকে হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তবে হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর অন্যান্য স্ত্রীর সন্তানগণ শায়েখ বিবেচিত হবেন। খোলাফায়ে রাশেদিন [রদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর সন্ত ানদের শায়েখ বলা হয়। [ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাঃ খণ্ডঃ ১; পৃষ্ঠাঃ ১৩]

যদি কোনো ব্যক্তির বাবা সাইয়েদ না হন এবং মা সাইয়েদা হন তাহলে সে ব্যক্তি নামের শেষে সাইয়েদ লিখতে পারবে না। হ্যাঁ, মা সাইয়েদা হওয়ায় সে বিশেষ মর্যাদালাভ করবেন। যদি নেসাব (জাকাত ফরজ হওয়ার নির্ধারিত পরিমাণের সম্পদ) পরিমাণ সম্পদের মালিক না হন তাহলে তার জাকাতগ্রহণ করা বৈধ। মোটকথা, বংশের ক্ষেত্রে মায়ের বিবেচনা করা হবে। তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মানুষের স্বাধীনতা ও দাসত্বের নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে মায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের বংশতালিকা এবং একটি পর্যালোচনা

আমার সন্দেহ হয়, উপমহাদেশে যারা নিজেদেরকে অভিজাত দাবি করেন তারা আসলে অভিজাত কী-না। আশ্চর্য ব্যাপার, এখানে যে পরিমাণ শায়েখ; কেউ নিজেকে সিদ্দিকি, কেউ ফারুকি, কেউ ওসমানি, উলুয়্যি আবার কেউ আনসারি দাবি করেন। তাহলে কি [নাউজুবিল্লাহ] এই চার-পাঁচজন সাহাবা [রদিয়াল্লাহু আনহুম] ছাড়া অন্যান্য সাহাবা [রদিয়াল্লাহু আনহুম] নির্বংশ ছিলেন? কেউ নিজেকে হজরত বেলাল ইবনে বারাহ [রদিয়াল্লাহু আনহু] কিংবা হজরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বংশধর দাবি করে না। সবাই ওই চার-পাঁচজনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। এজন্য সন্দেহ হয়, এরা সবাই কৃত্রিম বন্ধু। বিখ্যাত এবং খ্যাতিসম্পন্ন সাহাবাদের নিজেদের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে।

এই সন্দেহের কথা অধম [লেখক] বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানে বলেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ কয়েকজন সাহাবার সঙ্গে বংশপরম্পরা মিলিয়ে থাকেন। যেমন, চার খলিফা আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলি [রদিয়াল্লাহু আনহুম]; হজরত আব্বাস, হজরত আবুআইয়ুব আনসারি [রদিয়াল্লাহু আনহুম] প্রমুখ। ভাবনার বিষয় হলো, ভারতবর্ষ বিজয়ের জন্য কি বিশেষভাবে এই কয়েকজন সাহাবার সন্তানদের নির্বাচিত করা হয় না-কি অন্যদের বংশধারা থেমে গিয়েছিলো? আর এই দুটি সম্ভাবনাই দুঃসাধ্য। এখানেই সন্দেহ হয়, সম্ভবত তারা এসব সাহাবা [রদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর সঙ্গে বংশধারা মিলিয়ে গর্ব করতে চায়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১০৯]

ভারতবর্ষের বংশতালিকা

নিঃসন্দেহে যাদের কাছে বংশতালিকা সংরক্ষিত নেই তাদের দাবি গাল-গল্প। আর যাদের কাছে বংশতালিকা সংরক্ষিত আছে তাদের ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। যেমন, আমরা থানাভবনের ফারুকি হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সন্দেহ আছে। কেননা বংশতালিকায় ইবরাহিম ইবনে আওহাম আছেন। যার ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ তাঁকে ফারুকি লিখেন, কেউ আজলি লিখেন, কেউ তামিমি লিখেন। কেউ সাইয়েদ জায়দি লিখেন।

[হুকুকুল জাওজাইন ও ইসলাহুন নিসাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৯২]

এটাও হতে পারে, তারা যার উত্তরসূরি বলে দাবি করেন– তা সত্য। উত্তরসূরি না হওয়া কোনো যথাযথভাবে প্রমাণিত নয় বরং বিভিন্ন কারণে এমনটি সন্দেহ হয়।
[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৯।

অন্যায় বংশনামা

কিছু মানুষ সামাজিকভাবে অভিজাত নন। কিন্তু অন্যায়ভাবে তারা পারিভাষিক অভিজাতদের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। শুধু অনুমাননির্ভর হয়ে অভিজাতবংশের উপাধি ব্যবহার করে। হাদিসে এমন দাবিকারী ব্যক্তির ওপর অভিশাপ এসেছে। কেউ কেউ শুধু অনুমাননির্ভর হয়ে নিজেদেরকে অভিজাত প্রমাণ করতে চায়। যেমন, একটি গোষ্ঠি নিজেদেরকে আরব প্রমাণ করেছে। তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষ রাখাল ছিলো। যেহেতু তারা পশুপালন করে তাই তাদেরকে রাখাল বলা হয়েছে। এরপর সাধারণ মানুষ ভুল করে শব্দ পরিবর্তন করে ফেলেছে।

এমনিভাবে কিছু মানুষ নিজেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বংশধারায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। তারা আরব হতে চায়। কিন্তু এটা বৃথা প্রচেষ্টা। কারণ তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। বরং শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে থাকে। সবাই জানে এটা বানানো কথা।
[আত তাবলিগ: খণ্ড: ১৮, পৃষ্ঠা: ২১৫]

ভারতবর্ষে বংশের সমতা যেভাবে হবে

ভারতবর্ষের বংশতালিকারও আশ্চর্য কাহিনী আছে। জানাও নেই মানুষ কোথায় তা পেয়েছে। কেউ নিজেকে আব্বাসি বলে, কেউ ফারুকি বলে, কেউ সিদ্দিকি বলে। এখন যতো বেশি অনুসন্ধান করা হয় ততো বেশি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। মূলকথা জানা যায় না।

এখন যদি এসব বংশতালিকা না মেনে নেয়া হয় তাহলে বংশের কুফু বা সমতা বিচার করা হবে কীভাবে? সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের ওপর ভিত্তি করে সমতা বিচার করতে হবে। বংশের অতীত অবস্থান নিয়ে বিচার করা যাবে না। কোরআনকারিমে আমাদেরকে হজরত আদম [আলায়হিস সালাম]-এর বংশধর বলা হয়েছে। এখানে সন্দেহের অবকাশ নেই। নয়তো বংশতালিকার বিতর্কের প্রতি তাকালে সেখানেও সন্দেহ হতো। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ১৯]

ভারতবর্ষে বংশীয় সমতা গ্রহণযোগ্য কী না

প্রশ্ন : ভারতবর্ষের পাঠান, রাজপুত ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যবংশে বিয়ে করা লজ্জার মনে করে। যদি কেউ এমন করে ফেলে তাহলে তাকে

বংশচ্যুত করা হয়। ফিকাহ'র গ্রন্থাদিতে আছে, আরব ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে বংশীয় সমতাগ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অনারবিরা বংশতালিকা সংরক্ষণ করে না। এখন প্রশ্ন হলো, যেসব অনারবি গোষ্ঠি অন্যের তুলনায় নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করে, অন্যদেরকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না– প্রথা অনুযায়ী তাদের মধ্যে কুফুর মাসয়ালা প্রযোজ্য হবে কী-না?

উত্তর: ওপরের বর্ণনা অনুযায়ী যখন বিষয়টি লজ্জা ও লজ্জাহীনতার এবং ওপর্যুক্ত বংশের লোকেরা অন্যবংশে বিয়ে করাকে লজ্জার মনে করে। তাই তাদের মাঝে কুফু বা সমতাবিধান প্রযোজ্য হবে।

[এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩৭১]

এখনো বংশীয় সমতা বিবেচ্য

হাদিসের বর্ণনা এবং ফিকহিবিধানের আলোকে প্রমাণিত, অনারবি দেশসমূহেও বংশীয় সমতা বিবেচনা করা হবে না। তবে ফিকাহবিদগণ এটাও লিখেছেন, যদি সামাজিকভাবে বংশে বংশে পার্থক্য থাকে তবে সমতা বিবেচ্য হবে। নয়তো হবে না। বংশীয় সমতার মূলভিত্তি সামাজিকতা। হাদিসেও বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। [এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৮]

আনসারি ও কোরাইশি পরস্পর কুফু কী-না

আনসারিগণ কোরাইশি না হলেও কোরাইশের সমান। 'ফতোয়ায়ে আলমগিরি'তে বলা হয়েছে, সব আরব পরস্পর সমান। এই হিসেবে আনসারি ও কোরাইশিকে পরস্পর সমান মনে করা হয়। তাছাড়াও কুফু বা সমতাবিধান লজ্জারোধ করার জন্য। লজ্জার ভিত্তি সামাজিকতা ও পরিচিতি। বর্তমানে সমাজ ও পরিচিতিতে আনসার ও কোরাইশকে সমান করা হয়। আগে সমান করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে সময়ের পরিবর্তনে বিধানও পাল্টে গেছে।

[এমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৭১]

সারকথা

কুফু সম্পর্কে একজন মৌলভি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, চিন্তা করলেই বুঝা যায়, বিয়েতে কুফু শর্ত কারণসংশ্লিষ্ট। কারণ হলো, সামাজিক সম্মান-অসম্মান। যেমন, শায়েখ তথা চার খলিফার সন্তানগণ– ফারুকি হোক, ওসমানি হোক বা সিদ্দিকি হোক; যদি চান পরস্পর বিয়ে করতে তাহলে করতে পারেন। কারণ, সমাজে মান-সম্মানের কোনো প্রশ্ন নেই। এখানে মা আরবীয় হওয়ার শর্ত করা যাবে না। সমাজপরিচিতিতে সবার মর্যাদা সমান।

[আল ইজাফাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২০০, পুরনো সংস্করণ]

অনারবি আলেম আরবনারীর উপযুক্ত নয়

অনেক আলেম অনারবি আলেমকে আরবনারীর কুফু বা উপযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে, অনারবিপুরুষ আরবনারীর উপযুক্ত নয়। চাই সে আলেম হোক আর বাদশা হোক না কেনো। এটাই অধিক সঠিক।
[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১১১]

একটি প্রচলিত ভুল

একটি ব্যাপক সংকীর্ণতা হলো, কিছু গ্রাম্যমানুষ সব বিদেশিকেই নিচ ও অসম্মানী মনে করে। তাদের কাছে মান-মর্যাদা কয়েকটি বিষয়ের ওপর সীমাবদ্ধ। যার কোনো ভিত্তি নেই। এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি বাইরে থেকে বিয়ে করে আনে তবে তারা সেই নারীকে কখনোই সমগোত্রীয় নারীদের সমান মনে করে না। তখন সমগোত্রীয়দের সঙ্গে তাদের সন্তানাদির বিয়ে দেয়া ঝামেলা হয়ে যায়। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১১০]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় বিবেচনায় সমতা

বিয়ের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে কুফু বা সমতা বিবেচনা করা হয় ধর্ম বা ধর্মপরায়ণতা তার অন্যতম। এখানেও বংশের মতো নারী-পুরুষের চেয়ে নিচুস্ত রের হলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পুরুষ নারীর চেয়ে নিচুস্তরের হলেই সমস্যা। পুরুষের ধর্মহীন হওয়া তিন প্রকার। **এক.** اِعْتِقَادِیٌّ اُصُوْلِیٌّ মৌলিক বিশ্বাসগত **দুই.** اِعْتِقَادِیٌّ فُرُوْعِیٌّ অমৌলিক বিশ্বাসগত এবং তিন. اِعْتِقَادِیٌّ عَمَلِیٌّ কর্মকারণ বিশ্বাসগত।

প্রথম প্রকার : নারী মুসলমান আর পুরুষ বিধর্মী; চাই সে পুরুষ ইহুদি, খ্রিস্টান বা মূর্তিপূজারী হোক– এমন বিয়ে অবৈধ।

দ্বিতীয় প্রকার : নারী সুন্নি [সুন্নতের অনুসারী] আর পুরুষ বেদাতি হলে বিয়ের বিধান হলো, পুরুষের বেদাত যদি শিরক-এর পর্যায়ে হয়–যেমন বর্তমান সময়ের কাদিয়ানিসম্প্রদায় [যারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবি বিশ্বাস করে] প্রথম প্রকারের মতো তাদের বিয়েও অবৈধ।

আর যদি পুরুষের বেদাত শিরকের পর্যায়ে না হয় তাহলে সে মুসলমান বটে তবে সে সুন্নি মতে কুফু বা উপযুক্ত নয়।

বিতর্কিত অবস্থা

একটি অবস্থা হলো, কিছু বেদাতির কাফের হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়েকেরামের মতভিন্নতা আছে। যেমন, বর্তমান সময়ের কবরপূজারী সম্প্রদায়। যারা তাদেরকে কাফের বলেন তাদের কাছে সুন্নিনারীর বিয়ে অবৈধ। যারা কাফের বলেন না তাদের কাছে বিয়ে বৈধ তবে এখানে কুফু তথা উপযুক্ততা নেই। অধমের মতে [হজরত হাকিমুলউম্মত] এমন বিতর্কিত অবস্থায় এই ফতোয়া দেয়া উচিত যতোক্ষণ বিয়ে না হয় ততোক্ষণ বিয়ে বাতিল হওয়ার ওপর আমল করা আবশ্যক। কেননা সতর্কতা হলো একজন ভালোআকিদা বা বিশ্বাসের অধিকারী নারী একজন মন্দআকিদার মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে না এবং এমন মন্দআকিদা যা কিছু মানুষের কাছে কুফরির শামিল।

আর যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন বিয়ে বৈধ হওয়ার মতো গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা বিয়ে হওয়ার পর তার বৈধতার মতগ্রহণ করাই সতর্কতা। কারণ, এখন

যদি বিয়ে অবৈধ হওয়ার মতগ্রহণ করা হয় এবং তাকে অন্যত্র বিয়ে দেয়া হয় তখন এ সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে যে, প্রথম বিয়ে ঠিক ছিলো। তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে অবৈধ হয়ে যাবে। তারা সর্বক্ষণ ব্যভিচারের মধ্যে থাকবে। একজন ধর্মপরায়ণ নারীর সারাজীবন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা আবশ্যক হবে। আর বিয়ে বৈধ হওয়ার মতগ্রহণ করলে এই সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না।

তৃতীয় প্রকার : ফাসেক তথা পাপীপুরুষ পুণ্যবান মহিলার উপযুক্ত নয়। কেউ কেউ বলেন, পুণ্যবান মানুষের মেয়ের বিধান পুণ্যবতী নারীর মতো। যেমন, পুণ্যবান নারী পাপীপুরুষের উপযুক্ত নয়। তবে কোনো ফিকাহশাস্ত্রবিদের কাছে প্রকাশ্য পাপাচারী হওয়া শর্ত। কুফু বা উপযুক্ততা ছাড়া বিয়ে হওয়া বা না হওয়ার বিধান ওপরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১১৩-১১৪]

পুরুষ মুসলিম কী-না যাচাই করা আবশ্যক

সতর্কতার বিষয় হলো, আজকাল আধুনিকশিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষ নাস্তিকের আনুগত্য ও প্রবৃত্তিপূজায় এতোটা স্বাধীন ও নির্ভয় হয়ে গেছে যে, তারা নিঃসঙ্কোচে ধর্মের অকাট্যবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। অনেকে রিসালাত নিয়ে মন্তব্য করে। কেউ নামাজ-রোজা নিয়ে কথা বলে। কারো কারো তো কেয়ামতের ব্যাপারেই সন্দেহ আছে। এই জাতীয় মানুষগুলো কাফের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করলেও।

কোনো মুসলিমমেয়ের বিয়ে এমন কাফের পুরুষের সঙ্গে বৈধ নয়। কেউ যদি মুসলিম হওয়ার পর এমন কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সে কাফের হয়ে যায় এবং বিয়ে ভেঙ্গে যায়। সারা জীবন হারামে লিপ্ত থাকে। এজন্য আবশ্যক হলো, বিয়ের আগে স্বামীর যদি দাড়ি এবং ধর্মীয় পোশাক না থাকে তাহলে সে মুসলমান কী-না তা যাচাই করে নেয়া। বিয়ের পর যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে তওবা করিয়ে নতুন বিয়ের ব্যবস্থা করা।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৯]

যাচাই করা উচিত– ছেলে ভ্রান্তদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত কী-না

বিয়ের আগে কঠোর সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা আবশ্যক যে, ছেলে কোনো ভ্রান্দলের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয় তো? পুরনো কোনো ভ্রান্তদলের অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ নেই। বর্তমানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হচ্ছে। আর সময়টি হচ্ছে মুক্তচিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার। তাই ছেলে কোনো নতুন সম্প্রদায়ের অনুগামী কী-না তা বিশেষভাবে যাচাই করা আবশ্যক।

ছেলে যদি ইংরেজিশিক্ষিত হয় তাহলে দেখতে হবে আধুনিকশিক্ষার প্রভাব, স্বাধীন মনোভাব, তার ধর্মকে ছোটো করে দেখা কিংবা ধর্মের প্রয়োজনীয় বিধান অস্বীকার করার স্তরে নিয়ে গেছে কী-না। নয়তো একটি কুফরিবাক্যও যদি মুখ থেকে বের হয়ে থাকে তাহলে নতুন করে ইসলামগ্রহণ এবং বিয়ে নবায়ন না করা মানে প্রতিনিয়ত হারামে লিপ্ত হওয়া। যা মানুষের আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী এবং ইসলামিশরিয়তে অগ্রাহ্যীয়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১১]

ইহুদি বা খ্রিস্টাননারী বিয়ে করা

কিছু কিছু মানুষ ইউরোপ থেকে এমন নারীদের বিয়ে করে আনে যারা শুধু জাতিগতভাবে খ্রিস্টান। ধর্মের বিবেচনায় তারা ধর্মহীন। কার্যত তারা কোনো ধর্ম মানে না। এমন নারীকে বিয়ে করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। আবার কিছুসংখ্যক মানুষ খ্রিস্টধর্মের অনুসারী নারীকে বিয়ে করে কিন্তু তার দ্বারা এতো প্রভাবিত হয়ে যায় যে, একসময় সে নিজের ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাও আবশ্যক।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১১৪]

ছেলের ধর্মীয় অবস্থান জানতে হবে

বর্তমান সময়ে আবশ্যক হলো, পুরুষ মুসলিম না কাফের তা জানা। আগে দেখা হতো ছেলে পুণ্যবান না পাপী। কারণ, মুসলিমনারী এবং কাফের পুরুষের মধ্যে বিয়ে বৈধ নয়। আক্ষেপ! বর্তমানে যেসব ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া হয় আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তাদের কেউ কেউ এতোটা মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন মানসিকতার অধিকারী যে তাদের সঙ্গে ইমানের কোনো সম্পর্ক নেই। নামে মাত্র মুসলমান। নিঃসঙ্কোচে কুফরিবাক্য উচ্চারণ করে। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আবার এমন পুরুষের সঙ্গে একজন মুসলিমমেয়ের বিয়ে দেয়া হয়। পরিবারের সবাই আনন্দিত হয় এই ভেবে যে, একটি সুন্নত পালন করা হলো। যে সুন্নতের পূর্বশর্ত ইমান। জানা নেই নতুন বর কতোবার তা থেকে বের হয়ে গেছে।

একজন পুণ্যবতী মেয়ের সঙ্গে এমন একজন ইংরেজিশিক্ষিত ছেলের বিয়ে হয় যে এক বৈঠকে বলছিলো, বাস্তবে মোহাম্মদ অনেক চাপা মারতো। তার সঙ্গে আমার অনেক ভালো সম্পর্ক। কিন্তু রেসালাত একটি ধর্মীয় খেয়াল বা ধারণামাত্র। নাউজুবিল্লাহ!

এটা কুফরিবাক্য। এমন বললে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এ কথা যদি ছেলেপক্ষকে বলা হয় তাহলে তারা উল্টো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। বলবে, আমাদের বংশের নাককাটা হচ্ছে।

[দাওয়াতে আবদিয়্যাত, মোনাজায়াতে হাওয়া, হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৮৫]

বংশীয় আভিজাত্য বা সম্পদ দেখে অধার্মিকের সঙ্গে বিয়ে দেয়া

কিছু মানুষ সম্পদ ও খ্যাতির মোহে বা কোনো বংশীয় কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মেয়েকে একজন মন্দআকিদা বা বিশ্বাস এবং খারাপ মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। কখনো তার ধর্মবিশ্বাস কুফরি পর্যন্ত পৌঁছায়। বাহ্যিক দুর্দশা ছাড়াও তারা সারাজীবন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। সন্তান হলে হবে হারামি। আর যদি বিশ্বাস কুফরি পর্যন্ত না পৌঁছে তবুও সারাক্ষণ আত্মিকশাস্তির মধ্যে থাকে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১১৪]

ধার্মিকতার ওপর আত্মীয়তা করার কারণ

যেসব কল্যাণের জন্য বিয়ের উদ্ভব হয়েছে এবং তা বৈধতা পেয়েছে তার সব কিছুই পরস্পর বুঝাপড়া, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার ওপর নির্ভরশীল। এটা নিশ্চিত, এমন ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব দীন তথা ধর্মের মধ্যে যতোটা পাওয়া যায় অন্যকোনো কিছুর মধ্যে ততোটা পাওয়া যায় না। কেননা ধর্মীয় বন্ধন ছাড়া অন্যসব বন্ধন ও সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। এমনকি কেয়ামতের দিন যা সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার সময় তখন ধর্মীয় বন্ধন থেকে যাবে।

فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

"তাদের মধ্যে আত্মীয়তার যে বন্ধন ছিলো তা সেদিন থাকবে না।"

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

"তাদের সবসম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।"

مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

"জাগতিক জীবনে তাদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। এরপর কেয়ামতের দিন একে অপরকে অস্বীকার করবে। একজন অপরজনকে অভিশাপ করবে।"

কিন্তু ধর্মীয়সম্পর্ক টিকে থাকবে। সে সময় তা শেষ হবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন—

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"দুনিয়ার সববন্ধু আজ পরস্পারের শত্রু কিন্তু খোদাভীরুগণ ছাড়া।"

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮]

কারণ হলো, ধর্মপালন করায় মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। ফলে সে এমন ছোটো ছোটো বিষয় খেয়াল রাখে যা সাধারণত খেয়াল করা হয় না। ফলে তার দ্বারা কোনো অধিকার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সে কি কাউকে কষ্ট দেবে? সে কি নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারে? কারো ক্ষতি চাইতে

পারে? কারো সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে? তার চেয়ে সভ্য আর কে হতে পারে? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮]

ধার্মিক মানুষের জন্য অধার্মিক মেয়ে বিয়ে করা ঠিক নয়

কিছু মানুষ বাজারি মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে। বিয়ে বৈধ এবং বিনা কারণে এমন সন্দেহও করা যাবে না যে, সে মহিলা এখনো লম্পট রয়ে গেছে। কিন্তু এই ব্যাপারেও সন্দেহ নেই, ধার্মিক মানুষের জন্য ধর্মবিমুখ মানুষের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ইসলামিশরিয়ত এমন সম্পর্ককে অনুচিত আখ্যা দিয়ে বিধান প্রণয়ন করেছে।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

"ব্যভিচারীপুরুষ বিয়ে করবে না ব্যভিচারী বা পৌত্তলিকনারী ছাড়া। ব্যভিচারী নারী বিয়ে করবে না ব্যভিচারী বা পৌত্তলিকপুরুষ ছাড়া।"

যদিও আয়াত ও অন্যান্য দলিলসমূহের ব্যাপকতা থেকে এই হারাম নিষিদ্ধ পর্যায়ে নয় যে, বিয়ে বৈধ হবে না বরং নিষিদ্ধের পর্যায়ে অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাবে তবে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। কিন্তু অপছন্দের ভিত্তি যদি মহিলা নিশ্চিত ব্যভিচারিণী হয় তাহলে বিয়ে করা হবে তীব্রমাত্রার অপছন্দনীয় অর্থাৎ হারাম। আর যখন সন্দেহ থাকে তাহলে অপছন্দের মাত্রা তীব্র হবে না।

হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَلَا تَضَعُوْهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ

"তোমরা নিজেদের বীর্য তথা বংশবিস্তারের জন্য উত্তমনারী নির্বাচন করো। তা উপযুক্ত পাত্র ছাড়া রেখো না।"

এই হাদিস আগের বক্তব্যের সমর্থনে ব্যক্ত। আল্লাহ কোনো নবির জন্য এমন কোনো নারী নির্বাচন করেননি যারা কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। যদিও তারা পরে তওবা করুক না কেনো। وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ সৎচরিত্রের নারীরা সৎচরিত্রের পুরুষের জন্য– এই ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে। তবে যদি সে একনিষ্ঠ মনে তওবা করে এবং তাকে কেউ গ্রহণ না করে তবে তার ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য অথবা তার প্রতি যদি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তাহলে ভিন্নকথা। তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বাণী–

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

"প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য বিয়ের মতো উপকারী আর কিছু দেখা যায় না।"

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২; পৃষ্ঠা: ৫১]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বয়সের সমতা

বর্তমানে মানুষ মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত অবহেলা করে। যেমন, বাচ্চামেয়ের বিয়ে বয়স্কপুরুষের সঙ্গে দেয়া। যার পরিণতি হলো, স্বামী যদি মারা যায় তাহলে মেয়ের চরিত্র নষ্ট হয়। আবার কোথাও এই অবিচার হয়, ছোটো ছেলের সঙ্গে যুবতী মেয়ের বিয়ে দেয়। এখানে একটি বিয়ে হয়েছে বর ছোটো আর কনে বয়স্ক। দু'জনের বয়সের পার্থক্য এমন যে, যদি মহিলার প্রথম সন্তান ছেলে হতো তাহলে বর তার সমবয়সী হতো। আমি এমনটা অপছন্দ করি। এই অপছন্দ ওয়াজিব বা হারামের পর্যায় নয় বরং অপছন্দ স্বভাবসুলভ এবং বিবেকের। বয়সের সমতা হলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।

[দাওয়াতে আবদিয়্যাত আজলুল জাহিলিয়্যাতঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৫৬]

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সমতা শরিয়তের বিধান

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সমতা রক্ষা করা আবশ্যক। বয়স স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আচরণগত [স্বভাব ও দৈহিক] বিষয়। একপ্রকার শরয়ি বিষয়ও বটে। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানও লক্ষণীয়। কোরআনশরিফে বর্ণিত হয়েছে−

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابًا

"জান্নাতে হুরগণ [জান্নাতের রমণী] সমবয়সী হবে।"

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে−

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا

"আমি বেহেশতিনারীকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছি। এরপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা।"

বয়সের ব্যবধানে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আমি লক্ষ করেছি, বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চাদের যেমন আন্তরিকতা হয় বড়োদের সঙ্গে তেমন হয় না।

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ের প্রস্তাব সর্বপ্রথম হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু] দেন। এরপর হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] প্রস্তাব দেন। কারণ, এটুকু যোগ্যতা ও সম্মান তাঁদের অর্জিত ছিলো। তাঁদের

কন্যাদ্বয় রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সম্মানিতা স্ত্রী ছিলেন। এখন তারা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জামাতা হওয়ার সম্মান অর্জন করবেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, إِنَّهَا صَغِيرَةٌ "সে অনেক ছোটো।" তাঁদের বয়স অনেক বেশি ছিলো। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁদের আবেদন নাকচ করে দেন।

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ের ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, হজরত আবুবকর ও ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহুমা]--এর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর আপত্তি ছিলো– সে ছোটো, বাচ্চা। এর থেকে বুঝা গেলো, মেয়ের বয়স কম হলে স্বামীর বয়স বেশি হওয়া উচিত নয়। বয়সের অসমতায় বিয়ে দেয়াও ঠিক নয়। [দাওয়াতে আবদিয়্যাত আজলুল জাহিলিয়্যাত]

বর-কনের বয়সের পার্থক্য কতোটা হওয়া উচিত

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ের সময় বয়স ছিলো সাড়ে পনেরো বছর। হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বয়স ছিলো একুশ বছর। এর থেকে জানা যায়, বর-কনের বয়সের সমতা ঠিক রাখা উচিত। উত্তম হলো, সমবয়সী স্বামী সমবয়সী স্ত্রী থেকে একটু বড়ো হবে। জ্ঞানীগণ বলেন, মেয়ে যদি একটু ছোটো হয় তাহলে সমস্যা নেই। রহস্য হলো, নারী অধীনস্থ হয় এবং পুরুষ কর্তৃত্বকারী। তাছাড়াও নারীর শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্য থাকে দুর্বল। ফলে সে আগে বৃদ্ধা হয়ে যায়। যদি দু'-চার বছরের পার্থক্য থাকে তাহলে সমতা আসে। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৭০]

অসম বিয়ে কনের অস্বীকার করা উচিত

ইমাম আবুহানিফা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর আত্মার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তার কারো কর্তৃত্ব থাকার মাসয়ালাটি মতবিরোধপূর্ণ। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইমাম আবুহানিফা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর ফতোয়া অধিক কল্যাণকর। বর্তমানে বাবা-মা বিয়ে ঠিক করলে কনের অস্বীকার করাকে লজ্জার মনে করা হয়। অথচ বিয়ে করতে বলা লজ্জার, অস্বীকার করা নয়। মূলত লজ্জা হলো, বিয়ে শব্দই তারা পছন্দ করে না। এটাই কি যুক্তির কথা নয়? সুতরাং বিয়ে অসমবয়সীর সঙ্গে হলে অবশ্যই অস্বীকার করবে।

[আজলুল জাহিলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৭০]

অল্পবয়সী মেয়ের বয়স্কপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার ক্ষতি

যদি মেয়ে অল্পবয়সী হয় এবং স্বামী বয়স্ক হয় তাহলে তার খুব দ্রুত বিধবা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মানুষ বয়সের সমতার কথা ভিন্নভাবে লক্ষ করে না। অবলা কুমারী মেয়ে অথবা বারো-তেরো বছরের অপরিপক্ক মেয়ের সঙ্গে ষাট-সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধের বিয়ে দেয়। এখানেই সৃষ্টি হয় অনিষ্ট।

১. মেয়ে যদি সৎচরিত্রের অধিকারী হয়, নিজেকে পবিত্র রাখে তাহলে সে সারা জীবনের জন্য বন্দিত্বগ্রহণ করলো।

২. যদি অসৎচরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে নোংরামিতে লিপ্ত হয়। উভয় অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অপছন্দ, অসন্তুষ্টি এবং অনৈক্য সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় অবস্থা উভয়ের জন্য অসম্মানের। উভয়ের বংশের জন্য কলঙ্ক।

৩. সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হলো, বৃদ্ধ অধিকাংশ সময় আগে মারা যায়। অত্যাচারিতা মেয়েটি সমাজ-সংস্কারের ভয়ে বিধবা থেকে যায়। অনেক সময় এই দরিদ্রমহিলা খাওয়া-পরার মুখাপেক্ষী হয়। যদি সামাজিকভাবে মর্যাদাবান হয় তাহলে কোথাও কাজ করতে পারে না। যদি কাজ করার ইচ্ছা করে তাহলে অনেককে অন্যের ঘরে থাকতে হয়। আর যেহেতু অভিভাবক নেই তাই মানুষ তার দিকে খারাপ উদ্দেশে লালায়িত হয়। কখনো লোভ দেখিয়ে, কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো নানা ছলনায় ইজ্জত-সম্ভ্রম ও ধর্ম বিনষ্ট করে দেয়। বিশেষ করে যখন নিজের মধ্যেও প্রবৃত্তির তাড়না জাগ্রত থাকে। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ২৪]

কমবয়সী ছেলের বয়স্কনারীর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ক্ষতি

কিছুগোত্রের মাঝে উল্টো রীতিও চালু আছে। সেখানে বর ছোটো হয় এবং কনে বড়ো হয়। কিছু মূর্খমানুষ এমন করে যে স্বামী ছোটো এবং স্ত্রী অনেক বড়ো হয়। প্রথমে স্ত্রী যুবতী থাকে আর স্বামী থাকে দুধের বাচ্চা। বরং কখনো পার্থক্য এতো বেশি হয় যে, স্বামী স্ত্রীর বুকের দুধ খাওয়ার মতো থাকে। এসব জ্ঞানহীন মানুষগুলো ভাবে না যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো তাদের পরস্পর বুঝা-পড়া। আর ওপর্যুক্ত অবস্থায় যার আশাই করা যায় না।

এমন অবস্থায় দেখা যায়, স্ত্রীর যৌবনের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে আর স্বামীর কোনো যোগ্যতা নেই। সুতরাং সে অন্যকারো সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করছে বা দমবন্ধ করে দীর্ঘ যন্ত্রণায় ভুগছে। যদি স্বামী যুবকও হয় তাহলে সে সমতায় যেতে পারে না কারণ আগের ঘৃণা বিদ্যমান। সবচেয়ে বড়ো ঘৃণ্যবিষয় হলো, স্বামীর মর্যাদা শেষ হয়ে যায়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪]

যদি মেয়ের বয়স কম হয় তাহলে যখন সে দুর্বল হতে শুরু করে তখন স্বামীর বয়স বেশি হওয়াতে সে-ও দুর্বল হতে শুরু করে। দুইজন একই সঙ্গে বৃদ্ধ হতে শুরু করে। যখন স্বামীর বয়স বেশি হওয়া বিবেক সমর্থন করার পরও রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তা অপছন্দ করেছেন, তখন যা একেবারেই বিবেক প্রশ্রয় দেয় না তা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কীভাবে সমর্থন করবেন?

আরেকটি কারণ হলো, স্বামী আদেশদাতা। যদি স্ত্রীর বয়স বেশি হয় তাহলে সে স্বামীর অনেক আগে বৃদ্ধা হয়ে যায়। তখন 'আম্মাজানের' ওপর রাজত্ব করতে ভালো লাগবে? নিঃসন্দেহে সে আরেকজনকে কাছে টানবে। অনর্থক তিক্ততা সৃষ্টি হবে। অনেক গোত্রের মধ্যে এই বিপদ আছে; ছেলে হয় ছোটো আর মেয়ে যুবতী। উভয়ের মাঝে বিয়ে হয় এবং দুর্নাম রটে।

[হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৭১]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মায়ের দিক থেকে সমতা থাকা উত্তম

যদি একটি উপকারের জন্য এবং একটি ক্ষতি থেকে বাঁচতে দরিদ্রমেয়েকে বিয়ে না করে তাহলে দোষের কিছু নেই। বরং এটাই ঠিক। অধিকাংশ সময় দরিদ্রমেয়ের ভেতর দুটি জিনিসের অভাব থাকে। এক. শিষ্টাচার ও সামাজিকতা এবং দুই. উদারতা। শিষ্টাচার জানা না থাকায় সে সেবা করার যোগ্যতা রাখে না। বরং তার দ্বারা কষ্ট হয়। উদারতা না থাকায় অনেক প্রয়োজনের সময় খরচ করতে কার্পণ্য করে। তার ভেতরগত স্বভাবের কারণে কৃপণতার সঙ্গে কাজ করে। যাতে অনেকের অধিকার নষ্ট হয়। অনেক সময় সম্মান নষ্ট হয়। কোনো অতিথিকে খাবার কম দেয়, কোনো মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে। যদি সে ছোটো থেকে খাওয়ানো দাওয়ানো এবং খাবার তৈরির মধ্যে থাকে তাহলে সে আনন্দ আয়োজনের জন্য মুখিয়ে থাকে।

অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, হঠাৎ ধন-সম্পদ দেখে চোখ ফুটে যায়। লাফাতে থাকে। কী করবে ভেবে পায় না। যেহেতু ভদ্রতা ও শিষ্টাচার জানা নেই তাই বাছ-বিচার ছাড়াই খরচ করতে থাকে। অধিকাংশ সময় নতুন টাকার মালিকগণকে কৃপণতা অথবা অপচয়ের রোগে পেয়ে বসে। তাদের মধ্যে ভারসাম্য কম থাকে। কারণ, তাদের সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার অভ্যাস নেই। সে ভারসাম্য শিখবে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় এমন মেয়েলোকের স্বামীর ঘরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না। আর্থিক অবস্থান ভিন্ন, মানুষগুলোও ভিন্ন। কখনো প্রকাশ্যে কখনো গোপনে যখন যেমন সুবিধা বাপেরবাড়ির গোলা ভরতে থাকে। সারাজীবন এই অভ্যাস দূর হয় না। এতে ঘরে বরকত নষ্ট হয়। পুরুষ আয় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় কিন্তু সে খরচ করতে করতে ক্লান্ত হয় না। এজন্য যেখানেই হোক নিজের সমপর্যায়ে কোথাও বিয়ে করা। যাতে বিয়ের কল্যাণগুলো রক্ষা পায়। কারো স্বভাব-চরিত্র ব্যতিক্রম। তার আলোচনা না করলেও হয়। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৩]

দরিদ্রঘরের মেয়ে বিয়ে করবে না-কি ধনী ঘরের মেয়ে?

আগে জ্ঞানীগণ পরামর্শ দিতেন দরিদ্রমেয়ে বিয়ে করতে। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে এখন অনেক মানুষের মতামত হচ্ছে, দরিদ্রমেয়ে কখনো বিয়ে করা

উচিত নয়। কেননা সে নিজের দরিদ্র মা-বাবার পেছনে স্বামীর সবটাকা-পয়সা ব্যয় করে ফেলে। কিন্তু আমি এই মতামত দিই না। আমার মতামত হচ্ছে, মানুষ নিজের সমপর্যায়ের মেয়ে বিয়ে করবে। কারণ, নিজের চেয়ে বড়োঘরে যদি বিয়ে করে তাহলে প্রলুব্ধ হবে না। বাপের বাড়ির গোলাও ভরবে না। তবে বদমেজাজি হবে এবং তার দৃষ্টিতে স্বামীর কোনো মূল্য বা সম্মান থাকবে না। আর দরিদ্রমেয়ে বিয়ে করলে লোভে পড়বে। সবজিনিস দেখে তার লালা পড়বে এবং নিজের আপনজনদের আঁচল ভরবে।

এটা অভিজ্ঞতা থেকে বলা। আমার উদ্দেশ্য হলো, মেয়েরা খরচ করার ব্যাপারে এতোটা বেহিসেবি যার জন্য চিন্তাশীল মানুষের ভাবনার বিষয়— ধনীর মেয়ে নেবে না-কি গরিবের মেয়ে নেবে। তাদের বেহিসেবি হওয়ার কারণে অনেক জ্ঞানী মানুষ গরিবের মেয়ে বিয়ে করা দোষণীয় মনে করছে।

[দীন দুনিয়া আসবাবে গাফলত: পৃষ্ঠা: ৪৯৫]

অধ্যায় ।৫।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের জন্য পাত্রকে কেমন হতে হবে

মেয়ে বিয়ে দেয়ার সময় পাত্র ধার্মিক কী-না তা লক্ষ রাখতে হবে। ধার্মিকতা ছাড়া মানুষের অধিকার রক্ষা হয় না। যেমনটি দেখা যায়, যেলোক ধার্মিক নয় সে মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। পাত্র সবদিক থেকে উপযুক্ত হয় কিন্তু দীনদার নয় তবুও তার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবে না।

[মালফুজাতে খায়রাত: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩২]

যতোক্ষণ মানুষ ধর্মপরায়ণ না হয় ততোক্ষণ তার কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কোনো কাজের কোনো সীমা নেই অর্থাৎ তার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। যদি বন্ধুত্ব হয় তাহলে সীমা ছাড়াবে আবার শত্রুতা হলেও সীমালঙ্ঘন করবে। আর যার কাজের কোনো ভারসাম্য নেই সে নিশ্চত বিপদজনক। সবকিছু যথাযথ করাই সবচেয়ে বড়ো পূর্ণতা। [আল ইফাজাত: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২০২]

ধার্মিকতার পরিচয়

ধর্মের কী-কী শাখা রয়েছে আজ মানুষ তা জানে না। ফলে তারা ধর্মকে নামাজ, রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। ইসলামের মৌলিক শাখা হলো পাঁচটি: ১. বিশ্বাস; ২. ইবাদত; ৩. লেনদেন; ৪. সামাজিক আদান প্রদান বা আচরণ এবং ৫. চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি। [হুকুকুল ইলম: পৃষ্ঠা: ২]

সুন্দর তাকে বলা হবে যার নাক, কান, চোখ সবসুন্দর। প্রত্যেক অঙ্গ যথাযথ। যদি সবঠিক কিন্তু চোখ কানা অথবা নাক বোঁচা তাহলে সে সুন্দর নয়। এমনিভাবে ইসলাম তার সবশাখার সমন্বিত একটি নাম।

[তাজদিদে তালিম: পৃষ্ঠা: ২২৭]

সামাজিক আচরণ, আদান প্রদানও ইসলামের একটি শাখা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটাকে সামান্য বিষয় মনে করে এবং ওজিফা [পির কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিদিনের নফল ইবাদত]-কে দীনদারি ও আবশ্যক মনে করে। সামাজিক শিষ্টাচারের মূলকথা হলো, তার থেকে কেউ কষ্ট পাবে না। যদি কারো লেনদেন ঠিক হয়ে যায় এবং সে নামাজ পড়ে তাহলে সে-ই প্রকৃত ধার্মিক। আল্লাহর নৈকট্য সে লাভ করবে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৩]

একবুজুর্গের ঘটনা

একবুজুর্গের ঘটনা। তার একটি মেয়ে ছিলো। যার বিয়ের প্রস্তাব খুব বেশি পরিমাণে আসছিলো। তিনি তাঁর একজন ইহুদিপ্রতিবেশীর কাছে পরামর্শ চাইলেন। বললেন, অমুক অমুক জায়গা থেকে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। আপনার কোন জায়গাটি উত্তম মনে হয়? ইহুদি আপত্তি করে বললেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন না। কারণ আমি অন্যধর্মের মানুষ। আর অন্যধর্মের মানুষের পরামর্শের কী মূল্য? বুজুর্গ বললেন, আপনি যদিও মুসলিম নন তবুও অভিজাত-সম্ভ্রান্তমানুষ। আপনি ভুল পরামর্শ দেবেন না। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে পরামর্শ দিন। তখন ইহুদি বললেন, আমি শুনেছি, আপনাদের নবি মোহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ

"চারটি গুণ দেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য, তার ধার্মিকতা। সুতরাং তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।"

এর থেকে জানা যায় আপনাদের ধর্ম ইসলামে সবচেয়ে বেশি বিবেচনার বিষয় দীন। আমার ধারণামতে যতোজন প্রস্তাব দিয়েছে তাদের কারো মাঝেই পরিপূর্ণ দীন নেই। যে তালিবুলইলম [দীনশিক্ষার্থী] আপনাদের মসজিদে থাকে আমার কাছে সে-ই বড়ো ধার্মিক। সবসময় আল্লাহর কাজে লেগে থাকে। আপনি আপনার মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিন। ইনশাল্লাহ বরকত হবে। বুজুর্গ তেমনটিই করলেন। অতঃপর তার মেয়ে সারাজীবন শান্তিতে ছিলো।

[আততাবলিগ: পৃষ্ঠা: ১৩০-১৪০]

মেয়ে ও বোন বিয়ে দেয়ার সময় ছেলের যেসব বিষয় দেখতে হয়

অনেকে বলেন, মেয়ের বিয়ে নিয়ে খুব চিন্তিত। আশানুরূপ কোনো প্রস্তাব আসছে না। কোনো জায়গা থেকে দাড়িওয়ালা ছেলের প্রস্তাব আসলে দেখা যায় সে হতদরিদ্র। আবার যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে দেখা যায় তার দাড়িসাফ। কিছুপ্রস্তাব শুধু এজন্য ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। দোয়া করবেন আল্লাহ যেনো ইজ্জত রক্ষা করেন। মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে লজ্জার মুখোমুখি হতে না হয়। অনেকে বলছে, ভাই এই খেয়াল ছেড়ে দিন। আজকাল দাড়িওয়ালা ছেলে সহজে মিলবে না।

উত্তরে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেন, বাস্তবেই কঠিন। আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিচ্ছি না। আমার ধারণা, বর্তমান সময়ে ধার্মিকতা পুরোপুরি

দাড়িতে নিহিত নয়। একজন দাড়িকামানোর গোনাহ করছে। অপরজন প্রবৃত্তিপূজার গোনাহ করছে। তাহলে শুধু দাড়ি দিয়ে কী হবে? হলে সত্যিকার ধার্মিক হও। যা খুবই দুষ্প্রাপ্য। যদি নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করা হয় তাহলে কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে।

১. শুধু কয়েকটি বিষয় দেখে নেবে। যেমন, ইসলামের মৌলিকবিশ্বাসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করে না অথবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে না।

২. স্বভাব-চরিত্র ভালো হয়। যেমন, আলেম ও বুজুর্গদেরকে সম্মান করে।

৩. নম্রস্বভাবের হবে।

৪. পরিবার-পরিজনের অধিকার আদায়ের আশ্বাস পাওয়া।

৫. প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ থাকা আবশ্যক। কারো মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেলে তাকে বেছে নেবে। এরপর যখন আসা-যাওয়া হবে, হৃদ্যতা সৃষ্টি হবে তখন অসম্ভব নয় এই ছেলে দাড়ি রেখে দেবে।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩১১, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত]

৬. উপার্জনে সক্ষম হবে।

৭. অন্যের তুলনায় বেশি পার্থক্য হবে না।

৮. ধার্মিকতার অন্যান্য বিষয়গুলো তালাশ করবে না। নয়তো হাদিসে যে সাবধানবাণী এসেছে তা বাস্তবায়িত হবে। বর্ণিত হয়েছে, যখন স্বভাব-চরিত্র ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে কুফু পাওয়া যায় তখন বিয়ে দিয়ে দাও। নতুবা অনেক বড়ো বিশৃংখলা হবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩১]

বিদেশিছেলেকে বিয়ে করবে না

বিদেশিছেলেকে বিয়ে করা সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং কষ্টদায়ক।

[মালফুজাতে খাবরাত: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩২]

কাছের আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করার ক্ষতি

অভিজ্ঞজন নিষেধ করেন নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করতে। কেননা এতে সন্তান দুর্বল হয়। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬]

তার কারণ হলো, সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য যেমন শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ শর্ত তেমনি অন্তরের ভালোবাসা, আকর্ষণ-বাসনারও একটি স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। কেননা তা শারীরিক মানসিক সুস্থতার পূর্বশর্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে গর্ভবতী হওয়া এবং গর্ভধারণ করা নির্ভর করে একই সঙ্গে বীর্যপাত হওয়ার ওপর। সেটার জন্য ভালোবাসা ও মনের আকর্ষণ প্রয়োজন। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৭]

মেয়ের অভিভাবকগণ তাড়াহুড়ো করবে না বরং ভালোভাবে খোঁজ-খবর নেবে

মানুষ মেয়েদের বিয়েকে রসিকতা মনে করে। কোনোকিছু না দেখেই জায়গা অজায়গায় বিয়ে দিয়ে দেয়। যেমন, একমহিলাকে নিষেধ করার পরও 'আমি মরে যাবো' এই ভয়ে সে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। পরে জানা গেলো, স্বামী বড়ো অত্যাচারী ছিলো। একজন ইংরেজের সঙ্গে বিবেদে লিপ্ত হয়। এরপর শাস্তির ভয়ে যুদ্ধে নাম লেখায়। সে সবার সঙ্গে বিবাদে জড়ায়। এখন স্ত্রীকে মানুষের বিরোধিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন বলে, কী করবো, তার ভাগ্য। আমার মনে চায় এমন মানুষের গলা টিপে ধরি। তাদের ভাবটা এমন– আমাদের কোনো ভুল হয়নি, ভুল হয়েছে আল্লাহর। নাউজুবিল্লাহ! [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪০৪]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের জন্য সর্বোত্তমপাত্রী

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন নারী সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন–

إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ-

"যখন স্বামী তার দিকে তাকায় স্বামীর মনকে প্রফুল্ল করে দেয়। কোনো আদেশ করলে তাকে সন্তুষ্ট করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও নিজেকে রক্ষা করে।" [নাসায়ি]

হজরত মাকাল ইবনে ইয়াসার [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেন–

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

"তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো যারা অধিকভালোবাসে এবং অধিকসন্তান জন্ম দেয়। কেননা আমি তোমাদের আধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করবো।" [আবুদাউদ ও নাসায়ি]

যদি বিধবানারী হয় তবে প্রথম বিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাবে সে স্বামীকে ভালোবাসে কী-না। সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে কী-না। আর কুমারী হলে তার সুস্থতা এবং তার বংশের বিবাহিত অন্যান্য মেয়ের থেকে এসব ব্যাপারে জানা যাবে। [হায়াতুল মুসলিমিন: পৃষ্ঠা: ১৮৮]

স্ত্রী ও ছেলের বউ নির্বাচনে যা দেখতে হয়

বর্তমান যুগে কনের মধ্যে অধিক সৌন্দর্য এবং বরের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা হয়। সবচেয়ে কম দেখা হয় ধার্মিকতা। অন্যান্য গুণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। অথচ সবচেয়ে কম দেখার বিষয় সৌন্দর্য এবং বেশি দেখার বিষয় হলো ধার্মিকতা। হাদিসশরিফে পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে এসেছে–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ

"চারটি গুণ দেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ, তার সৌন্দর্য , তার ধার্মিকতা। তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও।

হাদিসে সম্পদ এবং সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ না করে ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৭]

মেয়েদের আধুনিকশিক্ষা ও অধুনাশিক্ষিত মেয়ে বিয়ে

কিছু মানুষ এফএ পাস, এমএ পাস ছেলে খোঁজে। আফসোস! কিছু আধুনিক রুচির মানুষ আধুনিক শিক্ষিত মেয়ে খোঁজে। অথবা শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বা প্রফেসর হয়েছে এমন। আপনারা সেই পণ্ডিতদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের উদ্দেশ্য কী? যদি বলে, তাদের বোঝা আমাদের ওপর হাল্কা হবে, সে নিজেও উপার্জনে সাহায্য করবে; তবে এটা সীমাহীন কাপুরুষিকতা যে, পুরুষ হয়ে নারীর কাছে ধরণা দেবে, তার অনুগৃহীত হবে। এটা সাধারণ আত্মমর্যাদাবোধেরও পরিপন্থী।

আর যদি উদ্দেশ্য হয় এমন– মেয়েরা সভ্য-শিষ্ট হবে। আমাদের অধিক সুখ-শান্তিলাভ হবে। তাহলে ভালোভাবে বুঝে নিন, সুখ-শান্তির জন্য শিক্ষা-শিষ্টাচার যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য একনিষ্ঠতা, আনুগত্য ও সেবার মানসিকতা অধিক প্রয়োজন। যদি আদব-রীতি একটু কমও জানে তা সহ্য করা যায়। যদিও কখনো কখনো কষ্ট হয় কিন্তু তা খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় এবং তার প্রভাব বাকি থাকে। আর যদি উচ্চ আদব-রীতির অধিকারী হয় এবং এসব গুণ না থাকে তাহলে সেবা কীভাবে করবে? কেননা অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায়, আধুনিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়া হলো, অহংকার, স্বার্থপরতা, আত্মমুখিতা, নির্ভয়তা, স্বাধীনতা, নির্লজ্জতা, চতুরতা, কপটতা ইত্যাদি মন্দস্বভাবের সৃষ্টি। যখন তার মস্তিষ্ক অহংকারে ভরা তখন সে তোমার সেবা কেনো করবে? বরং স্বার্থপরতার কারণে উল্টো তোমার কাছ থেকে নিজের অধিকার ষোলো আনা দাবি করবে। যাতে তোমার সুখ-স্বস্তি নষ্ট হবে। সে নিজেই তোমার কাছ থেকে সেবা চাইবে। তুমি যদি তার কাছে সেবা চা-ও তবে সে একজন অভিজাত নারী মনে করে তোমার কথার উত্তর দিয়ে দেবে। বলবে, এটা আমার দায়িত্ব নয়। বরং যেটা তার দায়িত্ব তার মধ্যে অভদ্রতার কারণে বা অসুস্থতার অজুহাতে সরাসরি অস্বীকার করবে। নিজের অধিকার পুরোপুরি আদায় করবে। যদি টাল-বাহানা করো তাহলে আদালতে মামলা করে দেবে।

যদি বলো, এমনটি খুব হয় তাহলে বলবো, অধুনাশিক্ষিতা বিবেচ্য নয়; মূলকথা হলো, আধুনিক শিক্ষার চেয়ে অশিক্ষিত থাকা অনেক ভালো। কারণ, শিক্ষিত না হলে বড়োজোর উত্তমশিক্ষা অর্জন হলো না, তবে এর ফলশ্রুতিতে মন্দচরিত্রও সৃষ্টি হবে না। বর্তমানে যাকে ভদ্রতা বলা হয় তা হলো অভিনয়, নিজের দোষ লুকানো, প্রতারণা ও কপটতা। আর নারী মধ্যে এসব গুণ থাকার অর্থ সে জাহান্নামতুল্য। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৫ ও ৪৭]

ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করা উত্তম

মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার দিকটি খোঁজা ভালো। কারণ, ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ বানায় যদি সে তা পালন করে। আশার কথা হলো, যখন কোনো মানুষ ধর্মীয় শিক্ষালাভ করে তখন কোনো না কোনোদিন তার পালনের সুযোগ হয়। তাই আমলহীনতার ত্রুটিও যদি থাকে তাহলেও তা স্থায়ী কিছু নয় বরং অস্থায়ী। এক মিনিটে তা শেষ হয়ে যেতে পারে। মোটকথা ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৭]

সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করার পরিণতি

সম্পদ ও সৌন্দর্যের স্থায়িত্বকাল বেশি নয়। সম্পদ একরাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। সৌন্দর্য এক অসুস্থতায় শেষ হয়ে যেতে পারে। কিছু জিনিস আছে যা একবার সৌন্দর্য হারালে পরে রূপ আর ফিরে আসে না। চোখ গলে গেলো, বসন্ত হলো কিন্তু দাগ গেলো না বা এই জাতীয় কোনো রোগ।

যখন বিয়ের উদ্দেশ্য ছিলো সম্পদ ও সৌন্দর্য এবং তা শেষ হয়ে গেলো তখন সমস্ত ভালোবাসা যার ভিত্তি সম্পদ ও সৌন্দর্য, তা-ও শেষ হয়ে যাবে। এরপর স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং ক্রোধের কারণ হবে। শেষপর্যন্ত সম্পর্ক টেকানো কঠিন হয়ে যায়। যদি সম্পদ ও সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে তবুও অধার্মিক ব্যক্তির না চরিত্র ঠিক থাকে না কাজ ও লেনদেন ঠিক থাকে। তার কথার কোনো ভিত্তি নেই। কেননা তার কোনো কাজ ভারসাম্যপূর্ণ নয়। বন্ধুত্বের কোনো সীমা থাকে না। শত্রুতারও কোনো সীমা থাকে না।

চরিত্রহীনতা, অসৎলেনদেন, অসৎকাজ, স্বার্থপরতা, অধিকারহরণ ইত্যাদি মন্দস্বভাব যা ঘৃণা সৃষ্টি করে–সারাদিন যদি তার মুখোমুখি হতে হয় তাহলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা কতোদিন টিকবে? পরস্পরের মধ্যে অসন্তোষে, অনৈক্য ও হিংসা-বিদ্বেষ শুরু হবে। এমনকি বিয়ের সব কল্যাণ ও উপকার নষ্ট হবে।

[ইসলাহে ইনকিলাব]

অনস্বীকার্য একসত্য

আমি নিজে দেখেছি, স্ত্রী সৌন্দর্যে হুরতুল্য আর ধন-সম্পদে কারুণতুল্য কিন্তু স্বামীর ধর্মহীনতার কারণে অথবা স্ত্রীর দুশ্চরিত্র, বদমেজাজ ও চালচলনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয় না। এ ওকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর ও একে দেখে নাক সিঁটকিয়ে চলে যায়। অঢেল সম্পদ থাকার পরও এক একটি পয়সার জন্য অন্যবাড়ি কাজে যেতে হয়। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি, চরম ঘৃণার কারণে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে পর্দা করে। এটাই হলো সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করার পরিণতি। [তালিমুদ্দিন]

প্রেমের সম্পর্ক হয়ে গেলে বিয়ে পড়িয়ে দেবে

যদি ঘটনাক্রমে কোনো অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কোনো পুরুষের প্রেমের সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে উত্তম হলো তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া। [তালিমুদ্দিন]

স্ত্রী অতিরিক্ত সুন্দর হওয়া কখনো ঝামেলার কারণ

আজকাল মানুষ বিয়ে করার জন্য রূপ-সৌন্দর্য খোঁজে। অথচ শান্তি ও ঝামেলামুক্ত থাকার জন্য স্ত্রী কম সুন্দরী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, রূপ-সৌন্দর্য কম হলে কুদরতিভাবেই নিরাপত্তালাভ করা যায়। রূপ-সৌন্দর্য আল্লাহর দান কিন্তু এর মধ্যে আজকাল ফেতনার আশঙ্কা বেশি। কখনো বাবা-মাকে অসন্তুষ্ট করে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। স্ত্রীর কারণে দীন থেকে দূরে সরে যায়। যার কারণ সুন্দরী স্ত্রীর ভালোবাসা। [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৭২১]

একসুন্দরী নারীর উপাখ্যান

কিছুদিন আগে একজন মহিলার চিঠি আসে। মহিলা প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ আমার কাছে বায়াত হয়েছে। সে খুবই ধার্মিক। স্বামীর কষ্ট দেয়া, অভদ্রতা ও অকৃজ্ঞতার অভিযোগ জানিয়েছে। যা পড়ে অন্তরে অনেক দুঃখ এবং ব্যথা লাগলো। মানুষেরা সীমাহীন অত্যাচারে উঠে-পড়ে লেগেছে। ওই অসহায় মহিলা এতোটুকু পর্যন্ত লিখেছে, কাঁদতে কাঁদতে আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। কখনো কখনো মনে চায়, পর্দা ছেড়ে বের হয়ে যাই অথবা কূপে ঝাঁপ দিয়ে মারা যাই। কিন্তু দীনবিরোধী বা শরিয়তনিষিদ্ধ বলে কিছু করতে পারি না। মনকে বুঝিয়ে থেমে যাই। দিন-রাত কাঁদা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

বড়ো অন্যায় কথা। বেচারি কাঁদা ছাড়া আর কি-ই বা করবে? তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে সতেরো বছর যাবৎ। লোকটা খুব আশা-আকাঙ্খা নিয়ে বিয়ে করেছিলো। সে সময় রূপ-লাবণ্য ভালো ছিলো। তখন বিভিন্ন অনুরোধ নিয়ে

লাটিমের মতো ঘুরতো। এখন সে দুর্বল হয়ে গেছে। তাই চোখ তুলেও তাকায় না। ভরণ-পোষণের পর্যন্ত মুখাপেক্ষী। স্বামী বয়সে ছোটো আর স্ত্রী বৃদ্ধা। এই পাষাণ, নির্দয় লোকটার পরিণতি কী হবে। কোনো কথায়ও কাজ হয় না। বেচারি যদি বলে আমার বিগতদিনের সেবার কি মূল্য? তাহলে বলবে, তুমি আমার কী সেবা করেছো? অজানা সেবার তালিকা মাথায় থাকে যা সে করতে পারেনি। এটাই হলো পরিণতি রূপ-লাবণ্যের ওপর ভিত্তি করে ধর্মবিমুখ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার।

সম্পদের জন্য বিয়ে করার নিন্দা

অনেকে শ্বশুরবাড়ির সম্পদ দেখে বিয়ে করে। বাস্তবে এটা মেয়েপক্ষের স্বামীর সম্পদ দেখার চেয়েও নিন্দনীয়। কোনো অবস্থাতে এর প্রাধান্য না পাওয়াটাই বিবেকের দাবি। কেননা স্বামীর ওপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং এই সূত্রে তার আর্থিক সামর্থ দেখা দোষের কিছু নয়। বরং একধরনের আবশ্যকীয় কল্যাণকর কাজ। হ্যাঁ, তবে এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা–যেমন সব প্রয়োজনীয় গুণের ওপর সম্পদের প্রাধান্য দেয়া নিন্দনীয়।

কিন্তু মেয়ের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এই আশায় যে, তা থেকে আমি উপকৃত হবো, আমার ওপর তার বোঝা হালকা হবে। এটা সীমাহীন হীনমন্যতা ও কাপুরুষিকতার শামিল। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৪২]

যৌতুকের লোভে বিয়ে করার পরিণতি

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, ধনী মেয়েরা দরিদ্রপুরুষকে কখনো মূল্যায়ন করে না। বরং তুচ্ছ ও সেবকজ্ঞান করে। ছেলের বাবা-মা যদি মনে করে এমন মেয়ে বিয়ে করাবো যেখান থেকে অনেক যৌতুক পাওয়া যাবে তাহলে তা বোকামি ছাড়া কিছু না। কেননা যৌতুকের মালিক স্ত্রী। অন্যদের তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক বা তার ওপর কিসের দাবি। যদি মনে করে ঘরে থাকবে এতে আমাদেরও কাজে লাগবে তাহলে তা হবে হীনমন্যতা ও লোভ।

আর যদি তা মেনেও নেয়া হয় তাহলে তা বর বা ছেলের ক্ষেত্রে ভাবা যায় কিন্তু এর সঙ্গে শ্বশুর-শ্বাশুরির কী সম্পর্ক? আজকাল ছেলেরা নিজের ইচ্ছায় বা বৌয়ের ইচ্ছায় পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং সমস্ত আশার গুড়েবালি।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪২]

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি যৌতুক দেয়

যদি স্বামীর আশা, চাওয়া, অপেক্ষা ইত্যাদি ছাড়াই কোনো উপঢৌকন স্ত্রীর বাড়ি থেকে দেয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

"আল্লাহ আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন অতঃপর আপনাকে সম্পদ দান করেছেন।"

وَاشْتُرِطَ عَدَمُ التَّطَلُّعِ وَالتَّشَرُّفِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَتَاكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

শর্ত করা হয়েছে প্রত্যাশা না করা এবং ইঙ্গিত না দেয়াকে। প্রমাণ রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বাণী–

"তোমার কাছে যা কোনো ইঙ্গিত ছাড়া আসবে তা গ্রহণ করো। সম্পদের পেছনে নিজেকে ব্যস্ত করো না।" [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪২]

সম্পদের অপেক্ষা করা এবং তার দিকে তাকিয়ে না থাকা। কেননা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন, "যা কিছু তোমার কাছে নিজের চাওয়া ছাড়া আসবে তা গ্রহণ করবে। যা তোমার কাছে আসবে না তার পেছনে পড়বে না।

অধ্যায় । ৬ ।
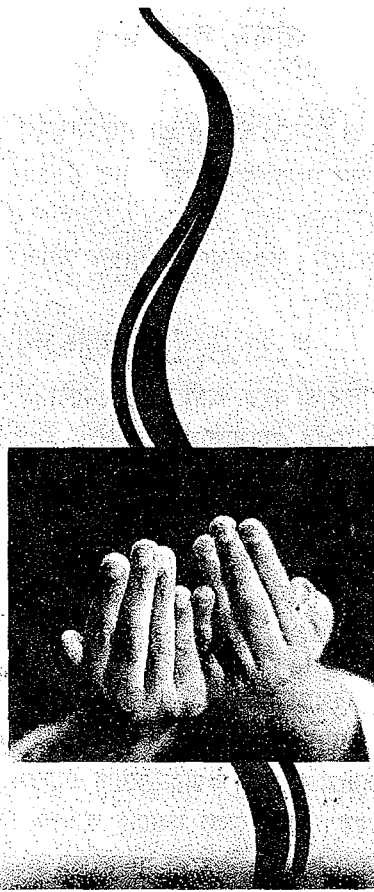
বিয়ের আগে দোয়া ও ইস্তেখারার প্রয়োজনীয়তা
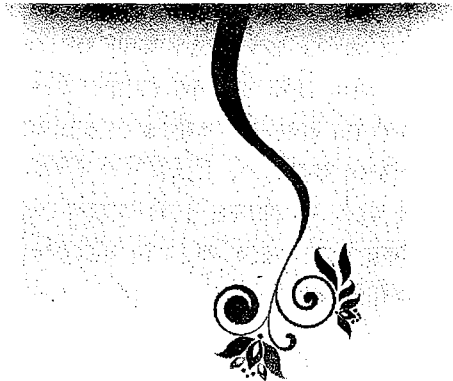
প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের আগে দোয়া ও ইসতেখারার প্রয়োজনীয়তা

দোয়া এমন একটি জিনিস যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্য সমান উপকারী হিসেবে গঠন ও অনুমোদন করা হয়েছে। কোরআন-হাদিসে দোয়ার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বহুজায়গায় দোয়ার মর্যাদা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ*

"দোয়া করো আমি সাড়া দেবো।"

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

اَلدُّعَاءُ اَعْظَمُ الْعِبَادَةِ*

"বড়ো ইবাদত হচ্ছে দোয়া।"

আরো বর্ণনা করেন, "যার দোয়া করার সুয়োগ হলো তার জন্য গ্রহণীয় হওয়ার দরোজা খুলে গেলো।"

অপর বর্ণনায় এসেছে, "তার জন্য জান্নাতের দরোজা খুলে গেলো।"

এক বর্ণনায় এসেছে, "রহমতের দরোজা খুলে গেলো।"

ভাগ্যবদল কেবল দোয়া দ্বারাই সম্ভব। দোয়া সবধরনের চেষ্টা ও সতর্কতা থেকে উপকারী। জাগতিক বিষয়েও দোয়া করার নির্দেশ এসেছে।

দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। কিন্তু কবুল হওয়ার আঙ্গিক বিভিন্ন প্রকার। কখনো সরাসরি কাঙ্ক্ষিত বস্তুটা মিলে যায়, কখনো পরকালের ভাণ্ডারে পুণ্য হিসেবে জমা হয়। কখনো দোয়ার বরকতে বিপদ কেটে যায়। আল্লাহর দরবারে হাত উঠালে কিছু না কিছু পাওয়া যায়। [মোনাজাতে মকবুলের ভূমিকা: পৃষ্ঠা: ১২-১৩]

দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্থা ও চেষ্টা থাকতে হবে

দোয়ার ব্যাপারে মানুষ একটি ভুল করে। তারা শুধু দোয়াকেই যথেষ্ট মনে করে, চেষ্টা করে না। অথচ চেষ্টা করাটাও দোয়ার অংশ। কেননা দোয়া দুই ধরনের **এক.** মৌখিক দোয়া এবং **দুই.** কর্মগত দোয়া। কাজের মাধ্যমে দোয়ার অর্থ হলো, চেষ্টা ও পরিশ্রম করা।

দোয়ার অর্থ যদি তাই হতো যা তোমরা বুঝো তাহলে তোমরা বিয়ে করো না। সন্তানের আশা করি কিন্তু বিয়ে করবো না। পির সাহেবের দোয়ার ওপর আমার

আস্থা আছে। বিষয়টি এমনই। এখন কি সন্তান লাভ করা সম্ভব? দোয়ার অর্থ হলো, চেষ্টার যতো দিক আছে অর্থাৎ বাহ্যিক উপকরণ ও প্রচেষ্টা চালানো। এরপর দোয়াও করো। একটি হাদিস থেকে এমনটি জানা যায়, اِعْقِلْ ثُمَّ تَوَكَّلْ "উটের রশি বাঁধো এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।"

[জরুরাতে তাবলিগ, মোলহাকায়ে দাওয়াত ও তাবলিগ: পৃষ্ঠা: ৩২৭]

সমস্ত চেষ্টা একদিকে আর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও দোয়া একদিকে। মানুষ তা ছেড়ে দিয়েছে। দোয়া একাগ্রতার সঙ্গে হওয়া উচিত। ফিকাহবিদগণ লিখেন, দোয়ার মধ্যে কোনো বিশেষ দোয়াকে নির্দিষ্ট করবে না। এতে একাগ্রতা নষ্ট হয়।

কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও শিষ্টাচার

১. দোয়ার অর্থ হলো, আমি আপনার অনুমতিসাপেক্ষে এমন জিনিস কামনা করছি যা আমার দৃষ্টিতে কল্যাণকর। যদি আপনি ভালো মনে করেন তাহলে দেবেন, নয়তো দেবেন না। আমি সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট। সেই সন্তুষ্টির নিদর্শন হলো, কবুল না হলে অভিযোগ না করা। মন খারাপ না করা।

২. আমাদের ললাটলিখন সম্পর্কে জ্ঞান নেই। তাই যেটা আমাদের দৃষ্টিতে ভালো মনে হয় তা চাইতে পারি। যদি তার বিপরীতে কল্যাণ থাকে তাতে খুশি থাকতে হবে। [আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৪৬]

৩. দোয়ার মধ্যে নিজের থেকে পদ্ধতি নির্ধারণ করা। যেমন, এমনটি হোক এরপর এমনটি হোক। দোয়ার মধ্যে বাড়াবাড়িও শিষ্টাচার বহির্ভূত। এটা কেমন যেনো আল্লাহকে সিদ্ধান্ত জানানো। যেমন কোনো বাচ্চা তার মাকে বললো, মা আমাকে চার নম্বর রুটিটা দেবেন। ভালো-মন্দে তার যায় আসে না। রুটি যেমনই হোক সেই রুটিই তার দরকার।

[আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩০]

৪. যেবিষয় সন্দেহপূর্ণ হয় কোনো নিদর্শন দ্বারা তার কোনোদিক প্রাধান্য না পায় সে ব্যাপারে সন্দেহের সঙ্গে দোয়া করা উচিত। আর যেবিষয়ের একটি দিক নিজের কাছে স্পষ্ট হয় নিদর্শনের মাধ্যমে কোনো একদিক ভালো বা মন্দ স্পষ্ট হলে সে বিষয়ে সন্দেহ ছাড়া দোয়া করা উচিত। সন্দেহের সঙ্গে দোয়া করার অর্থ হলো, হে আল্লাহ! বিষয়টি যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে দান করুন। নয়তো দান করবেন না। [আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩০]

ভালোস্ত্রীলাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমার প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের চোখে শীতলকারী ও আমাদেরকে খোদাভীরুলোকদের নেতা বানিয়ে দিন!"

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُعْطِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উত্তমসম্পদ, ভালোস্ত্রী ও সুসন্তান কামনা করি যা আপনি মানুষকে দান করেন। যারা নিজেরা ভ্রান্তকারী হবে না এবং অন্যকে ভ্রান্ত করবে না।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ-

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি।"

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অন্তর এবং আমাদের স্ত্রীগণ ও পরিবারে বরকত দান করুন! আপনি আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু। [মোনাজাতে মকবুল]

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ إِمْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِيْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ وَبَالًا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন স্ত্রীলোক থেকে আশ্রয় চাই, যে আমাকে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই বৃদ্ধ করে দেবে। এমন সন্তান থেকে আশ্রয় চাই যে আমার জন্য বিপদ হবে। এমন সম্পদ থেকে আশ্রয় চাই যা আমার জন্য শাস্তির কারণ হবে।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِيْنِيْ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤْذِيْنِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ اَمَلٍ يُلْهِيْنِيْ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নারীদের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি এমন কাজসমূহ থেকে আশ্রয় চাই যা আমাকে অপদস্ত করবে।

এমন সাথী থেকে আশ্রয় চাই যে আমাকে কষ্ট দেবে। এমন কামনা-বাসনা থেকে আশ্রয় চাই যা আমাকে অমনোযোগী করে দেবে।"

এই দোয়াগুলো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর 'মোনাজাতে মকবুল' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। শুরুতে এবং শেষে তিনবার করে দরুদশরিফ পড়ে নেবে।

ইস্তেখারার দোয়া

যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করবে তখন দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে এবং এই দোয়া পড়বে। যদি মুখস্থ না থাকে তাহলে দেখে পড়বে। আর দেখে পড়তে না পারলে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে অথবা নিজের ভাষায় পড়বে। তবে আরবিতে দোয়া পড়া উত্তম ও সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَ يَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার কাছে কল্যাণকামনা করছি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী। আপনার কাছে ক্ষমতাপ্রার্থনা করছি আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী। আপনার মহাঅনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা নিশ্চয় আপনি ক্ষমতা রাখেন, আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জানেন আমি জানি না। আপনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। হে আল্লাহ! এ বিষয়টি যদি আমার জন্য, আমার ধর্ম ও জীবযাপন এবং শেষ পরিণতির জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে তা আমার জন্য নির্বাচন করুন। আমার জন্য তা সহজ করে দিন। এ বিষয়ে আমাকে বরকত দান করুন। আর বিষয়টি যদি আমার জন্য, আমার ধর্ম ও জীবনযাপন এবং শেষ পরিণতির জন্য অকল্যাণকর জানেন তাহলে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন।

আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করুন তা যেমনই হোক এবং আমাকে তাতে সন্তুষ্ট করুন।" [মোনাজাতে মকবুল: পৃষ্ঠা: ২৪৮]
দাগটানা স্থানে যেকাজের জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে তার ধ্যান করবে।

বিয়ের জন্য ইস্তেখারা করা প্রয়োজন

ইস্তেখারা করতে ভয় পাওয়া আল্লাহর সঙ্গে গোপন বেয়াদবি। এর বাস্তবতা হলো, আল্লাহর ওপর এতোটুকু আস্থা নেই যে, আল্লাহর যা করবেন ভালো করবেন। নিজের বুদ্ধিতে যেটা ভালো মনে হয় সেটাই ভালো মনে করে। এজন্য সন্দেহের বাক্য– "হে আল্লাহ! যদি ভালো হয় তাহলে দান করবেন" উচ্চারণ করে না।
খাজা সাহেব বলেন, 'ভালোকাজে ইস্তেখারা করার প্রয়োজন নেই।'
প্রত্যেক কাজের মধ্যে ভালো ও মন্দ নিহিত থাকে। হজরত জয়নব [রদিয়াল্লাহু আনহা]-কে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সন্তুষ্টি সত্ত্বেও এবং এ কাজ কল্যাণকর হওয়াতে সন্দেহ না থাকার পরও তিনি বলেন,

لَا حَتّٰى اَسْتَشِيْرَ رَبِّيْ

"আমি এখন বিয়ের ব্যাপারে কিছুই বলবো না। যতোক্ষণ না নিজপ্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করবো।"এরপর তিনি ইস্তেখারা করেন।
এটা কি ইস্তেখারা করার মতো কোনো স্থান? প্রত্যেক কাজে ভালো-মন্দের সম্ভাবনা থাকে। এমনকি এমন স্পষ্ট ভালোকাজেও মন্দের সম্ভাবনা থাকে। যেমন, বিয়ের প্রাপ্য আদায় হলো না। সেবা ও আনুগত্য ঘাটতি হলো। তাহলে এমন বিয়ে বিপদের কারণ হবে। এজন্য হজরত জয়নব [রদিয়াল্লাহু আনহা] ইস্তেখারা করার প্রয়োজন বোধ করেন। [হুসনুল আজিজ: পৃষ্ঠা: ২৩৪-২৩৫]

ইচ্ছা করার আগে ইস্তেখারা করতে হবে

ইস্তেখারা করার নিয়ম এটা নয় যে, প্রথমে কাজের ইচ্ছা করে নেবে এরপর নামে মাত্র ইস্তেখারা করবে। বরং ইচ্ছা করার আগে ইস্তেখারা করে নেবে। যাতে অন্তরে প্রশান্তিলাভ হয়। মানুষ এই ক্ষেত্রে বড়ো ভুল করে। ইস্তেখারার সঠিক নিয়ম হলো, প্রথমে ইস্তেখারা করবে এরপর যেদিকে অন্তর বেশি ঝুঁকবে সে কাজটাই করবে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৩৩]

যেসব বিষয়ে ইস্তেখারা করতে হয়

ইস্তেখারা এমন বিষয়ে বৈধ যার উভয়দিক শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধতার বিচারে সমান। যে কাজের ভালো-মন্দ, বৈধতা ও অবৈধতা শরিয়তের দলিল দ্বারা নির্ধারিত সেকাজে ইস্তেখারা করা জায়েজ নয়। [আনফাসে ইসাঃ পৃষ্ঠাঃ ৩১৪]

ইস্তেখারা করতে হয় সন্দেহপূর্ণ স্থানে। সন্দেহের অর্থ উভয়দিকের উপকারিতা সমান। যখন একদিকের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয়ে যায় তখন ইস্তেখারার কী অর্থ? [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ২৪৪]

ইস্তেখারা এমন বিষয়ে করতে হয় বাহ্যিকদৃষ্টিতে যাতে লাভ-ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। [আনফাসে ইসাঃ পৃষ্ঠাঃ ৪০]

ইস্তেখারা এমন বিষয়ে বৈধ যার মধ্যে লাভ-ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। যেকাজে প্রাকৃতিকভাবে বা শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্ষতি সুনিশ্চিত সেকাজে ইস্তেখারা করার সুযোগ নেই। যেমন, নামাজ পড়ার ব্যাপারে ইস্তেখারা করা। দুই বেলা খাওয়ার ব্যাপারে ইস্তেখারা করা। চুরি করার ব্যাপারে ইস্তেখারা করা। বিকালঙ্গ নারীকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইস্তেখারা করা।

[মালফুজাতে আশরাফিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ২১৫।

ইস্তেখারার মূলকথা

ইস্তেখারার মূলতত্ত্ব হলো, ইস্তেখারা হলো ভালোকাজে সাহায্য চাওয়ার দোয়া। ইস্তেখারার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করে যেকাজই করে তাতে যেনো কল্যাণ হয়। আর যেকাজ আমার জন্য কল্যাণকর নয় তাতো করতেই দেবেন না। যখন ইস্তেখারা করা হলো তখন আর এটা ভাবার দরকার নেই যে, আমার অন্তরের ঝোঁক কোন দিকে। তার ওপরই আমল করবে। বরং অন্যকোনো লাভের কথা ভেবে যেকাজ অগ্রাধিকার দিয়েছিলে শেষ পর্যন্ত তার ওপর আমল করবে। এটাকেই ভালো মনে করবে। মূলকথা হলো, ইস্তেখারা মানে কল্যাণকামনা করা। কোনো সংবাদ সম্পর্কে জানা নয়।

[আনফাসে ইসাঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৬৭৫]

ইস্তেখারা একধরনের দোয়া। তাহলো, হে আল্লাহ! এই কাজ যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আমার অন্তরকে সেদিকে ফিরিয়ে দাও। নয়তো বিষয়টা আমার অন্তর থেকে সরিয়ে দাও এবং যা আমার জন্য ভালো হবে তা স্থির করে দাও!

এরপর যদি কাজটির প্রতি অন্তর ঝুঁকে তাহলে তা করাকে কল্যাণকর মনে করবে। চাই তা সফলতা আকারে আসুক, চাই ব্যর্থতার আকারে আসুক।

ব্যর্থতার সময় তার ফলাফলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত থাকে। যেমন, পৃথিবীতে তার উত্তমপ্রতিদান পাওয়া গেলো অথবা পরকালে ধৈর্যের প্রতিদান বা সোয়াব পাওয়া গেলো। ইস্তেখারা না করলে সামগ্রিকভাবে এসব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। [মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ২১৫]
ইস্তেখারার সারকথা হলো, ইস্তেখারার মাধ্যমে সর্বোত্তম কাজের সুযোগ হয়। ইস্তেখারার দোয়ায় আছে, ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ অর্থাৎ কল্যাণকর কাজের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের প্রশান্তিও দান করুন! [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৩৪]

ইস্তেখারা কখন উপকারী

ইস্তেখারা এমন ব্যক্তির জন্য উপকারী যে চিন্তামুক্ত হবে। নয়তো মাথায় নানা চিন্তা থাকলে অন্তর সেদিকে ঝুঁকে যায়। সে মনে করে, ইস্তেখারা করে আমি এটাই জানতে পেরেছি। স্বপ্নে এবং কল্পনায় সে আগের জিনিস দেখতে পায়।
[ইফাজাতুল ইয়াওমিয়া: খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১২৫]

ইস্তেখারার উদ্দেশ্য

ইস্তেখারার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কাজের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ইস্তেখারা করার দ্বারা তার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে এবং জানা যাবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। এরপর যেটা কল্যাণকর হবে সেটাই করবো। অনেক সময় আমরা দেখি, ইস্তেখারা করার পরও দ্বিধা দূর হয় না। তখন প্রশ্ন হয়, ইস্তেখারার বিধান দেয়া হয়েছে দ্বিধা দূর করার জন্য অথচ ইস্তেখারা করে তা দূর হলো না। তাহলে কেমন জানি আল্লাহর এই বিধানটি নিষ্ফল হয়ে গেলো। যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনর্থক বিষয়ের বিধান হতে পারে না তাই বুঝা গেলো ইস্তেখারার উদ্দেশ্য তার দ্বারা এমন কিছু জানা নয় যার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে এবং এই কাজের দুই দিকের একদিকের প্রাধান্য অবশ্যই অন্তরে পাবে। [ইফাজাতুল ইয়াওমিয়া: খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১২৮]

ইস্তেখারার উপকারিতা

ইস্তেখারার লাভ হলো অন্তরে এতোটুকু প্রশান্তিলাভ করা– আমাকে অবশ্যই কল্যাণ দান করা হবে। ইস্তেখারা করা আর না করার মধ্যে পার্থক্য হলো, যদি ইস্তেখারা করে সে প্রভাবিত হয় তাহলে তার অন্তরে এমন কিছু আসবে না যাতে অসতর্কতা ও ক্ষতি হতে পারে। আর ইস্তেখারা না করলে এমন কিছু অর্জন না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সামান্য চিন্তা করার কারণে তা ক্ষতিকর মনে হয়েছে কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করেনি। অসতর্কতাবশত ক্ষতিকর বিষয়টাই

বেছে নিয়েছে। যখন সে নিজের হাতে ক্ষতিকর বিষয় বেছে নেয় তাতে কল্যাণের কোনো অঙ্গীকার নেই। সুতরাং ইস্তেখারা সফলতার অঙ্গীকার নয় বরং কল্যাণের অঙ্গীকার। তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য।

[মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ২১৫]

ইস্তেখারার সময়

অধম [সংকলক] প্রশ্ন করেছিলো, ইস্তেখারার জন্য রাত হওয়া আবশ্যক কী? থানবি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এটা একটি ভিত্তিহীন প্রথা। ইস্তেখারার নামাজের পর না শোয়া আবশ্যক, না রাত হওয়ার প্রয়োজন আছে। যেকোনো সময়ে যেমন, জোহরের নামাজের সময় দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে সুন্নত দোয়া পাঠ করবে। এরপর অন্তরের প্রতি মনোযোগ দেবে। একদিনে যতোবার ইচ্ছা ইস্তেখারা করবে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৩৪]

ইস্তেখারা করার পদ্ধতি

একব্যক্তি ইস্তেখারা করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চায়। তখন তিনি বলেন, ইস্তেখারার দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করে ইস্তেখারার দোয়া পড়বে। এরপর অন্তরের প্রতি মনোযোগ দেবে। মনোযোগ দিয়ে বসে থাকবে, শোয়ার প্রয়োজন নেই। ইস্তেখারার দোয়া একবার পড়াই যথেষ্ট। হাদিসশরিফে একবারই এসেছে। প্রথমে কোনো কাজের প্রতি মন ঝুঁকে তা মিটিয়ে ফেলবে। যখন নিজের মধ্যে একাগ্রতা আসবে তখন ইস্তেখারা করবে এবং এভাবে দোয়া করবে– "হে আল্লাহ! আমার জন্য যা কল্যাণকর তা-ই যেনো হয়।" মাতৃভাষায়ও দোয়া করা জায়েজ আছে। তবে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর শব্দে দোয়া করা উত্তম। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৪৭]

ইস্তেখারার উপকার পেতে হলে

ইস্তেখারা এমন ব্যক্তির জন্য উপকারী যে চিন্তামুক্ত হবে। নয়তো মাথায় নানা চিন্তা থাকলে অন্তর সে দিকে ঝুঁকে যায়। সে মনে করে, ইস্তেখারা করে আমি এটাই জানতে পেরেছি। স্বপ্নে এবং কল্পনায় সে আগের জিনিস দেখতে পায়।

[ইফাজাতুল ইয়াওমিয়া: খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১২৫]

নির্ধারিত ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের দোয়া বা তাবিজ

ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, এমন তাবিজ দেয়া নাজায়েজ যার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর অনুগত হয়ে যায় বা বশে চলে আসে। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর জন্যই যখন এমন তাবিজ অবৈধ সুতরাং বিয়ের ব্যাপারে এমন তাবিজ করা হারাম। এমন

অবস্থায় বিয়েই বৈধ হবে না। কীভাবে এমন তাবিজ দেয়া বৈধ হতে পারে যার দ্বারা বিয়ে বৈধ এমন এক ব্যক্তিকে বশ করা হবে? কিন্তু অনেক বুজুর্গ এমন তাবিজ দিয়ে থাকেন। ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, যখন স্পষ্টভাবে এমন তাবিজ প্রদান করা হারাম তখন কোনো বুজুর্গ বা সুফির দ্বারা হলেও গোনাহ হবে। [আজলুল জামিয়াহ: পৃষ্ঠা: ৩৮২]

বিয়ের ব্যাপারে তাবিজ ও আমল করার শরয়িবিধান

প্রশ্ন : বিধবানারীকে বিশেষ আমল করে বিয়েতে রাজি করা জায়েজ আছে কি?

উত্তর : আমল তার ফলাফল হিসেবে দুই প্রকার। **এক.** এমন আমল যার ফলে যার উপর আমল করা হয়েছে সে অনুগত, বুদ্ধিহীন বাধ্য হয়ে যাবে। এ জাতীয় আমল এমন ক্ষেত্রে করা বৈধ নয় যা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়। যেমন, নির্ধারিত নারী বা পুরুষকে বিয়ে করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং নির্ধারিত নারী বা পুরুষকে বিয়ে করার জন্য তাবিজ করা বৈধ নয়।

দুই. এমন আমল যার ফলে সে বাধ্য হয়ে যায় না বরং সে দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্তর্দৃষ্টিতে নিজের জন্য উপকারী মনে করলে এমন আমল এমন কাজের জন্য করা জায়েজ আছে। এটা কোরআন ও শরিয়তের অন্যান্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

সহজে বিয়ে হওয়ার আমল

এশার নামাজের পর 'ইয়া লাতিফু' ও 'ইয়া ওয়াদুদু' এগারোশো এগারোবার পড়বে। শুরুতে এবং শেষে তিনবার করে দরুদশরিফ পড়বে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমল করতে হবে। আমল করার সময় তার কথা [যাকে ভালো লাগে] ভাবতে হবে। আল্লাহর কাছে দোয়াও করবে। ইনশাল্লাহ, উদ্দেশ্য পূরণ হবে। উদ্দেশ্য যদি আমল শেষ হওয়ার আগে পূরণ হয়ে যায় তাহলেও আমল ছাড়বে না। [বিয়াজে আশরাফি: পৃষ্ঠা: ২৩৯]

মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব আসার দোয়া

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ - وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا
نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব বেশি আসার জন্য এই দোয়াটি হরিণের চামড়া বা কাগজে লিখে একটি পাত্রে ভরে রেখে দেবে। [আমলে কোরআনি: পৃষ্ঠা: ৬৪]

বিয়ে বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ

১. যদি প্রয়োজন থাকে এবং সামর্থও থাকে তাহলে বিয়ে করা উত্তম। আর যদি প্রয়োজন থাকে কিন্তু সামর্থ না থাকে তাহলে অধিক পরিমাণে রোজা রাখবে। এতে জৈবিকচাহিদা নষ্ট হয়ে যাবে।

২. বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রীর ধার্মিকতার প্রতি বেশি লক্ষ করবে। সম্পদ, সৌন্দর্য ও বংশীয় আভিজাত্যের পেছনে পড়বে না।

৩. যদি কোনো ব্যক্তি তোমার বোনের বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয় তাহলে বেশি খেয়াল করবে উত্তমস্বভাব, রীতি-নীতি ও ধার্মিকতার ওপর। সম্পদ, পদমর্যাদা ও বংশীয় আভিজাত্যের গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে শুধুই অমঙ্গল।

৪. যদি কেউ কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকে তাহলে যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো উত্তর না পাবে অথবা নিজের থেকে সরে না যাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি বিয়ের প্রস্তাব দেবে না।

৫. যদি কেউ দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় তাহলে সে মহিলা বা তার পরিবারের জন্য আগের স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত করা বৈধ নয়। বরং নিজের ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। হাদিসশরিফে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৬. হিলা করার জন্য বিয়ে করা অত্যন্ত অমর্যাদাবোধের কথা। হাদিসশরিফে এমন লোকের ওপর আল্লাহর অভিশাপের কথা উল্লেখ আছে।

৭. বিয়ে মসজিদে হওয়া উত্তম। তাতে প্রচার বেশি হবে। স্থানটিও বরকতের।

৮. স্বামী-স্ত্রীর একান্ত আচরণ ও বিশেষ সম্পর্কের কথা বন্ধু-বান্ধব, সাথীবর্গ ও বান্ধবীদের সামনে বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের। অধিকাংশ মানুষ বিষয়টা খেয়াল করে না।

৯. ওলিমা [বিয়ের পর ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] করা মোস্তাহাব। কিন্তু বোঝা সৃষ্টি করা বা গর্ব-প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না।

১০. বিয়ের ব্যাপারে যদি কেউ তোমার সঙ্গে আলোচনা করে তাহলে কল্যাণকামিতার সঙ্গে পরামর্শ দেবে। যদি কোনো দোষ তোমার জানা থাকে তাহলে তা প্রকাশ করে দেবে। এমন পরনিন্দা হারাম নয়। কল্যাণকামিতার জন্য যদি দোষ বলার প্রয়োজন হয় তাহলে শরিয়তে তার অবকাশ আছে বরং কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ করা ওয়াজিব। [তালিমুদ্দিন : বিয়ে অধ্যায়]

প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সংশোধন

অধ্যায় ।৭।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিয়ের আগে কনে দেখে নেয়া উচিত

বর ও কনের পরস্পর বোঝা-পড়া এবং সুসম্পর্কের জন্য দেখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। বিয়ের সময় অবস্থা জানা ছাড়াও মেয়েকে একবার দেখে নেয়ার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই বরং দেখাই উচিত। কারণ, সম্পর্কটা হচ্ছে সারা জীবনের জন্য। হাদিসশরিফ কনে দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে দেখতে হবে জানার নিয়তে। উপভোগ বা স্বাদ নেয়ার নিয়তে নয়। যেমন ডাক্তার ও চিকিৎসকের জন্য রোগীর শরীরের তাপমাত্রা ইত্যাদি জানার নিয়তে দেখা জায়েজ। নয়তো স্বাদ নেয়ার জন্য দেখা জায়েজ নয়।

[ইফাজাতুল ইয়াওমিয়াঃ খণ্ডঃ ৫, পৃষ্ঠাঃ ৫৫]

যদি কোনো মহিলাকে বিয়ের ইচ্ছে করে এবং নিজেদের মনমতো হয় তবুও একবার দেখে নেবে। যাতে বিয়ের পরে তাকে দেখে বিতৃষ্ণা না আসে।

[তালিমুদ্দিন]

জরুরি সতর্কতা

হাদিসশরিফে ছেলেদের জন্য মেয়েদেখা প্রমাণিত। কিন্তু মেয়েদের দেখানো প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ হাদিসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, মেয়েপক্ষ নিজেদের থেকে ছেলেপক্ষকে মেয়ে দেখিয়ে দেবে। বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, ছেলেপক্ষের জন্য অনুমতি আছে যদি তোমাদের অনুকূল মনে হয় তাহলে তোমরা দেখে নেবে। হাদিসের উদ্দেশ্য কখনো এই নয় মেয়েপক্ষ নিজের থেকে ছেলেপক্ষকে মেয়ে দেখাবে। এ ব্যাপারে হাদিস চুপ রয়েছে।

[ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ৩০০]

নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব সম্পর্ক

কিছু মানুষকে দেখেছি তারা বাগদানকৃত মেয়ের সঙ্গে স্ত্রীসুলভ আচরণ করে। যা বিয়ের আগে করা হারাম। তারা মনে করে, যা কিছুদিন পরে হালাল বা বৈধ হবে তা এখন থেকে শুরু হলো। এটা শরিয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে অবৈধ হওয়া স্পষ্ট। কারো সন্দেহ হতে পারে, যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে আগে থেকে দেখা বৈধ। দেখা এক প্রকার উপভোগ বা স্বাদ নেয়া। আর সব উপভোগ সমান।

তার উত্তর তার প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে, প্রস্তাব পাঠানোর আগেও দেখা জায়েজ আছে। যার উদ্দেশ্য উপভোগ নয় বরং তার উদ্দেশ্য হলো অনুমান করা যে, আমি শুনে বা বুঝে যে ধরনের যতোটুকু সৌন্দর্য ও অন্যান্যগুণ বিয়ের পরে উপভোগ করতে চাই তা এই মেয়ের মধ্যে আছে কী-না। যদি না থাকে তবে তার সঙ্গে জীবনযাপন অসম্ভব হতে পারে। তাই শরিয়ত শুধু একবার চেহারা দেখার অনুমতি দিয়েছে। দেখার অনুমতি দিয়েছে প্রয়োজনে, তবে সে দৃষ্টি উপভোগের জন্য হবে না। সেখানে দ্বিতীয় দৃষ্টি যা অপ্রয়োজনীয়, এমনিভাবে স্পর্শ করা ও এমন অন্যান্য কাজকে তার ওপর কেয়াস বা তুলনা করা কীভাবে সম্ভব? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৪]

অবিবাহিত নারী যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছে তার কল্পনা করে স্বাদ নেয়া হারাম

যেমহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়নি কিন্তু বিয়ে কল্পনা করে ভাবে– যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে তার সঙ্গে এভাবে সঙ্গলাভ করবো; বিয়ের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক এভাবে স্বাদ নেয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কারণ, যাকে কল্পনা করে স্বাদ নিচ্ছে সে এখনো হালাল হয়নি। শরিয়ত স্বাদ নেয়া হালাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন স্থান তথা অন্তরে কামনা বা আশা করাকে জিনা [অবৈধ যৌনাচার] বলেছে। স্তরগত দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও তা পাপের অন্তর্ভুক্ত।

যদি কোনো মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয়ে ছিলো কিন্তু তালাক বা অন্যকারণে বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, যদি সে জীবিত থাকে, চাই কারো সঙ্গে বিয়ে হোক বা না হোক–তাকে নিয়ে এভাবে কল্পনা করা– স্ত্রী থাকাকালীন তার সঙ্গে এভাবে মজা করতাম, এগুলো হারাম।

আর যদি মহিলা অন্যকারো সঙ্গে বিয়ে করে মারা যায় তাহলেও তার কল্পনা করে মজা নেয়া হারাম। কারণ, অন্যজনের সঙ্গে বিয়ে করার কারণে সে এমন সম্পর্কহীন হয়ে গেছে যেমন সে বিয়ের আগে ছিলো। আর যদি মহিলা তার বিবাহ-বন্ধনে থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে আমার ধারণা অনুযায়ী বৈধতাই অগ্রাধিকার পায়। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৭০]

বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ের মতামত জানা আবশ্যক

একটি অপূর্ণতা হলো অধিকাংশ বর-কনের অনুমতি নেয়া হয় না। আশ্চর্য! বিয়ে যখন দু'জন মানুষের সারাজীবনের সম্পর্ক, যাদের মধ্যে হাজারো বিষয়ের লেনদেন হবে, তাদের যদি অন্যমত থাকে; তাদের জন্য অকল্যাণকর হয় বা

তারা অসন্তুষ্ট থাকে তবুও তাদের কাছে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় না। জোরপূর্বক বিয়ে দেয়া হয়। অনেকসময় মূল সময় পর্যন্ত বর-কনে উভয়ে বা তাদের একজন অস্বীকার করতে থাকে। কিন্তু জোরপূর্বক তাকে চুপ করানো হয়। সারাজীবনের জন্য তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। এটা কি বিবেক ও শাস্ত্রবিরোধী নয়? এতে কি অজস্র দুঃখ ও অকল্যাণ চোখে পড়ে না? কেমন অবিচার! কখনো কল্যাণের কথা চিন্তা করে তার মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। তাকে ধরে বেঁধে বিপদে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৪]

বর-কনের অমতে বিয়ে দেয়ার বিধান

অনেক জায়গায় দেখা যায় অপছন্দ সত্ত্বেও বিয়ে দেয়ার ফলে স্বামী সারাজীবন আর স্ত্রীর খবর নেয়নি। বুঝালে স্পষ্ট উত্তর দেয়, আমি আমার মত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম। যারা এই সম্পর্ক করেছে এই দায়িত্ব তাদের।

এখন বলুন! এই সমস্যার সমাধান কী। মুরুব্বি বা অভিভাবকদের কল্যাণ হয়েছে আর অসহায় মজলুম নারী জেলে বন্দি হয়েছে। কোথায় সেই বিবেকক্ষয়প্রাপ্ত মানুষ। তারা এসে এই অত্যাচারিতাকে সাহায্য করুক। সাহায্য কি করবে সে হয়তো মরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আর বেঁচে থাকলে এ কথা বলে এড়িয়ে যাবে। আমিতো কারো ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়নি। এটা তার কপাল। হায় অভিশাপ! কী অভিশপ্ত উত্তর! শুনলে গায়ে আগুন ধরে যায়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৪]

ইচ্ছে করে এমন যারা বলে তাদের গলা টিপে ধরি। তাদের ভাবটা হলো, আমাদের কোনো দোষ নেই। সব দোষ আল্লাহর!

[হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৪]

বর-কনের মতামত নেয়ার পদ্ধতি

উত্তম পদ্ধতি হলো, যার সঙ্গে সে ফ্রি বা খোলা মনে কথা বলতে পারে যেমন, সমবয়স্ক বন্ধু বা বান্ধবী তাদের মাধ্যমে তার মনের কথা জেনে নেবে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, এভাবে তাদের মতামত জানাটা সবচে নিরাপদ। কখনো জিজ্ঞেস করা ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে এমন আন্তরিক বন্ধুর কাছে নিজের পছন্দ ও অপছন্দের কথা জানিয়ে দেয়। অভিভাবকগণ পর্যন্ত তা জেনে যান। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৪]

সবকিছু বর-কনের ওপর ছেড়ে দেয়াও চরম ভুল

বর-কনের মতামতের গুরুত্ব দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সবকিছু তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। এটা নিশ্চিত সব ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উত্তম মতামতের অধিকারী হয় না। তখন এসব অনভিজ্ঞদের মতামতই বা কী? আর তার ভরসাই বা কী!

অধিকাংশ সময় অভিভাবকগণ অভিজ্ঞতা ও ভালোবাসার আলোকে এমন সিদ্ধান্ত নেন যা কল্যাণকর। সুতরাং আমার মত এটা নয় এবং কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিও তা সমর্থন করবে না যে, ছেলে-মেয়ের মতামতের উপর সবকিছু ছেড়ে দেয়া হবে। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, ছেলে-মেয়ের অভিভাবক অভিজ্ঞতা ও ভালোবাসার আলোকে তাদের কল্যাণের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখবেন। এরপর সতর্কতাপূর্বক ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের সম্মতি ও সন্তুষ্টি অর্জন করবে। তার আগে বিশেষভাবে তাদের মতামত জানতে চাইবে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩]

বড়োদের মতামত ছাড়া বিয়ে করার কুফল

আমি বড়োদের সম্মতিতে বিয়ের করার পর ঘরে বরকত দেখেছি। তা সে বিয়েতে দেখিনি যা স্বাধীনভাবে করা হয়েছে। খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে বিয়ের কথা বলা নির্লজ্জতার প্রমাণ।

إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

"যখন তোমার লজ্জা নেই তখন যা খুশি তা-ই করো।"

নির্লজ্জ মানুষের থেকে যে মন্দস্বভাব প্রকাশ পাবে অসম্ভব নয় জ্ঞানীব্যক্তি তা দেখেই এমন মহিলা থেকে বিরত থাকবে। বুঝতে পারবে, সে নির্লজ্জ মহিলা।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৪]

আমার মতে নারীর সবচেয়ে বড়ো অলঙ্কার লজ্জা ও সংকোচবোধ এবং তা সব কল্যাণের চাবিকাঠি। যখন লজ্জাই থাকলো না তখন ভালোরই বা কি আশা আর অমঙ্গলই বা কতোদূর। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৭১]

ছেলে-মেয়ের মধ্যে লজ্জা থাকা আবশ্যক

লাজ-শরম কম-বেশি ছেলেদের মধ্যেও থাকা আবশ্যক। বিশেষত ভারতবর্ষের জন্য আবশ্যক। কারণ এখানে অনেক ফেতনা ছড়িয়ে আছে। যার প্রতিরোধ লজ্জা দ্বারা সম্ভব। দিনে দিনে লজ্জা কমছে। আমরা শৈশবে ছেলেদের মধ্যে যে পরিমাণ লজ্জা দেখেছি এখনকার ছেলেদের মধ্যে তা দেখা যায় না। এখন

বৃদ্ধদের মধ্যে যতোটা দেখা যায় যুবকদের মধ্যে তা দেখা যায় না। লজ্জাহীনতার কারণে সমাজে মন্দের বিস্তার হচ্ছে। এজন্য কম-বেশি লজ্জা থাকা অনেক প্রয়োজন। তার প্রমাণ হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর আমল। তিনি এসে চুপ করে বসে থাকেন। লজ্জায় জিহ্বা নাড়াতে পারেন না। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছো।' [আজলুল জাহিলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২৬১]

গণমাধ্যমে বিয়ে

আজকাল একটি ঝড় শুরু হয়েছে। সংবাদের বিষয়ের মতো পাত্র-পাত্রীর বিবরণ সংবাদপত্রে ছাপানো হচ্ছে। কখনো পাত্র ঘোষণা করছে– আমাদের কাছে এই সম্পত্তি আছে, এই চাকরি করি, এই এই যোগ্যতা আছে; আমরা এমন একটি মেয়ে চাই। যাদের পছন্দ হয় আমাদের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করবে। এরপর একজন পাত্রী সংবাদপত্রের মাধ্যমে বা সরাসরি তার উত্তর লিখেন। নিজের সব গুণ এবং সুন্দর হওয়ার বিবরণ নিজের নির্লজ্জ কলমে লিখে। কিছু শর্তের কথাও জানায়। এভাবে পত্র লিখেই স্বাদ মিটে যায় কখনো আর মনমতো হয় না। কখনো বিয়ের আগে দুই-চারবার সাক্ষাৎ হয়। যাতে দেখা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পর বিয়ে হয়। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ কেমন অভিশাপ নেমে আসছে।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৯]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুবক-যুবতীর ইচ্ছা

হজরত আবুসায়িদ [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেছেন, 'প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া দিয়ো না।' [হায়াতুল মুসলিমিনঃ পৃষ্ঠাঃ ১৯২]

যুবতীনারীর ইচ্ছা সে চাইলে বিয়ে করবে না চাইলে করবে না। যাকে খুশি বিয়ে করবে কেউ বাধ্য করবে না। যদি সে নিজে কারো সঙ্গে বিয়ে করে তাহলে বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে। অভিভাবকগণ জানুক বা না জানুক। তারা সন্তুষ্ট থাকুক আর না থাকুক। সর্বাবস্থায় বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সে যদি কুফু বা সমতা রক্ষা না করে, নিজের চেয়ে নিম্নশ্রেণীতে বিয়ে করে তাহলে ফতোয়া হলো, তার বিয়ে শুদ্ধ হবে না।

যদি বিয়ে কুফু বা সমতা রক্ষা করে কিন্তু তার মহর তার বংশের অন্যমেয়েদের মহর–যা শরিয়তের পরিভাষায় 'মহরেমিছিল' থেকে অনেক কম হয় তবুও বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে। তবে অভিভাবকগণ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারবে। তারা মুসলিম বিচারকের কাছে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার আবেদন করবে।

[বেহেশতি জেওরঃ খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ২০০]

এমন অবস্থায় অভিভাবকগণ বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। তারা ইসলামিরাষ্ট্রের বিচারকের কাছে অভিযোগ করবে। তিনি তদন্ত করে বলবেন, আমি বিয়ে ভেঙ্গে দিলাম, তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। শুধু বাবা যদি বলেন, আমি রাজি নই। তাহলে বিয়ে ভাঙ্গবে না। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৮০]

ছেলেদের বিধানও ঠিক এমন। যদি যুবক হয় তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া বিয়ে দেয় তাহলে তার অনুমতির ওপর মওকুফ বা স্থগিত থাকবে। যদি অনুমতি দেয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে নয়তো হবে না।

[বেহেশতি জেওরঃ খণ্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ২০২]

ছেলে-মেয়ের সম্মতি ছাড়া বিয়ের বিধান

যদি ছেলে বা মেয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার নেই। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া তাদের বিয়ে বৈধ নয়। যদি সে অভিভাবকের

অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে ফেলে বা অন্য কেউ তাদের বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে সে বিয়ে অভিভাবকের অনুমতির ওপর স্থগিত থাকবে। যদি অনুমতি দেয় তাহলে বিয়ে বৈধ হবে নয়তো বিয়ে বৈধ হবে না। অভিভাবকের তার বিয়ে দেয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে তখন সে বিয়ে প্রতিহত করতে পারবে না।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২০২]

যদি মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং যেসময় তার বাবা তার কাছে অনুমতি চান অথবা বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংবাদ তার কাছে পৌঁছে তখন সে বিয়ে অস্বীকার করলে বিয়ে হবে না। কারণ, অভিভাবকগণ জোর করার অধিকার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত সংরক্ষণ করেন। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও বিয়ের অনুমতি চাওয়ার সময় বা বিয়ের সংবাদ পৌঁছার সময় যদি চুপ থাকে তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের আগে বা বিয়ের পরের অস্বীকারের কোনো মূল্য নেই। যদি বাপের হয়ে অন্যকেউ অনুমতি চায় তাহলে শুধু চুপ থাকা সন্তুষ্টির প্রমাণ বলে গণ্য হবে না যতোক্ষণ না মুখে অনুমতি দেবে।

মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত হলো, স্বপ্নদোষ হওয়া, ঋতুস্রাব আসা, গর্ভবতী হওয়া। এসব চিহ্ন না পাওয়া গেলে পনেরো বছর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ফতোয়া দেয়া হবে। যদি মেয়ে নিজে বলে আমি প্রাপ্তবয়স্ক এবং বাহ্যিক অবস্থা তাকে অস্বীকার না করে তাহলে তাকে সত্যায়ন করা হবে। শর্ত হলো, তার বয়স কমপক্ষে নয় হতে হবে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮৬]

অনুমতি নেয়ার পদ্ধতি এবং কিছু প্রয়োজনীয় মাসয়ালা

১. যদি মহিলা নিজে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে এবং ইশারা করে বলে, আমি তার বিয়ে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। সে যদি বলে আমি কবুল করলাম; তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। নাম নেয়ার দরকার নেই।

২. যদি উপস্থিত না থাকে তাহলে নাম উল্লেখ করতে হবে। তার পিতার নামও উল্লেখ করতে হবে। এতোটা উচ্চস্বরে নাম বলতে হবে যাতে সাক্ষী শুনতে পারে। যদি মানুষ তার পিতাকে না চেনে তাহলে তার দাদার নাম উল্লেখ করতে হবে। উদ্দেশ্য হলো, এমন ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে অমুকের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।

৩. যুবতী কুমারী মেয়েকে যদি বাবা বলেন, আমি তোমার বিয়ে অমুকের সঙ্গে দিচ্ছি এবং সে শোনার পর চুপ থাকে, মুচকি হেসে দেয় বা কান্না শুরু করে তাহলে তা অনুমতি বলে গণ্য হবে এবং বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। এমন নয় যে,

মুখে বললেই কেবল অনুমতি হবে। যারা জোরপূর্বক মুখে উচ্চারণ করান তারা ভালো করেন না।

৪. যদি অনুমতি চাওয়ার সময় নাম উল্লেখ না করে এবং সে তার নাম আগে থেকে না জানে তাহলে চুপ থাকা সন্তুষ্টি হবে না। তা অনুমতি মনে করা যাবে না বরং নাম ও তার অবস্থা জানানো আবশ্যক। যাতে মেয়ে বুঝতে পারে সে অমুক। এমনিভাবে যদি মহর উল্লেখ না করে এবং 'মহরেমিছিল' থেকে অনেক কম মহর ধরা হয় তাহলে মেয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হবে না। এজন্য নিয়মমাফিক আবার অনুমতি নিতে হবে।

৫. বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য এটাও একটি শর্ত যে, কমপক্ষে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দু'জন মহিলা উপস্থিত থাকতে হবে। তারা নিজ কানে বিয়ে এবং ছেলে-মেয়ের সম্মতিবাক্য শুনলেই তবে বিয়ে হবে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪]

অভিভাবক কাকে বলে

ছেলে ও মেয়েকে বিয়ে দেয়ার অধিকার যাদের থাকে তাদেরকে অভিভাবক বলা হয়। ছেলে ও মেয়ের অভিভাবক প্রথমে পিতা। সে না থাকলে দাদা। দাদা না থাকলে পরদাদা। যদি তারা না থাকেন তাহলে সহোদর ভাই। সে না থাকলে সৎভাই [বাপ-শরিক], তারপর ভাতিজা, তারপর ভাতিজার ছেলে, এরপর তার ছেলে, এরপর সৎচাচা, তারপর তার ছেলে এবং অধস্তন পুরুষ। তাদের কেউ না থাকলে বাবার চাচা এবং তার অধস্তন পুরুষ। তাদের কেউ না থাকলে দাদার চাচা এবং তাদের অধস্তন পুরুষ প্রমুখ।

ওপর্যুক্ত কেউ না থাকলে মা অভিভাবক হবেন, এরপর দাদী এবং নানী, এরপর নানা, এরপর সহোদর বোন, এরপর সৎবোন [বাপ-শরিক], এরপর ফুফু, এরপর মামা, এরপর খালা প্রমুখ।

অপ্রাপ্তবয়স্কব্যক্তি কারো অভিভাবক হতে পারে না। পাগল কারো অভিভাবক হতে পারে না। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২০০]

মেয়েদের নিজে বিয়ে করার কুফল

কোনো সন্দেহ নেই প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান মেয়ে যদি নিজের বিয়ের কথাবার্তা নিজে বলে এবং প্রস্তাব দেয় ও গ্রহণ করে তাহলে তার বিয়ে হয়ে যাবে। তবে দেখার বিষয় হলো, বিনা প্রয়োজনে এবং শরয়ি কোনো কল্যাণ ছাড়া এমন করাটা কেমন। এটা না শরিয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় না বিবেকের দৃষ্টিতে। রাসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেন–

لَاتُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

"কুফু বা সমতা ছাড়া মেয়েদের বিয়ে দিয়ো না এবং অভিভাবক ছাড়া কেউ তাকে বিয়ে দেবে না।" [দারাকুতনি, বায়হাকি]

এই হাদিসতো আমল করার জন্য। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মেয়ের বিয়ের জন্য অভিভাবককে মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। যদিও আমরা তাকে বিয়ের বৈধতার জন্য শর্ত মনে করি না!

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৫০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের ব্যাপারে স্বচ্ছতা এবং সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে

যেহেতু বিয়ে মানুষের পরস্পরের মধ্যে একটি লেনদেন তাই বর-কনেকে অত্যন্ত সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা আবশ্যক। যাতে কোনো ঝামেলার সুযোগ না থাকে। নিজের চিন্তা যতোটুকু পৌঁছে সে অনুযায়ী প্রত্যেক কথা পরিষ্কার করে দেবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৫০]

প্রতারণা করে অপছন্দের বা অকর্মণ্য মেয়েকে বিয়ে দেয়া

একটা ভুল হলো, কখনো মেয়ে এমন হয় যে ছেলে তাকে পছন্দ করবে না। কিন্তু মেয়ের অভিভাবকগণ প্রতারণা করে কারো সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলো। যেমন, কারো এমন রোগ আছে যা সহবাসে অন্তরায়।

একজায়গায় পাগলের বিয়ে এক অন্ধের সঙ্গে দেয় যে স্বামীকে আহত করে। সে ভেগে যায় এবং সীমাহীন কলঙ্ক হয়। শেষ পর্যন্ত তালাক হয়ে যায়। মহর নিয়ে বিবাদ হয়।

একজায়গায় একমহিলা সম্পূর্ণ বুড়ি ছিলো। চামড়া শ্বেতরোগীদের মতো সাদা ছিলো। পুরুষ যদি শত ধৈর্যধারণ করে, কৃতজ্ঞ হয় বা কোনো চাহিদা না থাকে তবুও তার পুরোটাজীবন পানশে হয়ে যায়। এর থেকে মুক্তি সম্ভব কিন্তু মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। কিছু মানুষ একে ব্যক্তিত্বহীনতা মনে করে। কিছু মানুষের সামর্থ কম তাদের পক্ষে এসবের গুরুত্ব দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যারা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে তারা ধোঁকা এবং কষ্ট দেয়ার অভিশাপ-গোনাহ অবশ্যই কামাবে। অনেক সময় দেখা যায়, দুরাচারী মহিলাকে কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে যখন এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন তারা ধৈর্যের কথা বলে। কিন্তু তারা কখনোই স্বামী হিসেবে এমন মেয়েদেরকে মেনে নেয় না। বরং তাদের জন্য দিনমজুর স্বামী খোঁজে। মুখরা ও উগ্রস্বভাবের স্ত্রী ভদ্রস্বভাবের স্বামীদের জন্য সাক্ষাৎনরক। এমনিভাবে সে অন্ধ হলে, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলে, পেটের পীড়া থাকলে তা গোপন করা উচিত নয়। এসব দোষ গোপন করার ফলাফল সবসময় মন্দই হয়।

যদি স্বামী নিরীহপ্রকৃতির হয় তাহলে তার জীবনটা নষ্ট হয়। আর তার ধৈর্য না থাকলে সে স্ত্রীকে কষ্ট দিতে শুরু করে। স্ত্রী আগ থেকে রোগাক্রান্ত বা সমস্যাগ্রস্থ ছিলো। এখন তার মাত্রা আরো বেড়ে গেলো। উভয়ের মতভিন্নতা বাড়তে বাড়তে তাদের বংশের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। একসময় শত্রুতা তৈরি হয়। একে অপরের নামে মামলা করে। কখনো বিচ্ছেদের চেষ্টা হয়। স্বামী অস্বীকার করে। কখনো মহর দাবি করা হয়। কখনো মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে মহর মাফ দেখানো হয়। কখনো ক্ষমা করে দেয়ার পরও মিথ্যা শপথের মাধ্যমে আদায় করে নেয়া হয়। মোটকথা হাজারো সমস্যা ও সংকট তৈরি হয়। যেসবের মূলে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর অমিল। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৬২]

নপুংসক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া

কিছুমানুষ একটি ভুল করে। তারা খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া এবং নিজেরা বেকার হওয়ার পরও বংশীয় রীতি অনুযায়ী কোনো যুবতীকে বিয়ে করে। আবার নিজের অক্ষমতা হওয়াটাও মেয়ে এবং মেয়ের অভিভাবকদের থেকে গোপন করে। এমন মানুষ অন্যকে বিপদে ফেলে দেয়।

মহিলা যদি চরিত্রবান হয়ে থাকে তাহলে সারা জীবনের জন্য কঠিন জেলে বন্দি হয়ে গেলো। আর যদি চরিত্রহীন হয় তাহলে সে পাপে জড়াবে। দুই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হবে। যা একই সঙ্গে কষ্টদায়ক এবং বিবাদের কারণ। দ্বিতীয়ত উভয়ের জন্য সম্মানহানী এবং উভয়ের বংশের জন্য বদনাম। কিছু মানুষ এমন অবিচার করে– এমন একটি ঘটনা ছড়িয়ে পড়ার পরও অর্থ ও খ্যাতির লোভে আবার এমন মানুষের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেয়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৪]

বিয়ের ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গে হওয়া উচিত

কিছুমানুষ নিজের প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে গোপনে বিয়ে করে। গোপনে বিয়ে করার প্রথম মন্দদিক হলো এটা সরাসরি হাদিসলজ্ঘন। হাদিসে এসেছে–

أَعْلِنُوا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ

"সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের ঘোষণা দাও এবং তা মসজিদে করো।"

যেসব ইমামের মতে ঘোষণা করা বিয়ের শর্ত তাদের কাছে ঘোষণা ছাড়া বিয়েই বৈধ হবে না।

হানাফিমাজহাবে যদিও বিয়ে সঠিক হয়ে যাবে, যখন তার প্রয়োজনীয় সাক্ষী তথা দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা উপস্থিত থাকবে কিন্তু

ইমামদের মতভিন্নতার কারণে বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া এমনটি করা অপছন্দনীয়।

গোপনে বিয়ে করার ক্ষতি

১. যদি গোপনে বিয়ে করার প্রথা চালু হয়ে যায় তাহলে অনেক নারী-পুরুষ গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এরপর মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়ে বা ধরা পড়ে যায় তাহলে তারা খুব সহজে বিয়ের দাবি করে বসবে।

২. সাধারণ মানুষ নিজেরা জানে না বিয়ে সঠিক হওয়ার জন্য সাক্ষীর সর্বনিম্নস্তর বা সংখ্যা কতো। তারা যখন কোনো গোপন বিয়ের সংবাদ শুনবে যার সাক্ষীর সংখ্যা জানা যায় না। তখন অসম্ভব নয় তারা বিশ্বাস করে বসবে বিয়ের জন্য সাক্ষী প্রয়োজন নেই। তারা সুযোগ পেলেই এমন করে বসবে। ফলে বিশ্বাসগত ও কর্মগতভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৫২]

৩. গোপন বিয়ের প্রচলন হলে এমন মহিলার উপর জবরদস্তি হবে যাকে কেউ বিয়ে করার ইচ্ছা রাখে কিন্তু সে রাজি নয়। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক সময় পুরুষলোকটি দু'জন মৃতমানুষের নাম উল্লেখ করে বিয়ের দাবি করতে পারে। বলবে, তাদের সামনে গোপনে বিয়ে হয়েছিলো। দাবির পর দু'-চারজন সহযোগীর সহায়তায় তার ওপর বাড়াবাড়ি করতে পারে। সাধারণ মানুষ এই সন্দেহে কিছু বলবে না যে, বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার অধিকার রয়েছে, আমরা কেনো বিবাদে যাবো?

৪. বিবাহিত মহিলার ব্যাপারে এই দাবি হতে পারে, দ্বিতীয় একজনের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিয়ের আগেই আমাদের সন্তানের সঙ্গে তার গোপনে বিয়ে হয়েছিলো। কেননা আজকাল এমন ঘটনা ঘটে।

সন্দেহ নেই, এসব বিশৃংখলা থেকে বাঁচতে ইসলামিশরিয়ত বিয়ের ঘোষণা দিতে বলেছে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৪]

প্রয়োজনে গোপনে বিয়ে করা

অনেক সময় শরিয়তসমর্থিত অপারগতার কারণে গোপনে বিয়ে করার প্রয়োজন হয়। যেমন, একজন বিধবানারীর অন্যত্র বিয়ে করার প্রয়োজন। এখন ঘোষণা করলে নিজের মূর্খআত্মীয়-স্বজন কর্তৃক বিপদের সম্ভাবনা আছে। অন্যত্র যাওয়ার জন্য যাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ নয় এমন কোনো আত্মীয় নেই। এজন্য সে গোপনে প্রথমে বিয়ে করবে। এরপর স্বামীর সঙ্গে অন্যত্র চলে যাবে। [ইসলাহে ইনকিলাব; পৃষ্ঠাঃ ৫৫]

ছেলেপক্ষ প্রস্তাব দেবে না মেয়েপক্ষ

সাহাবায়েকেরামের মধ্যে কখনো পিতা নিজে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। হজরত হাফসা [রদিয়াল্লাহু আনহা] যখন প্রথম স্বামী থেকে বিধবা হয়ে যান তখন হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] হজরত ওসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলেন, 'হাফসা বিনতে ওমর বিধবা হয়ে গেছে তাকে আপনি বিয়ে করে নিন! সেখানে ভারতবর্ষের রীতি ছিলো না যে, পিতা নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেয়াকে হারাম মনে করবে। হজরত ওসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] বললেন, 'আমি বুঝে উত্তর দেবো।'

তিনি অপারগতা জানালেন। এরপর হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলা হলো, হাফসা বিনতে ওমর বিধবা হয়েছে তাকে আপনি বিয়ে করে নিন। তিনিও বললেন, আমি ভেবে-চিন্তে উত্তর দেবো। তিনি কিছু বললেন না।

এরপর রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রস্তাব আসলো এবং বিয়ে দেয়া হলো। এরপর হজরত আবুবকর [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর পক্ষ থেকে উত্তর এলো। তিনি বললেন, 'আমার উত্তর না দেয়াতে আপনি মনে কষ্ট পেয়েছেন। ভাই! আমি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে হাফসা [রদিয়াল্লাহু আনহা] সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছিলাম। এজন্য উত্তরপ্রদানে চুপ ছিলাম। না পারছিলাম নিজেগ্রহণ করতে না পারছিলাম রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর রহস্য প্রকাশ করতে। স্পষ্ট উত্তর প্রদানে আশংকা ছিলো আপনি যদি আবার গ্রহণ না করেন।' আরবের মানুষ এতো অকৃত্রিম ও ভণিতাহীন ছিলো। পিতা মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিতে লজ্জাবোধ করতো না। বরং মহিলারা এসে আগ্রহ প্রকাশ করতো, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে বিয়ে করে নিন!

একবার হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর মেয়ে লজ্জাশীরতা সম্পর্কে বলেন, হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] তাকে বলেছেন, 'তোমার জন্য উত্তম ছিলো তুমি নিজেকে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর জন্য উৎসর্গ করে দেবে।' এটা আরবে দোষের বিষয় ছিলো না।

আমার উদ্দেশ্য এই নয়, এমনটি করা আবশ্যক বরং কেউ এমন করলে দোষের কিছু নয়। [আজলুল জাহিলিয়্যাহ:পৃষ্ঠা: ২৬১]

বিয়ে কোন বয়সে করা উচিত

অধ্যায় ।৮।
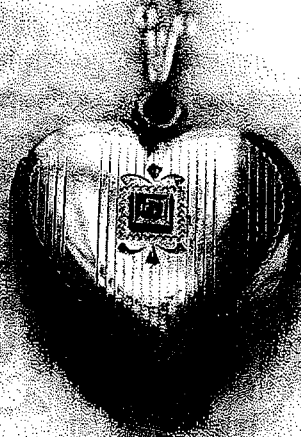
মেয়েদের বিলম্বে বিয়ের ক্ষতি

কিছু অপরিণামদর্শী মানুষ কুমারী মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও কয়েক বছর বসিয়ে রাখে। শুধু আভিজাত্যের খোঁজে তাদের বিয়ে দেয় না। কখনো কখনো ত্রিশ বছর পর্যন্ত আবার কারো চল্লিশ বছর বয়স পার হয়ে যায়। অন্ধ অভিভাবকদের চিন্তায় আসে না তাদের কী পরিণাম হবে। হাদিসে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি এসেছে, এমন অবস্থায় যদি মেয়ের কোনো পদস্খলন হয় তাহলে পিতার উপর সম-পরিমাণ গোনাহ বর্তাবে বা পিতার মতো তার কর্তৃত্বের অধিকারী অভিভাবকের ওপর বর্তাবে। যেমন, ভাই।

কারো যদি হাদিসের হুঁশিয়ারিতে ভয় না হয় তাহলে দুনিয়ার মান-সম্মানের ভয় তো দুনিয়াদারও করে। তখন ভয় থাকে কখন গর্ভবতী হয়ে যায়। কখন কার সঙ্গে পালিয়ে যায়।

যদি কোনো অভিজাত ভদ্রপরিবারে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবুও সেসব মেয়েরা মনে মনে অভিভাবকদের অভিশাপ করতে থাকে। কারণ তারা একধরনের অত্যাচারিত। আর অত্যাচারিতের অভিশাপ বিফলে যায় না।

যৌতুক ও অলঙ্কারের জন্য বিলম্ব

অধিকাংশ সময় দেখা যায়, যে জিনিসের অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করে তা ভাগ্যে জোটে না। অর্থাৎ যৌতুক ও অলঙ্কার। অহংকারের জন্য এই সম্পদও লাভ হয় না। বাধ্য হয়ে হঠাৎ সাদাসিধে বিয়ে করে ফেলে। পরে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে দেরি করলে বদনাম বাড়ে– এতোদিন অপেক্ষা করলে, তা ছাই পেলে না লাকড়ি? দেয়ার যদি এতোই ইচ্ছা থাকে তাহলে বিয়ের পর দিতে কে নিষেধ করেছে? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০-৩৭]

নানা আয়োজনের জন্য বিলম্ব করা

যদি ব্যাপক মেহমানদারির ইচ্ছা থাকে তাহলে মেহমানদারি করার অনেক উপলক্ষ প্রত্যেক সময় পাওয়া যায়। এটা কি এমন ফরজ কাজ যে সব ইচ্ছা এই অভাগার ওপর চর্চা করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ অবিচার। নিন্দনীয় কাজ। হাদিসশরিফে এসেছে, যদি তোমাদের কাছে এমন কোনো প্রস্তাব আসে যার

চরিত্র ও ধার্মিকতা তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। নয়তো পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়বে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩০-৩৭]

উপযুক্ত পরিবার না পাওয়ার অনর্থক আপত্তি

কিছুমানুষ আপত্তি করে, কোনো উপযুক্ত পরিবার থেকে প্রস্তাব আসছে না। কার হাত ধরে তুলে দেবো? এই আপত্তি যদি বাস্তবিক হতো তাহলে ঠিক ছিলো। অর্থাৎ যদি সত্যিকার অর্থে উপযুক্ত পরিবার না পাওয়া যায় তাহলে লোকটি বাস্তবেই অপারগ ছিলো। কিন্তু এই আপত্তিতেই আপত্তি আছে। যতো প্রস্তাব আসে সবই কি অযোগ্য? অযোগ্য হওয়ার একটি ধারণা তারা মাথায় লিপিবদ্ধ করে রাখে। যার ধরনটা নিম্নরূপ–

১. বংশগতভাবে হজরত হোসাইন [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর মতো।

২. স্বভাব-চরিত্রে হজরত জোনায়েদ বাগদাদি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতো।

৩. জ্ঞানে যদি ধর্মীয় হয় তাহলে হজরত আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতো। আর জাগতিক হলে ইবনেসিনার মতো।

৪. সৌন্দর্যে হজরত ইউসুফ [আলায়হিস সালাম]-এর মতো।

৫. সম্পদ ও নেতৃত্বে কারুন ও ফেরাউনের মতো।

বাড়াবাড়ি সব কাজে নিন্দনীয়। একব্যক্তির মধ্যে সবগুণ একত্রিত হওয়া বিরল ও দুষ্প্রাপ্য।

যে গুণগুলো যে পরিমাণ তুমি অন্যের মাঝে খুঁজছো, তোমাকে কন্যা দান করেছিলেন যিনি, যার বদৌলতে তুমি আজ মেয়ের বাবা হয়ে বাহাদুরি দেখাচ্ছো; সে কি তোমার ব্যাপারে এতোটা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছিলেন? যদি এমনটি করতো তাহলে তোমার ভাগ্যে কোনো মেয়ে জুটতো না। তারা এমনটি করেনি। আর তারা যখন এমন করেনি তখন তুমি কিংবা তোমার পিতা অন্যমুসলিম ভাইয়ের ব্যাপারে অনীহা দেখাও। তোমার মধ্যে সব গুণাগুণ পুরোপুরি না থাকার পরও বিয়ে করে তুমি তাদের মেয়েকে হাতে তুলে নিয়েছো। যা নিজের জন্য পছন্দ করো তা অন্যের জন্য কেনো পছন্দ করো না? দ্বিতীয়ত যখন তুমি নিজের জন্য এতো গুণের স্বামী খোঁজো; ইনসাফের সঙ্গে বলো! তোমার ছেলের জন্য যখন মেয়ে খোঁজো বা ইচ্ছা করো তখন কি নিজের ছেলের মধ্যে এতো গুণ খুঁজে পাও, না পেতে চাও?

তৃতীয়ত তুমি যেমন অন্যের মধ্যে অসংখ্য ভালো গুণ খুঁজে পেতে চাও তার দশভাগের একভাগ যদি কেউ তোমার কাছে কামনা করে তাহলে নিশ্চিত তুমি সারাজীবনে একটি মেয়েও বিয়ে দিতে পারবে না।

সারকথা, উপযুক্ত পরিবারের প্রস্তাব আসছে না– আপত্তিটা অধিকাংশ সময় অবাস্তব হয়ে থাকে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩০-৩১]

মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র কম পাওয়ার কারণ

আলোচনা ছিলো মেয়েদের জন্য ভালোপাত্র কম পাওয়া যায়। আমি একবার আমার বংশের মেয়েদের সামনে একথা বলেছিলাম। কারণ, মেয়েদের মাঝে কেবল নারীত্ব দেখা হয়। যার কারণে মনে হয়, ছেলের জন্য মেয়ে যথেষ্ট। আর ছেলেদের মধ্যে হাজারো বিষয় দেখা হয়। সে সুদর্শন হবে, স্বচ্ছলতা থাকবে। শিক্ষিতও হবে, আত্মসম্মানবোধ ও কাজকর্ম থাকতে হবে। আমি বলি, এতো শর্ত যা তোমরা ছেলেদের ব্যাপারে করো যদি মেয়েদের ব্যাপারে করা হয় তাহলে ইনশাল্লাহ! বিয়ের উপযুক্ত একটি মেয়েও বের হবে না। কেননা অধিকাংশ মেয়ে অকর্মণ্য ও অযোগ্য। অর্থাৎ ছেলেরাও অধিকাংশ অযোগ্য এবং মেয়েরাও অধিকাংশ অযোগ্য।

[মালফুজাতে আশরাফিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৮৩; হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৬৩০]

অল্পবয়সে বিয়ে করলে সবলব্যক্তি দুর্বল হয়

এখন যারা সবল তারাও অনেক দুর্বল। এর মূল কারণ মনে হয় এখন খুব অল্পবয়সে বিয়ে করে। অঙ্গসমূহ পুরোপুরি বৃদ্ধি বা শক্ত হতে পারে না। এতো অল্পবয়সে বিয়ের কারণ হয়তো মনের শখ যে, ছোটো ছোটো বর-কনে দেখবে। আবার কোথাও এই ধারণা করে, এমনটি না করলে মারা যাবে। কোথাও বাবা-মায়ের উৎসাহ থাকে না বরং বাচ্চাই পেট থেকে বের হয়ে পাগল হয়ে যায় বিয়ের জন্য। ফলে বাবা-মা তাদের বিয়ে দিতে অপারগ হয়ে যায়।

যা হোক, অল্পবয়সে বিয়ে হয় ফলে বাবা-মা হয় দেখতে ছোটো ছোটো। তাদের বাচ্চাও হয় ছোটো ছোটো। যদি এমনটি হতে থাকে তাহলে যে কথার প্রচলন আছে– কেয়ামতের আগে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সমান মানুষে পৃথিবী আবাদ হবে–অল্পদিনে সত্য হয়ে যাবে।

অতীতকালে মানুষ অনেক শক্তিশালী ছিলো। কারণ তারা বিয়ে করতো শরীর পুরোপুরি বৃদ্ধি বা শরীরের গঠন পূর্ণ হওয়ার পর। অর্থাৎ যখন তাদের দেহে পূর্ণ যৌবন এবং গঠন পূর্ণতা লাভ করতো। এজন্য তারা দীর্ঘজীবনলাভ করতো।

[রুহুস সিয়াম মুলহাকাতে বারাকাতে রমজানঃ পৃষ্ঠাঃ ১৬৯]

অল্পবয়সে বিয়ে করার ক্ষতি

অনেক মানুষ এবং অনেক বংশে একটি ভুল করে তারা খুব অল্পবয়সে বিয়ে করিয়ে দেয়। যখন বর-কনে বলতেও পারে না বিয়ে কাকে বলে এবং বিয়ের কী কী অধিকার বা কর্তব্য আছে। অল্পবয়সে বিয়ে দেয়ার অনেক ক্ষতি আছে। অনেক সময় ছেলে অযোগ্য হয় তখন মেয়ে বড়ো হয়ে বা তার অভিভাবকগণের পছন্দ হয় না। এখন চিন্তা করে পৃথক করে দেবে। কেউ মাসয়ালা জানতে চায় আবার কেউ মাসয়ালা না জেনে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়। ছেলের থাকে চরম গোঁড়ামি। সে না তার অধিকার আদায় করে না তাকে তালাক দেয়। এক উদ্ধাররহিত বিপদে তারা পড়ে যায়।

অনেক সময় অল্পবয়সে বিয়ে হওয়ার পর এমন হয়েছে, মেয়েকে ছেলের পছন্দ হয় না। সে তখন অন্যত্র পাত্রী অনুসন্ধান করে। সে না তার খবর রাখে না তাকে তালাক দেয়। অপারগতা পেশ করে– জানা নেই আমার বিয়ে কবে হয়েছে? যারা বিয়ে করিয়েছে দায়িত্ব তাদের। তালাক দেয়া সামাজিকভাবে লজ্জার মনে করে।

অনেক সময় শিশুকালে তারা একসঙ্গে খেলাধুলা করে, ঝগড়া করে। যার ফলে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ তৈরি হয়। আর যেহেতু প্রথম থেকে একসঙ্গে আছে তাই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশেষ কোনো আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নতুন স্ত্রীলাভ করলে যেমনটা হয়। অল্পবয়সে বিয়ের ফলাফল সার্বিকভাবে মন্দই মন্দ। এসব ক্ষতি ও অমঙ্গল থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৩-৪৪]

ছাত্রজীবনে বিয়ে করা উচিত নয়

একব্যক্তি নিজের ছেলের বিয়ের ব্যাপারে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর সঙ্গে পরামর্শ করে। ছেলে পড়ালেখায় ব্যস্ত ছিলো। লোকটি এটাও বলেছিলো, উত্তমপ্রস্তাব এসেছে। হজরত বলেন, আমাদের মাজহাব হলো, যদি মুসলমান হয় তাহলে ঠিকই আছে। ছেলেরও একজন স্ত্রী চাই। কিন্তু এখন তার পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাবে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪০৪]

অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে করা উচিত নয়

আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

"তোমরা এতিমদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে।"

এই আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, বিয়ের জন্য উপযুক্ত সময় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরবর্তী সময়। সহজপথ হলো, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এবং উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করার পর বিয়ে করবে। যাতে যার বিয়ে সে যেনো বুঝতে পারে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৫ ও ৪৪]

কতো বছর বয়সে ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়

মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কোনো বয়স নেই। তবে তারা নয় বছরের আগে প্রাপ্তবয়স্ক হয় না এবং পনেরো বছরের পর অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে না। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার ন্যূনতম বয়স নয় বছর। যখন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যাবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ হলো ঋতুস্রাব ইত্যাদি। সর্বোচ্চসীমা পনেরো বছর। এরপর লক্ষণ না পাওয়া গেলেও প্রাপ্তবয়স্ক বলে ফতোয়া দেয়া হবে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২১৮]

প্রয়োজনে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে করা

যদি বর-কনে অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং ভালোপ্রস্তাব ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে অল্পবয়সে বিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু যদি তেমন কোনো প্রয়োজন না থাকে, নিছক প্রথাগত কারণে হয় তাহলে এমন প্রথা মিটিয়ে ফেলার যোগ্য। হ্যাঁ, তবে বিয়ে সঠিক হয়ে যাবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৫]

অল্পবয়সে বিয়ে বৈধ হওয়ার প্রমাণ

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে অপ্রাপ্তবয়সে হয়েছিলো। মুসলিমশরিফে হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] নিজে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে বিয়ে করেছিলেন যখন তাঁর বয়স ছিলো সাত বছর। বাসর হয়েছিলো নয় বছর বয়সে। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ইন্তেকাল হয় যখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৬৭]

বর্তমানে দ্রুত বিয়ে দেয়া উচিত

বর্তমান সময়ে দ্রুত বিয়ে দেয়া উচিত। কারণ, এখন আর আগের যুগের মতো মানুষের মধ্যে পবিত্রতা ও ধর্মপরায়ণতা নেই। এখন বেশি ধরে থাকার সাহস হয় না। কিন্তু দ্রুত বিয়েতে যেমন উপকার আছে তেমন কিছু অপকারও আছে।

[আজলুল জাহিলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ৩৬৯]

দ্রুত বিয়ের বিধান

প্রসিদ্ধহাদিস–

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُؤًا

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "হে আলি! তিনটি কাজে বিলম্ব করবে না। নামাজ যখন তার সময় হয়ে যায়। জানাজার নামাজ যখন লাশ উপস্থিত হয়। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে যখন উপযুক্ত ঘর পাওয়া যায়।" [তিরমিজি]

এ হাদিসে দ্রুত বিয়ে করার আবশ্যিকতাকে নামাজের সমপর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৬৮]

ছেলে-মেয়ের বিয়ে কোন বয়সে দেয়া উচিত

আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

"তোমরা এতিমদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে যতোক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে।"

ওপর্যুক্ত আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে বিয়ের উপযুক্ত সময় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর। সহজপথ হলো, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এবং উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করার পর বিয়ে করবে। তার আগে নয়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪]

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ের সময় তার বয়স ছিলো সাড়ে পনেরো বছর। হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বয়স ছিলো একুশ বছর।

[ইসলাহে রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯০]

খুবঅল্পবয়সে বিয়ে দিলে অনেক ক্ষতি আছে। উত্তম হলো, ছেলে যখন উপার্জন করতে পারবে এবং যখন সংসার পরিচালনার দায়িত্বপালনে সক্ষম হবে তখন বিয়ে দেয়া। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৬৩]

বাবা-মায়ের দায়িত্ব

হজরত আবুসায়িদ ও আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'যার সন্তান হবে তার দায়িত্ব হলো নাম রাখা এবং উত্তমশিক্ষায় শিক্ষিত করা। যখন সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন তাদের

বিয়ে দেয়া। যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাকে বিয়ে না দেয় এবং সে কোনো পাপে লিপ্ত হয় তাহলে তার গোনাহ্ কেবল বাবা-মায়ের উপর বর্তাবে [কারণ হওয়ার জন্য]। হ্যাঁ, মূল গোনাহ্ তারও হবে।

হজরত ওমর ও আনাস ইবনে মালেক [রদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'তাওরাতে লেখা আছে, যখন মেয়ের বয়স বারো হয় [এবং বিভিন্ন লক্ষণে বিয়ের প্রয়োজন বুঝে আসে] তখন যদি তাকে বিয়ে না দেয় এবং মেয়ে কোনো পাপে লিপ্ত হয় তাহলে তার গোনাহ্ পিতার ওপর বর্তাবে।' [ইমদাদুল ফতোয়া: পৃষ্ঠা: ২৬৪]

দুই ছেলে বা দুই মেয়ের বিয়ে একসঙ্গে দেয়া উচিত নয়

নিজের দুই ছেলের বিয়ে বা দুই মেয়ের বিয়ে যথাসম্ভব একসঙ্গে দেবে না। কেননা স্ত্রীদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হবে। স্বামীদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হবে। স্বয়ং ছেলে-মেয়ের চেহারা-গঠন, পোশাক-আশাকের স্টাইল, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, লাজ-শরম ইত্যাদিতে অবশ্যই পার্থক্য হবে। এছাড়া আরো অনেক বিষয় মুখে মুখে পার্থক্য হয়ে যায়। কোনোটা বাড়ানোর দ্বারা কোনোটা কমানোর দ্বারা। এতে চান না চান দ্বিতীয়জনের মন খারাপ হয়ে যাবেই।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৯]

অধ্যায় । ৯ ।

বাগদান ও তারিখ নির্ধারণ
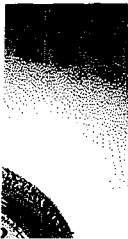
প্রথম পরিচ্ছেদ

বাগদানের মূলকথা

প্রকৃতপক্ষে বাগদান হচ্ছে একটি মৌখিক অঙ্গীকার। এর সঙ্গে মিষ্টি-মিঠাই ইত্যাদির কী প্রয়োজন? যদি পত্রযোগে এই অঙ্গীকার করা হয় তাহলেই যথেষ্ট। এর বাইরে অতিরিক্ত যে আনুষ্ঠানিকতা করা হবে তা বাহুল্য ও অনর্থক হবে।

[হুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৫১]

আজকাল বাগদানে যেসব হুল্লোড় হয় তা বাহুল্য ও সুন্নতবিরোধী। মৌখিক প্রস্তাব ও উত্তরই যথেষ্ট। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৯০]

বাগদান উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতির শরয়িবিধান

আজকাল বাগদান অনুষ্ঠানে পুরুষ আত্মীয়দের উপস্থিতি আবশ্যক হয়ে গেছে। বর্ষা বা অন্যকিছু হোক চিঠির ওপর ক্ষান্ত করা সম্ভব নয়। পাঠক! যে জিনিস শরিয়ত আবশ্যক করেনি তাকে শরিয়ত আবশ্যক করেছে এমন জিনিসের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়– ইনসাফের সঙ্গে বলুন, এতে শরিয়তের বিরোধিতা হয় কী-না? আর যখন তা শরিয়তবিরোধী হলো তা পরিহার করা আবশ্যক কী-না?

যদি বলা হয়, পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়। তাহলে তা ভুল। তারা নিজেরাই জিজ্ঞেস করে, তারিখ কী লেখা হবে? যা বিশেষ পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। সেটা বলা হয় এবং লেখা হয়। অধিকাংশ মানুষ নিজে আসতে পারে না। তাদের ছোটো ছোটো সন্তানদের পাঠায়। তারা পরামর্শে কি মতামত দেবে? কোনো মতামত দেয় না। মনগড়া কথা, সহজ কথা কেনো বলো না– এমনটি কুসংস্কার হয়ে আসছে। এমন প্রথা বিবেক ও শরিয়তের আলোকে নিন্দনীয়। পরিহার করা আবশ্যক। কেননা এই প্রথার কিছু বিষয় শরিয়তবিরোধী। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৩]

যদি পরামর্শ করতে হয় তাহলে অন্যান্য কাজে যেভাবে পরামর্শ করা হয় সেভাবে করবে। এক-দুইজন বুদ্ধিমান কল্যাণকামী ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নিলেই যথেষ্ট। মানুষের ঘরে ঘরে করাঘাত করার কী দরকার।

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৩]

বাগদান দ্বারা কথা চূড়ান্ত হয় না

মানুষ বলে বাগদান দ্বারা বিয়ে চূড়ান্ত হয়ে যায়। আমি অনেক দুর্বলবিষয় জোড়া লাগতে এবং অনেক দৃঢ়বিষয় ভেঙ্গে যেতে নিজ চোখে দেখেছি। একারণে আমি বলি, এটা ইবলিসিধারণা যে, সমস্ত বিষয় মজবুত হয়ে যায়। এটা পুরনো বিষয় যে, বাগদান দ্বারা বিয়ের অঙ্গীকার দৃঢ় হয়।

আমি বলি, অঙ্গীকার ঠিক আছে তার এককথাই যথেষ্ট। যার অঙ্গীকার ঠিক নেই সে বাগদান করেও তার বিপরীত করে। কেউ কি কামান নিয়ে বসে আছে? অনেক জায়গায় দেখা যায়, অন্যকোনো লাভ দেখে বা লোভে পড়ে বাগদান ভেঙ্গে দেয়। তখন সেই দৃঢ় অঙ্গীকার কী কাজে আসে এবং যা কিছু খরচ করলো তা-ও বা কী উপকার করে? সুতরাং ওপর্যুক্ত ধারণা ঠিক নয়, ধোঁকামাত্র।

বাগদানে দৃঢ়তা আসলেও আমাদের তা-ই করা উচিত যা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] করেছেন। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৬২ ও ৪৫১]

বাগদান প্রথা : রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর দৃষ্টান্ত

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে কোনোধরনের প্রথা ও কুসংস্কার ছাড়াই দিয়েছেন। তখন এসব প্রথাও ছিলো না। পরবর্তী লোকেরা তা সৃষ্টি করেছে।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে দিয়েছেন, সেখানে না ছিলো বাগদান, না ছিলো মেহেদি, না ছিলো তার কোনো স্মারক। বিয়ের বাগদান ছিলো, হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর বৈঠকে এসে চুপ করে বসে ছিলেন। লজ্জায় কথা বলতে পারছিলেন না। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি, তুমি ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছো। জিবরাইল [আলায়হিস সালাম] বলে গেছেন।'

আল্লাহর হুকুম হলো, ফাতেমার বিয়ে আলির সঙ্গে দেয়া হবে। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] রাজি হলেন, ব্যস, বাগদান হয়ে গেলো। সেখানে মিষ্টিমুখ হয়নি। কোনো বৈঠকও হয়নি যে লাল সূতা দিয়ে সাজানো হবে, কোনো কাপড় হবে, মিষ্টি বিতরণ হবে। [হুকুকুল জাওজাইন]

বাগদানের জন্য আগত মানুষের আতিথেয়তার বিধান

প্রশ্ন : যেসব লোক দূর-দূরান্ত থেকে মেয়ের বাগদানের জন্য আসে, এক-আধবার তাদেরকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দিলে পরস্পর সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে এমন আশায় তাদের মেহমানদারি করলে কোনো সমস্যা আছে কী?

উত্তর : ওপর্যুক্ত নিয়তে [মেহমানদারি করা] বাগদানের পূর্বাপর সব অবস্থায় ঠিক আছে। [ইমদাদুল ফতোয়া; খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪০৪]

ঘটকালি করে টাকা নেয়ার বিধান

প্রশ্ন : সম্পর্ক করিয়ে টাকা নেয়া বা প্রথম থেকে কোনো কিছু নির্ধারণ করে রাখা যেমন, নির্ধারিত পরিমাণ নগদ টাকা, একজোড়া লুঙ্গি ইত্যাদি বিনিময় করার শরয়ি বিধান কী? সমস্যা আছে কি নেই?

উত্তর : যদি চেষ্টার উপায় না থাকে বা তা সহজসাধ্য না হয় এবং চেষ্টায় কোনো প্রতারণা না থাকে তাহলে উক্ত পারিশ্রমিক যাতায়াত খরচ হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ হবে। নয়তো বৈধ হবে না।

وَإِلَّا فَلَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَلَا عَلَى الْخِدَاعِ

"শুধু সুপারিশ করে এবং ধোঁকা দিয়ে কোনো বিনিময়গ্রহণ করা বৈধ নয়।" ইসলামিশরিয়তের দৃষ্টিতে সুপারিশ করা কোনো মূল্যমান কাজ বা বস্তু নয়। এর বিনিময়গ্রহণ করা নাজায়েজ।

لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ تَقَوُّمَهُ وَأَيْضًا فَلَا تَعَبَ فِي الشَّفَاعَةِ وَلَا يُعْطَوْنَ الْأَجْرَ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَمَلٌ فِيْهِ مَشَقَّةٌ بَلْ مِنْ أَنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ بِالْوَجَاهَةِ وَالْوَجَاهَةُ وَصْفٌ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فَجَعَلُوْا أَخْذَ الْأَجْرِ عَلَيْهَا رِشْوَةً وَسُحْتًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

"কেননা সুপারিশ মূল্যমান হওয়া শরিয়ত কর্তৃক বর্ণিত নয়। সুতরাং তার মূল্য ওয়াজিব হবে না। কষ্টসাধ্য কাজ হিসেবে তার কোনো বিনিময় দেয়া হবে না। বরং সুপারিশ হলো ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে কাউকে প্রভাবিত করা। ব্যক্তিত্ব কোনো মূল্যমান গুণ নয়। ফলে তার বিনিময়গ্রহণ করাকে ফিকাহবিদগণ ঘুষ ও অবৈধ আখ্যায়িত করেছেন।" [ইমদাদুল ফাতাওয়া: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪৩২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা

আমরা বিয়ের উপলক্ষকে উৎসবের উপাদান মনে করি। বিয়ের জন্য ভালোদিন খুঁজি। পঞ্জিকা থেকে শুভক্ষণ তালাশ করি। পাগলামির সময় মনে থাকে না এটা জায়েজ না-কি নাজায়েজ।

জ্যোতিষ ও পণ্ডিতদেরকে জিজ্ঞেস করে বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়। যেনো অপবিত্র সময়ে বিয়ে না হয়। খবরও নেই অলক্ষুণে মুহূর্ত কোনটি। প্রকৃত অলক্ষুণে মুহূর্ত সেটিই যখন আল্লাহ থেকে মানুষ বিমুখ থাকে। যখন তুমি নামাজ ছেড়ে দেবে তার থেকে বেশি অপবিত্র সময় কোনটি হতে পারে? আর যে কারণে নামাজ ছেড়ে দিলে তার চেয়ে বেশি কলুষিত কাজ কী হতে পারে?

কিছু মানুষ কিছু তারিখ ও মাস যথা মহররম মাসকে এবং কিছু বছর যেমন আঠারো বছরকে অমঙ্গলকর মনে করে। সেসব মাসে বিয়ে করে না। এমন বিশ্বাস ও যুক্তিও শরিয়তে অগাহ্য। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮৪]

মূলত এটা জ্যোতিষবিদ্যার অন্তর্গত। আর জ্যোতিষবিদ্যা ইসলামিশরিয়তে নিন্দিত। সম্পূর্ণভ্রান্ত। নক্ষত্রের মাঝে মঙ্গল-অমঙ্গল থাকা অগ্রহণযোগ্য। যদিও জ্যোতিষবিদদের কিছু কথা বাস্তব হয়ে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার দাবি হলো, তাদের কথা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অবাস্তব ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

তাছাড়াও তাতে অনেক ভ্রান্তি ও অকল্যাণ রয়েছে। ভ্রান্তবিশ্বাস, প্রকাশ্য শিরক, আল্লাহর ওপর আস্থাহীনতা ইত্যাদি।

[বয়ানুল কোরআনঃ সুরাঃ সফফা, পৃষ্ঠাঃ ১৩০]

জিলকদ মাসকে অমঙ্গল মনে করা কঠিন ভুল

বিয়ের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মানুষ জিলকদ মাসকে বিয়ের জন্য অকল্যাণকর মনে করে। এটা অত্যন্ত কঠিন কথা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের শামিল। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] চারটি উমরা করেছেন, সবগুলো জিলকদ মাসে। শুধু যে ওমরা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বিদায় হজের সঙ্গে করেন তা জিলহজ মাসে ছিলো। এর দ্বারা কতোটা বরকত প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়াসাল্লাম] তিনটি ওমরা করেছেন জিলকদ মাসে। তাছাড়া জিলকদ মাস হজের মাসের অন্যতম। হজের মাসগুলো রহমত ও বরকতের মাস।

[আহকামে হজ মোলহাকায়ে সুন্নাতে ইবরাহিম: পৃষ্ঠা: ৪৮৩]

জিলকদ, মহররম ও সফর মাসে বিয়ে করা

মূর্খমহিলারা জিলকদ মাসকে 'খালি চান্দ' বা বরকতশূন্য মাস মনে করে। তাতে বিয়ে করাকে অমঙ্গল মনে করে। এমন বিশ্বাস করা গোনাহ। এমন বিশ্বাস থেকে তওবা করা উচিত। অনেক জায়গায় সফর মাসের তেরো তারিখকে অকল্যাণকর মনে করে। এমনসব বিশ্বাস শরিয়তবিরোধী। এর থেকে তওবা করা উচিত। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৯]

মহররম মাসে বিয়ে-শাদি

মহররম মাস বিপদের সময় হিসেবে বিখ্যাত। কারণ, সাইয়েদুনা হোসাইন [রদিয়াল্লাহু আনহু] এর শাহাদৎবরণের ঘটনা। যা একটি আকস্মিক দুঃখজনক দুর্ঘটনা। কিন্তু আমরা মূর্খতাবশত সীমালঙ্ঘন করি। যার কারণে মানুষ মহররম মাসে বিয়ে করাকে অপছন্দ ও মাকরুহ মনে করে।

আমার একআত্মীয়ের বিয়ে জিলকদ মাসের ত্রিশ তারিখে ঠিক করা হয়। যাতে মহররম মাসে বাসর রাত হওয়া নিশ্চিত ছিলো। তবে এই সম্ভাবনা ছিলো যে, কোথাও তা মহররমের এক তারিখ হবে। এতে মেয়ে অভিভাবক অনেক অসন্তুষ্ট হন। বিয়ের তারিখের জন্য এতো ভালোদিন ছিলো! তবু সে এতোটুকু দয়া করেছিলো যে, নিজে বিয়েতে উপস্থিত না হলেও বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলো। নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের থেকে মামাকে পাঠিয়েছিলো। আমি বললাম, এই বিশ্বাস ভাঙ্গা উচিত। এই দিন বিয়ে করেছে কিন্তু কয়েক বছর মেয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যেনো অনভিপ্রেত কোনো বিষয় না ঘটে। যদি মেয়ের সামান্য কানও গরম হয় তাহলে অভিভাবক বলবে অমুক দিনে বিয়ে করার কুফল। কিন্তু আল্লাহর রহমত কোনো অপ্রীতিকর বিষয় হয়নি। স্বামী-স্ত্রী দুইজনই খুব সুখে-শান্তিতে আছে। তাদের সন্তানও হয়েছে। আল্লাহ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণা ভুল। কোরআন-হাদিসে বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট আছে, মঙ্গল-অমঙ্গল কোনো সময় ইত্যাদির কারণে নয়। কোনোদিনও অকল্যাণকর নয়। কোনো মাসও অকল্যাণকর নয়। কোনো স্থানও অকল্যাণকর নয়। এমন কি কোনো মানুষও হতভাগা নয়। মূলত অকল্যাণ হলো পাপ ও পাপাচের লিপ্ত হওয়া।

[হাকিকাতুস সবর মুলহাকায়ে ফাজায়েলে সবর ও শুকর, আততাবলিগ: খণ্ড: ১২]

কোনোদিন অকল্যাণকর নয়

কিছুশিক্ষিত মানুষ দিনের মধ্যে অকল্যাণ থাকার ব্যাপারে কোরআনের এই আয়াত প্রমাণ হিসেবে পেশ করে–

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ

"আমি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু অভিশপ্ত দিনগুলোতে।"

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যেদিনগুলোতে আদজাতির ওপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিলো তা অভিশপ্ত ছিলো। কিন্তু বলি সেদিন কোন কোন দিন ছিলো? এটা দ্বিতীয় আয়াত থেকে জানা যাবে। বর্ণিত হচ্ছে–

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ - سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا-

"আর আদজাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো প্রচণ্ড একঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। যা তিনি তাদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন অবিরাম সাত রাত ও সাত দিন।'

[সুরা: হাক্কা, আয়াত: ৬-৭]

তাদের ওপর আটদিন পর্যন্ত শাস্তি অবতীর্ণ হয়। এই হিসেবে কোনোদিনই বরকতপূর্ণ নয়। বরং প্রত্যেকদিন অভিশপ্ত। কেননা সপ্তাহের প্রতিদিন তারা শাস্তি পেয়েছিলো। যাকে কোরআনে অভিশপ্ত দিনসমূহ বলা হয়েছে। কেউ কি একথা দাবি করবে? এখন আয়াতের সঠিক অর্থ জেনে নিন। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যেদিনগুলোতে তাদের ওপর শাস্তি এসেছিলো সেদিনগুলো শাস্তি আসার কারণে বিশেষভাবে অভিশপ্ত ছিলো। সবদিন নয়। সেশাস্তির কারণ ছিলো গোনাহ। সুতরাং অভিশাপের মূল ভিত্তি হলো গোনাহ। এখন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সন্দেহ থাকলো না।

[তাফসিলুত তওবা, দাওয়াতে আবদিয়্যাঃ খণ্ডঃ ৪১, পৃষ্ঠাঃ ৪১]

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় বিয়ে

এককথা প্রচলিত আছে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় অলক্ষী হয়। এই সময় যথাসম্ভব বিয়ে-শাদি না করা উচিত। হায়দারাবাদে আমার ভাতিজি বিয়ে দিতে যাই। যেদিন বিয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয় ওইদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়। তখন সেখানের মানুষ ব্যাকুল হয়ে পড়ে– এমন সময় কী বিয়ে হবে? যদি এমন সময় বিয়ে হয় তাহলে সাড়া জীবন অকল্যাণের প্রভাব থেকে যাবে। অনেক আধুনিক শিক্ষিত মানুষও সন্দেহে পড়ে যায়। অবশেষে একত্রে আমার কাছে এলো।

বললো, কিছু বলতে চাই। আমি বললাম, বলুন। তারা জিজ্ঞেস করলো, চন্দ্রগ্রহণের সময় বিয়ে হবে?

আমি বললাম, এমন সময় বিয়ে করা অনেক উত্তম। আমার কাছে এর প্রমাণ আছে। আপনারা জানেন আমরা ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর অনুসারী। আর এটাও জানেন চন্দ্রগ্রহণের সময় আল্লাহর জিকির ও নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা চাই। ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, বিয়েতে লিপ্ত হওয়া নফল ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়। সুতরাং এমন সময় বিয়েতে লিপ্ত হওয়া অনেক উত্তম। তারা সবাই বিষয়টি মেনে নেয়।

আমি তাদেরকে বলে দেই কিন্তু তাদের ধারণার কারণে আমার মন সংকীর্ণ হয়ে থাকে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ! চাঁদ তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যাক। যদি এমন সময় বিয়ে হয় এবং এরপর কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তারা বলার সুযোগ পাবে এমন সময় বিয়ে করার কারণে এমনটি হলো। আল্লাহর কুদরত! অল্প সময়ের মধ্যে চাঁদ পরিষ্কার হয়ে গেলো। সবাই খুশি হলো। বিয়ে হয়ে গেলো। [আততাহজিব; ফাজায়েলে সওম ও সালাতঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৫২]

বিয়ে পড়ানো ও অন্যান্য আয়োজন

অধ্যায় । ১০ ।

বিয়ের মজলিস ও বিশেষ জমায়েত

যখন হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে সম্পন্ন হয় তখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "আনাস! যাও আবুবকর, ওমর, ওসমান, জোবায়ের এবং আনসারদের একটি দলকে ডাকো।"

এর দ্বারা বোঝা যায়, বিয়ের অনুষ্ঠানে নিজের বিশেষজনদের ডাকাতে কোনো সমস্যা নেই। তার লাভ বা রহস্য হলো, বিয়ের প্রচার ও ঘোষণা হবে। যা কাম্য। কিন্তু এই জমায়েতে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কোনো কৃত্রিমতা ছাড়া সময়ে দু'-চারজন নিকটাত্মীয়কে একত্রিত করা হবে। এটাই যথেষ্ট।

একটি ঘটনা

আমার একবন্ধু তার মেয়ের অনুষ্ঠান করছিলো। মাশাল্লাহ! তিনি সবকিছু অত্যন্ত ধার্মিকতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করেন। সাহস করে সবপ্রথা পরিহার করেন। কোনো কিছু ভ্রুক্ষেপ করেন না। তিনি আমার কাছে আসেন এবং আমাকে বিয়ে পড়ানোর জন্য বাড়ি নিতে চান। আমি কিছু আপত্তি করি। তিনি সফর অবস্থায় কাজ সমাধা করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় এই বৈঠকে বিয়ে সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে দুইটি কল্যাণ।

এক. তার ঘর সুন্নতের বরকতে ভরে উঠবে এবং

দুই. একথা জানা যাবে যে, বিয়ে এখানেও হতে পারে। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় বিয়ে অত্যন্ত সাদা-সিধে বিষয়। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৪৭]

বিয়ে কে পড়াবে

১. হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়েতে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] একটি দীর্ঘ খুতবা পাঠ করে প্রস্তাব ও সম্মতিপ্রদান করেন। এর দ্বারা জানা যায়, পিতার গোপনে গোপনে বা অপরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পড়া সুন্নতবিরোধী। বরং উত্তম হলো, পিতা নিজেই মেয়ের বিয়ে পড়াবে। কেননা তিনি অভিভাবক। অন্য যে পড়াবে সে উকিল বা প্রতিনিধি। আর অভিভাবক ও উকিলের মাঝে অভিভাবক প্রধান্য পায়। এটাই রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সুন্নত। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৯১]

২. এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, যিনি বিয়ে পড়াবেন তিনি আলেম হবেন। বা কোনো আলেমের কাছে থেকে ভালোভাবে জেনে নিয়ে বিয়ে পড়াবেন। অধিকাংশ সময় কাজিগণ বিয়ে ও তার আনুষঙ্গিক মাসয়ালা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। কিছুক্ষেত্রে নিশ্চিত, বিয়েই শুদ্ধ হয় না। সারাজীবন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। কিছু ক্ষেত্রে লোভে পড়ে যায়। লোভে পড়ে যেমন বলে তেমনভাবে বিয়ে পড়িয়ে দেয়। বিয়ে হোক বা না হোক। [ইসলাহুর রুসুম; পৃষ্ঠা: ৬৭]

বিয়ে পড়ানোর জন্য লোক ঠিক করার মাসয়ালা

অন্যান্য খরচের মতো যেমন, বাচ্চার শিক্ষা, শিল্প ও পেশার মতো যার মনে চাইবে যাকে ইচ্ছা ডাকবে। কাউকে নির্দিষ্ট করবে না। যার ওপর উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট থাকবে। কোনো কাজি নিজেকে প্রকৃত দাবিদার ভাববে না। কেউ এমনটি ভাববে না, এটা কাজি সাহেবের অধিকার। ঘটনাক্রমে কেউ যদি কাজ করতে থাকে তাহলে তাকে কষ্টে দেয়া যাবে না। শহরে যতোজনের খুশি বিয়ে পড়াবে। সবাই স্বাধীন। যে খুশি সে দেবে। কাউকে নির্দিষ্ট করবে না। কেউ যদি যোগ্য না হয় তাহলে এই কাজ করা তার জন্য বৈধ হবে না। তাকে সমস্যার কারণে বাধা দেয়া হবে।

এমনিভাবে যে বিয়ে পড়ানোর জন্য ডাকবে সে পারিশ্রমিক দেবে। বরকে নির্দিষ্ট করবে না। দিলে অবশ্য বৈধ হবে। উদ্দেশ্য হলো, অন্যান্য কাজে ডাকা আর বিয়ের জন্য ডাকার মাঝে পার্থক্য নেই।

[ইমাদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৭৪]

বিয়ে পড়িয়ে টাকা নেয়ার অবৈধ অবস্থাসমূহ

১. যদি ছেলেপক্ষ টাকা দেয় এবং মেয়েপক্ষ কাজি ডাকে, যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে- তাহলে টাকা নেয়া সম্পূর্ণ অবৈধ হবে। যে ডাকবে তার ওপর পারিশ্রমিক দেয়া ওয়াজিব। অন্যের ওপর চাপানো না জায়েজ।

[ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৭৮]

২. অধিকাংশ সময় কাজি নিজের প্রতিনিধি পাঠান। যার সামান্য অংশ থাকে। বেশির ভাগ পায় কাজি। কাজির এই অর্থ দাবির কোনো দলিল নেই। এটার জন্য চেষ্টা– দাবি করা নাজায়েজ। যদি বিয়ের লোকেরা খুশি হয়ে কিছু দেয় তাহলে নেয়া জায়েজ। নয়তো যাকে দেয়া হয়েছে সে-ই তার মালিক হবে। তবে প্রতিনিধি যদি খুশি হয়ে দেয় তাহলে পুরোটা নিতে পারবে। কিন্তু কাজি শুধু এই জন্য দেয় যে, আমি তোমাকে নিয়োগ দিয়েছি। এভাবে নেয়া ঘুষ ও হারাম। ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহিতা অর্থাৎ কাজি ও তার প্রতিনিধি উভয়ে গোনাহগার।

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬৮]

৩. যদি অন্যকেউ বিয়ে পড়ায় তাহলে কাজি বা তার প্রতিনিধির জন্য অর্থগ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। কাজি দিয়ে বিয়ে পড়ানো ওয়াজিব নয়।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৭৮]

যখন মেয়েপক্ষ কাজি ডাকে তখন ছেলেপক্ষের কাছ থেকে বিয়ে পড়ানোর মজুরি দেয়া বা নেয়া হারাম। [হুসনুল আজিজ]

যখন কাজিকে ছেলেপক্ষ ডাকে, চাই নিজের লোকদের মাধ্যমে হোক বা মেয়েপক্ষের লোকদের মাধ্যমে ডাকা হোক। তখন তাদের প্রদেয় পারিশ্রমিক কাজির নেয়া জায়েজ আছে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৮১]

বিয়ে পড়ানোর পারিশ্রমিক যা সবসময় ছেলেপক্ষ দেয়–তারা কাজিকে ডাকুক বা না ডাকুক তা ঘুষের শামিল। বিয়ে পড়ানোর পারিশ্রমিক দেয়া মূলত জায়েজ। কিন্তু কথা হলো, কে দেবে? শরিয়তের দৃষ্টিতে পারিশ্রমিক সে-ই দেবে যে কাজিকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। আর এটা সাধারণত মেয়েপক্ষই হয়। [আততাহজিব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৩]

বিয়ে পড়ানোর জন্য যা যা জানা আবশ্যক

এখন বিয়েসংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় মাসয়ালা উল্লেখ করছি। যা সবার বিশেষ করে বিয়ে পড়ানো কাজিদের জানা থাকা আবশ্যক। এসব মাসয়ালা না জানার কারণে অধিকাংশ সময় বিয়েতে অকল্যাণ হয়।

১. অভিভাবক প্রথমে বাবা, তারপর দাদা তারপর আপন ভাই, তারপর বৈমাত্রীয় ভাই, তারপর মহিলার সন্তানগণ। এই ধারাবাহিকতায় তাদের চাচা, তারপর বৈমাত্রীয় চাচা, তারপর চাচাতো ভাই। এই ধারাবাহিকতা এবং মিরাসলাভের ক্ষেত্রে আসাবাদের [যারা কোরআনে বর্ণিত ওয়ারিশদের পর অবশিষ্ট সম্পদ লাভ করে] ধারাবাহিকতা অনুযায়ী হবে। যখন কোনো 'আসাবা' থাকবে না তখন মা, এরপর দাদী, তারপর ফুফু, তারপর নিজের বোন, তারপর বৈপিত্রীয় বোন ও ভাই, তাদের পর মামা, তারপর খালা, তারপর চাচাতো বোন, এরপর চতুর্থ স্তরের ওয়ারিশগণ।

২. নিকটাত্মীয় থাকতে দূরের আত্মীয় বিয়ে দিতে পারে না।

৩. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। মেয়ে নিজেও বলার অধিকার রাখে না। চাই তার প্রথম বিয়ে হোক বা দ্বিতীয় বিয়ে হোক।

৪. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে যদি অভিভাবক অনুপোযুক্ত স্থানে দেয় তখন অভিভাবক পিতা বা দাদা হলে এবং তারা কোনো কল্যাণের কথা চিন্তা করে

দিলে শুদ্ধ হয়ে যাবে। শর্ত হলো, অন্যকোনো বিষয় কল্যাণকর বলে প্রকাশ পেতে পারবে না। নয়তো বিয়ে শুদ্ধ হবে না। পিতা-দাদা ছাড়া অন্যকেউ হলে ফতোয়া হলো, বিয়ে সম্পূর্ণ নাজায়েজ হবে।

৫. প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া শুদ্ধ হবে না। যদি তার দ্বিতীয় বিয়ে হয় তাহলে মুখে অনুমতি নিতে হবে। আর প্রথম বিয়ে হলে এবং অভিভাবক অনুমতি নিলে তার চুপ হয়ে যাওয়াটাই অনুমতি। অন্যকেউ নিলে মুখে বলা আবশ্যক। মুখে বলা ছাড়া অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬. প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যদি অভিভাবকের অনুমতি কুফু বা সমতার মধ্যে নিজে নিজে বিয়ে করে তাহলে জায়েজ। যদি সমতা ছাড়া করে তবে ফতোয়া হলো, বিয়ে সম্পূর্ণ নাজায়েজ। যদি কোনো মেয়ের অভিভাবক না থাকে অথবা অভিভাবক থাকে তবে সে কুফু ছাড়া বিয়েতে সম্মত হয় তাহলে বিয়ে বৈধ।

৭. অভিভাবক যদি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া দেয় এবং সে তা শুনে চুপ থাকে তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি অভিভাবক ছাড়া অন্যকেউ প্রাথমিক অনুমতি নিয়ে ছিলো কিন্তু সে চুপ ছিলো তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কিন্তু স্বামীকে সঙ্গ দেয়ার সময় সে যদি অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৮. প্রস্তাব ও কবুল তথা গ্রহণের শব্দাবলি এতোটা উঁচুআওয়াজে বলবে যাতে সাক্ষী তা ভালোভাবে শুনতে পারে।

৯. বিয়ের আগে এটাও খোঁজ নেয়া আবশ্যক যে, ছেলে-মেয়ের মধ্যে এমন কোনো বংশীয় বা দুধের সম্পর্ক আছে কী-না যার দ্বারা বিয়ে হারাম হয়ে যায়। বংশ বা দুধের সম্পর্কে এমন কেউ না হয় যার সঙ্গে বিয়ে হারাম।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬২]

বরকে মাজারে নিয়ে যাওয়া

বর সেই শহরের কোনো বরকতপূর্ণ মাজারে গিয়ে নগদ কিছু উৎসর্গ করে। এখানে যে বিশ্বাস কাজ করে তা নিশ্চিত শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যদি কোনো জ্ঞানীব্যক্তি এমন ভ্রান্তবিশ্বাস থেকে মুক্ত হন তারপরও যেহেতু এর দ্বারা ভ্রান্তবিশ্বাস মানুষের মধ্যে দৃঢ় ও প্রসারিত হয় এজন্য সবার উচিত এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬২]

টোপর পড়ার বিধান

একজন হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-কে জিজ্ঞেস করেন, টোপর পড়ার বিধান কী? তিনি উত্তর দেন, জায়েজ নেই। এর দ্বারা হিন্দুদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়। এটা তাদের রীতি। [মোলাকাতে হেকমত: পৃষ্ঠা: ৩৪]

টোপর পড়া শরিয়তবিরোধী কাজ। কারণ তা কাফেরদের রীতি। হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে, যেব্যক্তি যেসম্প্রদায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬২]

বিয়ের সময় কালেমা পড়ানো

একব্যক্তি প্রশ্ন করেন, বিয়ের সময় কালেমা পড়ানোর যে প্রচলন আছে তার বিধান কী? তিনি বলেন, আমি এর কোনো প্রমাণ পাইনি। তবে একজন মৌলভি সাহেব বলেছেন, আমি 'বাহ্রুর রায়েক' গ্রন্থে দেখেছি, যদি থেকে থাকে তাহলে তা মোস্তাহাব পর্যায়ের কাজ হবে, ওয়াজিব পর্যায়ের নয়।

এরপর প্রশ্নকারী বলেন, কিছুলোক বলে, সম্ভ্রান্তলোকদেরকে কালেমা না পড়ানো উচিত। নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে কালেমা পড়ানো উচিত। যেমন, বেদে, যাযাবর ও কসাই। যারা অজ্ঞতার কারণে কুফরিবাক্য উচ্চারণ করে ফেলে কিন্তু বুঝতে পারে না। উত্তরে তিনি বলেন, না, বরং আজ অভিজাত শ্রেণীকেও কালেমা পড়ানো উচিত। কেননা তারা বড়ো অসংযত। মনে যা চায় বলে দেয়। তারা আল্লাহ ও রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কেও ছাড় দিয়ে কথা বলে না। এজন্য তাদের ইমানের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

[মাকালাতে হেকমতঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৯১]

তিনবার প্রস্তাব-কবুল বলানো ও আমিন পড়ানো

প্রশ্ন : বিয়েতে তিনবার প্রস্তাব ও কবুল বলানোর বিধান কী? ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা না-কি মোস্তাহাব?

উত্তর : কিছুই না। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৩৬]

বিয়েতে আমিন পড়ানো সম্পূর্ণ অনর্থক কাজ।

[হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৯]

বিয়ের অনুষ্ঠানে খোরমা ছিটানো

রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত ফাতেমা [রাদিয়াল্লাহ আনহা]-এর বিয়েতে একপাত্র খেজুর বিতরণ করেন।

এই হাদিসকে ইমাম জাহাবি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] ও অন্যান মোহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। এটা খুব বেশি হলে মোস্তাহাব হবে কিন্তু শরিয়তের বিধান হলো যখন কোনো মুবাহ কাজে [যা করলে পাপ বা পুণ্য কোনোটাই হয় না] বা মোস্তাহাব কাজে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন তা ছেড়ে দেয়াই কল্যাণকর। এর থেকে জানা যায়, অধিকাংশ সময় খেজুর ছিটানোয় কষ্ট হয় এবং বার বার ছিটাতে হয়। সুতরাং তা বিতরণে সীমাবদ্ধ করবে। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৯১]

খোরমা হওয়া আবশ্যক নয়

একবিয়েতে খোরমা ছিটানো হয়। তখন হজরত থানভি [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, খোরমা নির্দিষ্ট সুন্নত নয়। যদি কিসমিসও বিতরণ করা হয় তাহলেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। এখানে যেহেতু খোরমা ছিলো তাই তা বিতরণ করা হয়েছে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৮৮]

হজরত গাঙ্গুহি [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর ফতোয়া

বিয়ের সময় খোরমা ছিটানো বৈধকাজ। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে তা ছিটানো উচিত নয়। কেননা এমন কোনো প্রাসঙ্গিক কাজ করা উচিত নয় যা দ্বারা উপস্থিত লোকদের কষ্ট হয়। যদিও খোরমা ছিটানো বৈধ কিন্তু হাদিসের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা বর্ণনাকারীর অধিকাংশ বর্ণনা মিথ্যা প্রমাণিত। আর মসজিদে বিয়ে হয় তাহলে তা মসজিদের অসম্মান। দুর্বল হাদিসের ওপর আমল করতে গিয়ে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া এবং মসজিদের অসম্মান হয় এমন কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। হাদিসটি বর্ণনাকারীগণ এটি দুর্বল লিখেছেন।

[ফতোয়ায়ে রশিদিয়া: পৃষ্ঠা: ৪৫৯ ও ৪৬৭]

মহর

অধ্যায় । ১১ ।
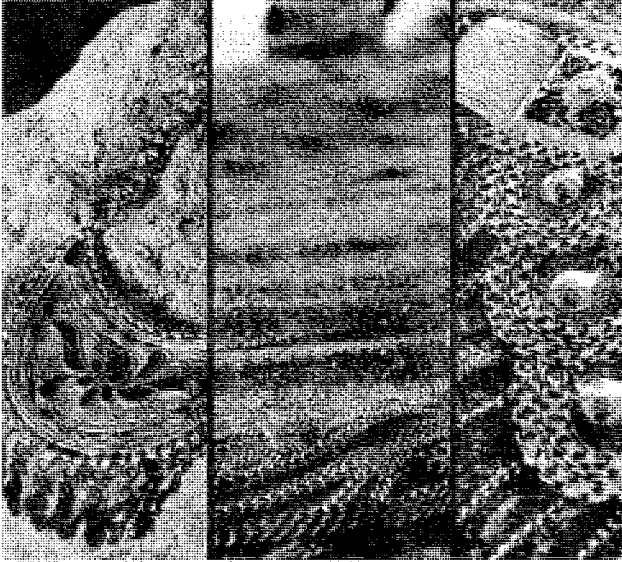
মহর নির্ধারণের রহস্য

বিয়েতে মহর নির্ধারণের নিয়ম করা হয়েছে, যাতে স্বামী বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকে এবং এমন কোনো প্রয়োজনে যখন তখন স্বামী অনন্যোপায় ছাড়া নারীর ওপর অবিচার না করে। এজন্য মহর নির্ধারণে একধরনের বাধ্যবাধকতা আছে। মহর দ্বারা বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এজন্য রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] পূর্ববর্তী প্রথার মধ্য থেকে মহর নির্ধারণের প্রথাটি যথারীতি রেখে দিয়েছেন।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২১০]

সাক্ষী নির্ধারণের রহস্য

সব নবি [আলায়হিস সালাম] ও ইমামগণ এ কথার ওপর একমত যে, বিয়ের প্রচার করতে হবে। যাতে উপস্থিত মানুষের সামনে বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। এজন্য সাক্ষী নির্ধারিত হবে। অধিক প্রচারের জন্য ওলিমা অনুষ্ঠান [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] করা হবে এবং মানুষকে সেখানে দাওয়াত দেয়া হবে। সেখানে বিয়ের কথা প্রকাশ করা হবে এবং বলা হবে অন্যদেরও জানাতে যাতে পরে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২১১]

মহর সম্পর্কে সাধারণ মানসিকতা ও মারাত্মক ভুল

একটি মারাত্মক ভুল হলো অধিকাংশ মানুষ মহর আদায় করার ইচ্ছাই রাখে না। চাই স্ত্রী আদায় করে নেয়ার ইচ্ছা রাখুক বা না রাখুক। তালাক বা মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ আদায়ের চেষ্টা করুক বা না করুক–কোনো অবস্থাতেই স্বামী আদায়ের ইচ্ছা রাখে না। মানুষের দৃষ্টিতে এটা অতিসাধারণ লেনদেন। এমনকি মহর কম-বেশি করার আলোচনার সময় অসঙ্কোচে বলে ফেলে, মিয়া! কে দেয় আর কে নেয়? তারা সরাসরি বলে, মহর শুধু নামের জন্যই। আদান-প্রদানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১২৭]

যে মহর আদায়ের ইচ্ছা রাখে না সে ব্যভিচারী

খুব ভালো করে মনে রাখা প্রয়োজন, মহরকে হালকা করে দেখা এবং তা আদায়ের ইচ্ছা না রাখা মারাত্মক বিষয়। হাদিসশরিফে এ ব্যাপারে অনেক হুঁশায়ারি এসেছে।

'কানজুলউম্মাল' ও 'বায়হাকি' গ্রন্থেদ্বয়ে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "যেব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিয়ে করলো এবং তার মহর বাকি রাখলো, এরপর সে ইচ্ছা করলো মহর আংশিক বা একেবারেই আদায় করবে না তাহলে সে ব্যভিচারী হয়ে মারা যাবে এবং আল্লাহর সঙ্গে ব্যভিচারী হিসেবে সাক্ষাৎ করবে।"

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৭; কানজুল উম্মাল: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৪৮]

যে মহর আদায় করে না সে প্রতারক ও চোর

এ হাদিসের একটি অংশ হলো, 'যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কোনো পণ্য কিনে এবং তার মূল্য পরিশোধের ইচ্ছা না রাখে অথবা কারো ওপর কিছু ঋণ আছে সে তা আদায়ের ইচ্ছা রাখে না তাহলে ওইব্যক্তি মৃত্যুর সময় ও কেয়ামতের দিন প্রতারক চোর হিসেবে চিহ্নিত হবে।' মহরও একপ্রকার ঋণ। কেউ যদি তা আদায়ের ইচ্ছা না রাখে তাহলে হাদিসের দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী সে ব্যক্তি প্রতারক-চোর বিবেচিত হবে। তাহলে এমন ব্যক্তির দু'টি অপরাধ প্রমাণ হয়। **এক.** ব্যভিচার; **দুই.** প্রতারণা ও চুরি। এরপরও কি ভুল সংশোধন যোগ্য নয়? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৭]

উত্তমচিকিৎসা: মহর কম নির্ধারণ করা

এর উত্তমচিকিৎসা হলো, মহর আদায় করার পুরোপুরি ইচ্ছা রাখবে। আর অভিজ্ঞতার দাবি হলো, মানুষ আদায়ের ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে তখন করে যখন তা তার সাধ্যের মধ্যে থাকে। নয়তো তা খেয়ালে পরিণত হয়, বাস্তবায়িত হয় না। কারণ, যেব্যক্তির শত টাকা আদায়ের ক্ষমতা নেই সে স্বাভাবিকভাবেই এক লাখ, সোয়া লাখ বরং সে পাঁচ-দশ হাজার টাকা পরিশোধেরও সামর্থ রাখে না। যখন সে সক্ষম নয় তখন সে আদায়ের নিয়ত না রাখার কারণে হুঁশিয়ারির পাত্র হবে। এজন্য সাধ্যের অতিরিক্ত মহর নির্ধারণ থেকে বিরত থাকা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। যেহেতু অধিকাংশ সময় বেশির ভাগ মানুষের সামর্থ কম থাকে। তাই উত্তম ও সহজপথ হলো মহর কম নির্ধারণ করা।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২]

প্রমাণ

ইসলামি শরিয়তে সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বিষয় মাথায় চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদিসশরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قَالُوْا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَحَمَّلُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُهُ

"কোনো মোমিনের জন্য উচিত নয় নিজেকে অপদস্থ করা। সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে নিজেকে অপদস্থ করে? তিনি বলেন, সাধ্যাতীত বিপদ নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়া।"

এ হাদিসের আলোকে সাধ্যের অতিরিক্ত মহর নির্ধারণ না করা এবং তা কম হওয়া শরিয়তের কাম্য প্রমাণিত হয়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩০]

মহর নির্ধারণ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস

হাদিসে মহর বেশি হওয়াকে অপছন্দনীয় এবং কম নির্ধারণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

১. হজরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] খুতবাতে বলেছেন, মহর অতিরিক্ত নির্ধারণ করো না। কেননা তা যদি পৃথিবীতে সম্মানের বিষয় হতো অথবা আল্লাহর কাছে খোদাভীরুতার বিষয় হতো। আর এর সবচেয়ে বেশি দাবিদার ছিলেন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]। কিন্তু রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কোনো স্ত্রী বা কন্যার মহর বারো উকিয়া থেকে বেশি ছিলো না। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম। এক দিরহাম সমান চার আনা চার পয়সা। অর্থাৎ রুপার চার আনা চার পয়সা। [কানজুল উম্মাল: পৃষ্ঠা: ২৯৭]

২. হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'মেয়েদের বরকতপূর্ণ হওয়ার একটি দিক হলো তাদের মহর সহজ বা কম হওয়া।' [কানজুল উম্মাল: পৃষ্ঠা: ২৩৯]

৩. অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'সহজ মহর নির্ধারণ করো।'

[কানজুল উম্মাল: পৃষ্ঠা: ২৪৯]

৪. অন্যহাদিসে এসেছে, 'উত্তমমহর হলো যা সহজ ও কম হয়।'

[ইসলাহে ইনকিলাব; পৃষ্ঠা: ১২৯]

মহর বেশি নির্ধারণের কুফল

এছাড়াও অধিক মহর নির্ধারণের অনেক জাগতিকক্ষতি রয়েছে যা সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, অনেক জায়গায় স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না। স্ত্রীর

অধিকার আদায় করা হয় না। কিন্তু মহর অধিক হওয়ার কারণে তালাকও দেয় না। মানুষ তা আদায়ের জন্য অস্থির হবে। এখানে অধিক মহর মহিলার উপকারের পরিবর্তে কষ্টের কারণ হয়েছে।

অধিক মহর নির্ধারণের একটি কুফল হলো, তা আদায় করা হয় না এবং আদায় করার ইচ্ছাও রাখে না।

স্বামী যদি খোদাভীরু হয় এবং বান্দার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়, তো মহর আদায়ের ইচ্ছা করে। তখন বিপদ হয়, এতোটা আদায় করা তার সাধ্যে থাকে না। ফলে দুশ্চিন্তার বোঝা তার ওপর চেপে বসে। সে অল্প অল্প করে আদায় করে। কিন্তু পরিমাণে বেশি হওয়ার কারণে তা শেষ হয় না। সে নানা রকম সংকট ও সমস্যা সহ্য করে। তখন মনে সংকীর্ণতা ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়। আর যেহেতু সব কষ্টের কারণ মহিলা তাই তার ব্যাপারে মন অনুদার হয়ে পড়ে। এরপর তা থেকে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এরপর শত্রুতা। সবকিছুর মূলে রয়েছে অধিক মহর নির্ধারণ।

একটি হাদিস

একটি হাদিসের ভাষ্য এমনই। বর্ণিত হয়েছে–

تَيَاسَرُوْا فِي الصَّدَاقِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتّٰى يَبْقٰى ذٰلِكَ فِيْ نَفْسِهٖ عَلَيْهَا حَسِيْكَةً

"মহরের ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করো। কেননা পুরুষ নারীকে অধিক মহর দেয়। আর এর দ্বারা পুরুষের মনে মহিলার প্রতি শত্রুতা জন্ম নেয়।"

[কানজুল উম্মাল: খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৪৯]

হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর অভিজ্ঞতা

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হলো, আমার একস্ত্রীর মহর ছিলো পাঁচ হাজার টাকা। অন্যস্ত্রীর মহর ছিলো পাঁচশো টাকা। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মহর আদায় করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম মহর আদায়ের জন্য যে উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে, যদি আমার প্রয়াত পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ আমাকে সাহায্য না করতো তাহলে তা আদায় করা কষ্টকর হতো। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মহর দৈনন্দিন আয় বা হাদিয়া থেকে খুব সহজে আদায় হয়ে গেছে। মনে চিন্তার কোনো বোঝা সৃষ্টি হয়নি।

স্বামীর চেষ্টার পরও যদি আদায় না হয় তখন অপরের প্রতি হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়। আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী হলে স্ত্রীর কাছ থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয়া। এমন আবেদন করাই লজ্জামুক্ত নয়। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৩]

সাধ্যের বেশি মহর নির্ধারণের পরিণতি

অনেক জায়গায় তালাক বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মহর দাবি করা হয়। যেহেতু লাখ টাকা পর্যন্ত পৌঁছে তাই সব সম্পদ মহর বাবদ চলে যায়। তখন স্বামী বা ওয়ারিশগণ দেউলিয়া হয়ে যায়। একবেলার খাবার পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তার দুনিয়া ও আখেরাত দুই-ই নষ্ট হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩২]

বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক এড়ানোর জন্য অধিক মহর নির্ধারণ

অনেক বুদ্ধিমান লোক অতিরিক্ত মহর নির্ধারণে এই উপকার মনে করে যে, স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারবে না। কিন্তু মহর কম হলে স্বামী কোনো চাপে পড়বে না। ছেড়ে দিতে কোনো বাধা থাকবে না। তখন তাকে ছেড়ে অন্যকে বিয়ে করবে। মহর বেশি হলে একটি প্রতিবন্ধকতা থাকে। এই ধারণা অমূলক। যার ছাড়ার প্রয়োজন সে ছেড়েই দেবে, যাই হোক না কেনো।

দ্বিতীয়ত ছেড়ে না দেয়া সবক্ষেত্রে কল্যাণকর নয়। কারণ, যেব্যক্তি মহরের ভয়ে ছেড়ে দেয় না সে ছাড়ার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট কাজ করে। অর্থাৎ তালাকের স্থলে ঝুলিয়ে রাখে। তালাক দেয় না কিন্তু কোনো অধিকার আদায় করে না। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই তাকে কে কী করতে পারে? তখন কোনো কিছুতে তার বাঁধে না। এমন ঘটনা কি চোখে পড়ে না, বড়ো বড়ো অঙ্কের ধার-কর্জ নেয় তবু স্ত্রীর কোনো অধিকার আদায় করে না। এমন অত্যাচারীর কেউ কিছু করতে পারে না। হয়তো প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ার কারণে তাকে ভয় পায়। অথবা তার কোনো সম্পদ থাকে না যে, জেলে পাঠিয়ে কোনো কিছু আদায় করবে। এছাড়াও জামাই জেলে গেলে নিজের মেয়ে কতোটা আরামে থাকতে পারবে? [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা: ১৩৫]

মহর কম হলে অসম্মানের ভয়

অনেক লোক বেশি মহর নির্ধারণে যুক্তি দেন, কম মহর অপমানকর। মহর বেশি হওয়া সম্মানজনক। প্রথম বিষয়টি হলো, কম পরিমাণ ভারসাম্যপূর্ণ হলে তা অপমানকর নয়। দ্বিতীয়ত যুক্তি ঠিক থাকলেও বেশি মহর নির্ধারণে সমস্যা সীমাহীন। আর উপকার কখন গ্রহণ করা যায়? [যখন লাভের পাল্লা ভারি হয়]। তৃতীয়ত যদি অহংকারবশত আদায়ের সামর্থের প্রতি লক্ষ না করা হয় তাহলে আমার শিক্ষকের কথা এই পরিমাণে কেনো থেমে থাকবে? তাহলে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ নির্ধারণ করে সম্মান ও গরিমা অর্জন করবে। উত্তম হলো, সাত

মহাদেশের অর্জিত সম্পদ ও ধনভাণ্ডার; বরং তার কয়েক গুণ নির্ধারণ করবে। আদান-প্রদান ব্যতীত শুধু নাম। তাহলে কেনো ভালোভাবে নাম করবে না। বাস্তবতা হলো, এগুলো সবই প্রথাপূজা ছাড়া কিছু নয়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৫]

মূলকথা হলো, অহংকার ও গর্বপ্রকাশের জন্য এমনটি করা হয়। খুব মর্যাদা ও ভাব প্রকাশ পাবে। অহংকারের জন্য কোনো বৈধকাজ করাও হারাম। আর যদি তা নিজেই সুন্নতবিরোধী বা মাকরুহ হয় তাহলে আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হবে। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮৯]

মহর বেশি নির্ধারণের প্রথা সুন্নতবিরোধী। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮৯]

মহর কম-বেশি নির্ধারণের মাপকাঠি

এখন কথা হলো এই কমের কোনো সীমা আছে কী-না? ইমাম শাফি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতে কমের কোনো সীমা নেই। সামান্য থেকে সামান্য পরিমাণও মহর হতে পারে। শর্ত হলো, তা মূল্যমান হতে হবে। চাই তা একপয়সা হোক। অর্থাৎ যা শরিয়তের দৃষ্টিতে মাল হতে পারে তাই মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন, সোনা, রুপা, টাকা, পয়সা ইত্যাদি। শুকর ও মদ শরিয়তের দৃষ্টিতে মাল নয়।

ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন সীমা দশ দিরহাম। এর থেকে কম মহর নির্ধারণ করা জায়েজ নয়। যদি দশ দিরহাম থেকে কম নির্ধারণ করা হয় তাহলে দশ দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব। দশ দিরহাম বর্তমান সময়ের তোলা অনুযায়ী ৩৪ গ্রাম রুপা হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৩০]

আমাদের উদ্দেশ্য মহর খুব বেশি-কম হওয়া নয় বরং উদ্দেশ্য হলো এতো বেশি না হওয়া যা তার দীন-দুনিয়ার ধ্বংসের কারণ হবে। আদায়ের ইচ্ছা না থাকলেও। আদায়ের চেষ্টা করলেও বা দায়িত্বমুক্ত হওয়ার উপায় খুঁজলেও বরং ভারসাম্যপূর্ণ মহর নির্ধারণেই সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত।

সুন্নত হলো, দেড়শো রৌপ্যমুদ্রা নির্ধারণ করবে। তবে কারো যদি আরো বেশি আগ্রহ থাকে তাহলে প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮৯]

মহরেফাতেমি

মহরেফাতেমি যথেষ্ট এবং বরকতপূর্ণ। যদি কারো সাধ্য না থাকে তাহলে আরো কম নির্ধারণ করা উচিত। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮৯]

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর মহর অন্যান্য মেয়েদের মতো সাড়ে বারো উকিয়া ছিলো। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম। এই মোট পাঁচশো দিরহাম হয়। আমি একবার একদিরহামের হিসেব বের করেছিলাম। ইংরেজি মুদ্রা অনুযায়ী চার আনা চার পয়সা হয়। এই হিসেবে পাঁচশো দিরহাম এবং আরো কিছু পয়সা হয়। বর্তমান হিসেবে এক কিলো পাঁচশো একত্রিশ গ্রাম রুপা হয়।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯৪]

মহর কম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সতর্কতা

একজনের প্রশ্নের উত্তরে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, মহর কম নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো সব আত্মীয় একত্রিত হয়ে মহর কমাবে। নয়তো প্রচলিত মহর মেয়ের অধিকার। অভিভাবক তা কমিয়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার অধিকার রাখে না। [আল ইফাজাত: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩২]

যেসব অবস্থায় অভিভাবকের জন্য প্রচলিত মহরের চেয়ে কম পরিমাণ নির্ধারণ করা নাজায়েজ যেমনটি ফিকহি মাসায়েলে উল্লেখ আছে, সেসব অবস্থায় মহর কমানোর পদ্ধতি হলো, সব আত্মীয় একমত হয়ে তাদের প্রথা পাল্টাবে। যাতে কম মহরই প্রচলিত মহর হিসেবে বিবেচিত হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ১৩৫]

টাকার স্থলে বাড়ি ইত্যাদি দেয়া

এটি স্বামীরা করে থাকে; নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্ত্রীকে কোনো জিনিস যেমন, অলঙ্কার, আসবাবপত্র, বাড়ি, জমি ইত্যাদি দেয়। তার নামে নিজে নিয়ত করে–আমি মহর দিয়েছি বা মহর আদায় করেছি।

ভালো করে বুঝে নিন! মহরের পরিবর্তে এসব জিনিস দেয়া ক্রয়-বিক্রয়ের শামিল। আর ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়পক্ষের সন্তুষ্টি আবশ্যক। যদি এসব জিনিস মহরের পরিবর্তে দিতে হয় তাহলে স্ত্রীকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে 'আমি মহর হিসেবে তোমাকে এসব জিনিস দিতে চাই তুমি রাজি?' যদি স্ত্রী রাজি হয় তাহলে জায়েজ। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ১৩৭]

মহর আদায়ের জন্য আগেই নিয়ত করতে হবে

প্রশ্নঃ জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, যদি আদায়ের সময় নিয়ত না করে তাহলে যতোক্ষণ আদায়কৃত বস্তু দরিদ্রব্যক্তির হাতে থাকবে ততোক্ষণ জাকাতের নিয়ত করে নেয়ার সুযোগ আছে। এমনিভাবে যদি স্ত্রীকে মহর দেয়ার সময় নিয়ত না করে তবে কি জাকাতের মতো স্ত্রীর হাতে বস্তুটা থাকার সময়ের মধ্যে নিয়ত করা জায়েজ হবে? নিয়ত করার দ্বারা মহর আদায় হবে না-কি আবার আদায় করতে হবে?

উত্তরঃ যদি দেয়ার সময় নিয়ত না করে তাহলে তা উপহার হয়ে যায়। তার দ্বারা ঋণ বা দায়মুক্তি হয় না। 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, একবার উপহার হওয়ার পর তা পুনরায় মহর হয় না।

وَلَوْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةً عِنْدَ الدَّفْعِ غَيْرَ جِهَةِ الْمَهْرِ

জাকাত এর বিপরীত। কারণ তা নিজেই এক প্রকার দান। উপহারও দান। তাই জাকাতের নিয়ত করলে বস্তুটা দান হওয়া থেকে বের হয়ে যায় না। এজন্য জাকাত আদায় হবে কিন্তু মহর আদায় হবে না।

[ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৯৪]

সোনা-রুপা দ্বারা মহর আদায় করলে কোন সময়ের মূল্য ধরা হবে

মূল্যনির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মাসয়ালা জানা আবশ্যক। যদি আদায় করা ওয়াজিব হয় একবস্তু এবং গ্রহণ করার সময় অন্যবস্তু দ্বারা তার মূল্য

নির্ধারণ করা হয় তাহলে যতোটা সে সময়ে আদায় করা হবে শুধু ততোটার হিসেব করা হবে। বাকি অংশ যদি একই বস্তু দ্বারা আদায় করা হয় তাহলে তা দ্বিতীয়বারের বাজারমূল্য অনুযায়ী আদায় করা হবে। প্রথমবারের বাজারমূল্য অনুযায়ী আদায়ে বাধ্য থাকবে না।

যেমন, একজন কৃষকের দায়িত্বে চল্লিশ সের গম ঋণ রয়েছে। পরে সিদ্ধান্ত হয়, নগদ অর্থে তা আদায় করা হবে। হিসেবের সময় এক টাকায় দশ কেজি গম পাওয়া যেতো। এই হিসেবে মোট দাম আসে চার টাকা। এখন যদি ওই বৈঠকে চার টাকা আদায় করা হয় তাহলে পুরো পণ্যের হিসেব করা জায়েজ। আর যদি সিদ্ধান্ত হয় দুই টাকা আদায় করা হবে তাহলে কেবল বিশ সেরের হিসেব করতে হবে। অবশিষ্ট বিশ সের কৃষকের দায়িত্বে ঋণ থাকবে। সামনে যখন তা আদায় করবে সে সময়ের বাজারমূল্য অনুযায়ী তা আদায় করতে হবে। প্রথম বাজারদরের হিসেব করা যাবে না। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৪২]

স্ত্রীর কাছ থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয়া লজ্জাকর ও দোষণীয়

মহর মাফ করিয়ে নিলে অন্তরে এক ধরনের হীনমন্যতা তৈরি হয়। যা আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী। কারণ, মহর মাফ করানোর জন্য তার কাছে আবেদন করতে হয়। যা লজ্জামুক্ত নয়।

যদিও স্ত্রীর জন্য ক্ষমা করে দেয়া বৈধ কিন্তু অপছন্দনীয় কাজ।

لِكَوْنِهٖ اَبْعَدَ مِنَ الْغَيْرَةِ

"কেননা তা আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী।"

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"তোমরা পরস্পরের মর্যাদাকে ভুলো না।"

আমি এই দিকে ইঙ্গিত করেছি। বরং আত্মমর্যাদাবোধের দাবি হলো, স্ত্রীর মহরমাফকে গ্রহণ না করা। এখানে তুমি তার প্রতি উত্তমআচরণটাই করবে। কেননা আত্মমর্যাদার দাবি হলো বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীর অনুগ্রহগ্রহণ না করা।

[আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩০১ ও হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩২]

প্রত্যেক ক্ষমাই গ্রহণযোগ্য নয়

ক্ষমা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তাতে স্ত্রীর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে। যদি আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে সঙ্গে খোদভীতিও চলে যায় তখন শুধু আক্ষরিক ক্ষমার নাজায়েজ পন্থাই প্রকাশ পাবে। হয়তো স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করবে নয়তো তাকে ধমকাবে বা চাপ সৃষ্টি করবে যাতে সে ক্ষমা করে দেয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে,

এমন ক্ষমা আল্লাহর কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর কাছে ঠিকই দায়িত্বের বোঝা বাকি থেকে যাবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৪]

অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর মহর মাফ হয় না

অনেক মানুষ তালাক দেয়ার সময় বা এমনিতেই অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর কাছ থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয়। এমন ক্ষমা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইসলামিশরিয়তের বিধান হলো, لَا تَبَرُّعَ بَاطِلٌ -ছোটোবাচ্চাদের দায়মুক্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি অভিভাবক বাবা বা চাচা ক্ষমা করে দেয় তবুও তা মাফ হয় না।

মহর নারীর অধিকার, তা চাওয়া দোষের নয়

একটি প্রচলিত ভুল হলো, নারীরা মহর চাওয়া বা চেয়ে নেয়াকে দোষের মনে করে। যদি কেউ এমন করে তাহলে তার বদনাম হয়। মনে রাখা উচিত, নিজের অধিকার চাওয়া বা আদায় করা যখন শরিয়তের দৃষ্টিতে দোষের নয় তখন শুধু প্রথা-প্রচলনের কারণে তা দোষের ভাবা গোনাহমুক্ত নয়।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৯]

আরব ও ভারতের রীতি

আরবের রীতি হলো নারীরা পুরুষের বুকের ওপর উঠে মহর আদায় করে। কিন্তু ভারতবর্ষে এটাকে বড়ো দোষের মনে করা হয়। ভারতবর্ষের নারীরা মহরের কথা মুখেই আনে না। অধিকাংশ নারীই স্বামীর মৃত্যুর সময় তা ক্ষমা করে দেয়। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫১]

ন্যায্য ভরণ-পোষণ মাফ হয় না, অধিকার শেষ হয় না

মহিলারা মনে করে, আমরা যদি মহর নিয়ে নিই তাহলে স্বামীর দায়িত্ব থেকে আমাদের সব অধিকার শেষ হয়ে যাবে। ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য জাগতিক অধিকার শেষ হয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। প্রত্যেক অধিকার ভিন্ন ভিন্ন। একটি অপরটির ওপর নির্ভশীল নয়। মহর নেয়ার কারণে অন্যকোনো অধিকার শেষ হয়ে যায় না। অনেক নারীর ধারণা, যদি আমরা মহর আদায় করে নেই তাহলে ভরণ-পোষণের অধিকার হারাবো। এজন্য তারা চাওয়া তো দূরের কথা অনেক নারী স্বামী আদায় করতে চাইলেও ভয়ে গ্রহণ করে না। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তবিশ্বাস। যার ফল হলো, একদিকে স্বামী আদায় করতে চায় অন্যদিকে স্ত্রী গ্রহণ করে না এবং ক্ষমা করে না। এখন যদি স্বামী দায়িত্ব আদায়ে প্রবল

আগ্রহী হয় তখন সে চিন্তায় পড়ে যায়– কীভাবে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৯]

স্ত্রী মহর গ্রহণ বা মাফ না করলে উপায়

প্রশ্নঃ যদি কোনো মহিলা তার মহর গ্রহণও না করে আবার ক্ষমাও না করে তখন স্বামীর দায়মুক্তির উপায় কী?

উত্তরঃ এমন অবস্থায় স্বামীর মহরের নির্ধারিত বস্তু বা অর্থ স্ত্রীর সামনে এমনভাবে রেখে দেবে যাতে সে ইচ্ছা করলেই গ্রহণ করতে পারে; এবং 'এটা তোমার মহর' বলে স্থান ত্যাগ করবে। তাহলে মহর আদায় হয়ে যাবে। স্বামী দায়মুক্ত হবে। তখন যদি স্ত্রী তা গ্রহণ না করে এবং অন্যকেউ তা নিয়ে যায় তাহলে তার সম্পদ নষ্ট হবে। এতে স্বামীর কোনো দায় থাকবে না। তবে স্বামী যদি তা সংরক্ষণের জন্য রেখে দেয় তাহলে তা স্বামীর কাছে আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকবে। তখন স্বামী তার মালিক হবে না এবং খরচ করাও বৈধ হবে না।

[ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩০৩ ও ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৯]

স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রীর মহর মাফ করা

একটি ভুল হলো, স্বামীর মৃত্যুশয্যায় স্ত্রী তার মহর ক্ষমা করে দেয়। তার বিধান হলো, স্ত্রী যদি খুশি মনে ক্ষমা করে তাহলে ক্ষমা হবে। আর চাপ প্রয়োগ করে মাফ করিয়ে নিলে আল্লাহর কাছে মাফ হবে না। বুড়া-বুড়িকে এভাবে বাধ্য করা ঠিক নয়। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৭]

স্বামীর মৃত্যুর পর মহর মাফ করার বিধান

স্বাভাবিকভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর মহর ক্ষমা করে দেয়া উত্তম মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে আদায় করে নেয়াই উত্তম। কেননা স্বামীর উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা চাওয়ার প্রতি লালায়িত থাকে যা দোষণীয়। আর ক্ষমা চাওয়াটা সেই দোষণীয় কাজকেই সাহায্য করে।

[ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৩০৪]

অনেক ক্ষমা করা কল্যাণকর হয় না। যেমন, স্বামী থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ তার ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যান্য ওয়ারিশদের থেকে সাহায্য সহযোগিতারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তখন ক্ষমা করার চেয়ে না করাই উত্তম। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৮]

মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর ক্ষমাগ্রহণযোগ্য নয়

অধিকাংশ মহিলা তার মৃত্যুর সময় মহর ক্ষমা করে দেয়। এতে স্বামী পুরোপুরি ভাবনাহীন হয়ে পড়ে। খুব ভালো করে বুঝুন! এই ক্ষমা [একজন] ওয়ারিশের জন্য [বিশেষ কিছু] অসিয়ত করার মতো। যা অন্যান্য ওয়ারিশের সন্তুষ্টি ছাড়া নাজায়েজ। সুতরাং এমন ক্ষমার দ্বারা মহর মাফ হবে না। তবে স্বামী উত্তরাধিকারসূত্রে যতোটুকু

পাবে তা মাফ হয়ে যাবে। বাকিটা তার দায়িত্বে পরিশোধ করা ওয়াজিব থাকবে, যা অন্যান্য ওয়ারিশদেরকে দেয়া হবে। যদি সব ওয়ারিশ ক্ষমা সমর্থন করে তাহলে ক্ষমা হয়ে যাবে। যদি ওয়ারিশদের কয়েকজন ক্ষমা করে এবং কয়েকজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে তাদের অংশ মাফ হবে না। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৭]

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ মহরের দাবিদার

মৃতস্ত্রীর ওয়ারিশ যদি তার পিতা-মাতা, ভাই ইত্যাদি হয় তখন তারা মহরের অংশ দাবি করে এবং স্বামী তা আদায় করে দেয়। কিন্তু যদি তার সন্তান ওয়ারিশ হয় তখন তারা ছোটো হওয়ার কারণে যেহেতু দাবি করতে পারে না। তাই স্বামী তাদের অধিকার আদায় করে না। এটা অবিচার ও প্রতারণার শামিল। সন্তানদের অংশ আমানত। তা তাদের নামে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। তাদের বিশেষ প্রয়োজনে খরচ করবে। নিজের কাজে খরচ করা হারাম। এমনিভাবে এসব সন্তান তাদের মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছে তা-ও আমানত। সংরক্ষণ করা বাবার জন্য ফরজ। অনর্থক খরচ করা হারাম। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৮]

মহর জাকাতকে বাধা দেয় না

অনেক মানুষ মহরের ঋণকে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক মনে করে। তারা মনে করে যেহেতু আমি [মহর বাবদ] এতো টাকা ঋণী তাই আমার এই পরিমাণ টাকায় জাকাত আসবে না। কিন্তু সঠিক মাসয়ালা হলো, মহর জাকাতকে বাধা দেয় না। আল্লামা ইমাম শামি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ "সঠিক মাসয়ালা হলো মহর জাকাতের জন্য প্রতিবন্ধক নয়।" [রদ্দুল মোখতার: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮]

অর্থাৎ মহরের ঋণ থাকার পরও স্বামীর ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। যদি তার নেসাব [জাকাত হওয়ার জন্য নির্ধারিত পরিমাণের সম্পদ] পরিমাণ সম্পদ থাকে। তবে অন্যদেয় মহর দ্বারা জাকাত ওয়াজিব হয় না যতোক্ষণ না তা আদায় করা হবে। আদায়ের পর বিগত দিনের জাকাত দিতে হবে না। শুধু নগদ জাকাত আদায় করলে হবে। 'দুররুল মোখতার' গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৩৮]

যৌতুক / উপঢৌকন
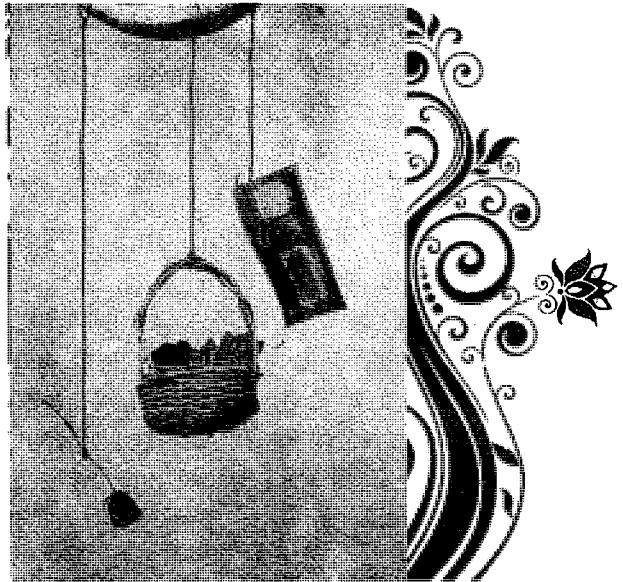
অধ্যায় । ১২ ।

চাওয়া ও কামনা ছাড়া ছেলে কিছু পেলে তা আল্লাহর অনুগ্রহ

যদি নিষ্ঠার সঙ্গে স্বপ্রণোদিত হয়ে স্বামীকে কিছু দেয়া হয় এবং স্বামীরও কোনো চাহিদা না থাকে বা তার প্রতি লালায়িত হয়ে অপেক্ষা না করে তাহলে তা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। প্রমাণ কোরআনের আয়াত–

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

"আল্লাহ আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন, এরূপর তিনি আপনাকে সম্পদশালী করেছেন।"

وَاشْتُرِطَ عَدَمُ التَّطَلُّعِ وَالتَّشَرُّفِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. مَا أَتَاكَ اللهُ مِنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهٖ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

"সম্পদের প্রতি তাকিয়ে না থাকা এবং তার জন্য অপেক্ষা না করার শর্ত করা হয়েছে। কেননা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, আল্লাহ যা তোমাকে চাওয়া বা ইঙ্গিত ছাড়া দান করেছেন তা তুমি গ্রহণ করো। এরূপর তা সম্পদ হিসেবে রেখে দেবে বা দান করবে। আর যা তোমার পেছনে না পড়ে তুমি তার পেছনে পড়ো না।" [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৬]

যৌতুক ও তার বিধান

প্রকৃতপক্ষে যৌতুক হচ্ছে মেয়ে বা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ছেলের প্রতি উপহার। যৌতুক নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহস্বরূপ। মৌলিকভাবে তা জায়েজ। বরং উত্তম। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৬]

আল্লাহ যদি কারো সামর্থ দিয়ে থাকেন তাহলে মেয়েকে বেশি করে যৌতুক দেয়া দোষের কিছু নয়। তবে এমন কিছু দেয়া উচিত যা মেয়ের উপকারে আসে। [হুকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ৫৩]

যৌতুক দেয়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়

১. সাধ্যের বেশি চেষ্টা করবে না।

২. প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা, যা শ্বশুরবাড়ি কাজে লাগবে।

৩. ঘোষণা করবে না। কেননা এটা নিজসন্তানের প্রতি স্নেহস্বরূপ। অন্যকে দেখানোর কী প্রয়োজন? রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর কাজ দ্বারা এই তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৯৩]

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-কে প্রদেয় উপহার

জান্নাতিনারীদের নেত্রী হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর যৌতুক ছিলো দু'টি ইয়ামেনি চাদর, তিশির ছালের দুটি তোশক, চারটি গদি, রুপার দুটি চুড়ি [বাজুবন্দ], একটি পশমিকম্বল ও বালিশ, একটি পানির পেয়ালা, একটি পানি রাখার পাত্র। কিছু কিছু বর্ণনায় একটি খাটের কথাও পাওয়া যায়।

[ইজালাতুল খিফা ও ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৯৩]

প্রচলিত যৌতুক ও তার কুফল

বর্তমান সময়ে যৌতুকের যে প্রথা চালু হয়েছে তার মধ্যে বহুমুখী অকল্যাণ রয়েছে। যার সারকথা হলো, যৌতুক এখন আর হাদিয়া বা স্নেহের নিদর্শন নয় বরং তা খ্যাতি, প্রচার ও প্রথাপূজার জন্য করা হয়। এতে বড়োত্ব ও যৌতুক উভয়ের প্রচার হয়। যৌতুকের জিনিসপত্রও নির্ধারিত। মনে করা হয়, অমুক জিনিস অপরিহার্য। সব আত্মীয় ও হিতাকাঙ্ক্ষীকে দেখানোর জন্য সাধারণ মজলিসে তা উপস্থিত করা হয়। একটি একটি করে সব জিনিস দেখানো হয়। অলঙ্কারের বিবরণ পড়ে শুনানো হয়। এখন আপনিই বলুন! এটা প্রদর্শনপ্রিয়তা নয় কি? এছাড়াও নারীর পোশাক পুরুষকে দেখানো কতো আত্মমর্যাদাহীনতার কাজ। যদি সম্পর্কোন্নয়ন উদ্দেশ্য হতো তাহলে সাধ্যের মধ্যে যা সহজ হয় তাই দেয়া হতো। এমনিভাবে সম্পর্কোন্নয়নের জন্য কোনোব্যক্তি ঋণ করতো না। কিন্তু প্রথা-প্রচলনের পেছনে পড়ে অধিকাংশ সময় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কখনো সুদে ঋণ নেয়। কখনো বাগান বিক্রয় বা বন্ধক রাখে। সুতরাং যৌতুকে অনাবশ্যক জিনিস আবশ্যক করে তোলা, খ্যাতি ও প্রচারের পেছনে পড়া এবং অপচয়ের মতো অকল্যাণ ও কুফল বিদ্যমান। এজন্য যৌতুকও প্রচলিত নিষিদ্ধকাজের অন্তর্গত। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৬ ও ৫৭]

উপহার-উপকরণ

মেয়েকে কিছুজিনিস এমন দেয়া হয় যা ঘর ভরা ছাড়া কখনো কোনো কাজে আসে না। যেমন, খাট, পিঁড়ি [মোড়া বিশেষ] যা লৌকিকতা ছাড়া কিছু না। কারণ, এসব জিনিস কাজে লাগাতেও কষ্ট হয়। মূলত যা কাজের উপযোগী

নয়। কেননা লৌকিকতা জাঁকজমকপূর্ণ হয়। জাঁকজমক ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ রাখা হয়। এখন তার দ্বারা শুধু ঘর ভরে কোনো কাজে লাগে না।

যদি মেয়েকে কলজের টুকরো মনে করে দেয়া হয় তাহলে তাকে এমন জিনিস দেয়া উচিত যা তার কাজে আসে। আর এমন জিনিস তাকে দেয়াও হয় না। শুধু অহংকার ও দেখানোর জন্য দেয়া হয়। এ কারণেই যার যতোটুকু প্রতিদান তার চেয়ে এক পা বেড়ে দেয়। একজন যদি দশটি পাত্র ও পঞ্চাশ জোড়া কাপড় প্রদান করে তাহলে অপরজন নয়টি পাত্র ও ঊনপঞ্চাশ জোড়া কাপড় দেবে না বরং সে একটি বাড়িয়েই দেবে। এজন্য সে যতোই ঋণী হোক না কেনো। সুদে ঋণ নেয়ার কথা ভাবে। সম্পর্কের চাপে পড়ে দরিদ্রব্যক্তি তার ভবিষ্যত নষ্ট করে। দরিদ্রকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কোনো কারণ নেই। দরিদ্রের উপহার তার মতোই হয়। আর ধনীর উপহার অবস্থান অনুযায়ী হয়। ধনীরাও প্রথাপালন করতে গিয়ে ঋণগ্রস্থ হয়।

প্রচলিত যৌতুকে বা উপহারের উদ্দেশ্য কেবল সুনাম

বর্তমানে উপহারের যে প্রথা রয়েছে তার ভিত্তিমূল কেবল আত্মগরিমা। এমনকি মেয়েকে যা দেয়া হয় তার উদ্দেশ্যও একই। মেয়ে হলো কলজের টুকরো। সারাজীবন তাকে গোপনে গোপনে [বিশেষভাবে] খাওয়ানো হয়। যদি তা মেয়ের পেটে পড়ে তাহলে কাজে আসবে। অন্যকে দেখানোরও প্রয়োজন মনে করে না। পাছে কারো নজর লাগে! কিন্তু বিয়ের সময় চেহারা পাল্টে যায়। অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটা জিনিস দেখানো হয়। থালা-বাটি, কাপড়-চোপড়, সিন্দুক এমনকি আয়না-চিরুনী পর্যন্ত দেখানো হয়। যেনো প্রথমে কলজের টুকরো ছিলো এখন আর নেই বা এখন কলজের টুকরো হয়েছে কিন্তু আগে ছিলো না। বিয়ে ঠিক হওয়ার আগে-পরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হয়ে যায়।

চিন্তা করলে এ ধরনের অহংকার প্রকাশ ছাড়া আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, আমরা এতো এতো দিয়েছি। এটা নয় লক্ষ্য নয় যে, আমার মেয়ের ঘরের জিনিস বাড়লো।

অন্তরের ব্যথা

এজন্য কাপড় ও বাসনপত্রসহ উপহারের সব জিনিসে প্রতারণা থাকে। মূল্যের বিবেচনায় যা খুবই হালকা হয়। সবাই মিলে বাজারে যায়। দোনকারদারকে বলে বিয়ের বাজার করতে এসেছি নেয়া-দেয়ার [সাধারণ মানের] জিনিস দেখান। যদি মেয়ের প্রতি আমাদের মমতা থাকতো তাহলে জিনিসের পরিমাণ

কম হতো কিন্তু মান ভালো হতো। কাজে লাগানোর অযোগ্য জিনিস দেয়া হতো না। যার উদ্দেশ্য কেবল প্রদর্শন। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৪৯]

অহংকার ও প্রদর্শনের নানা দিক

অনেকে বলে, আমরা যৌতুকের জিনিস দেখাই না। প্রথা পরিহার করেছি। জনাব, এতে প্রশংসার কী আছে? নিজ গ্রামেতো বছরের শুরু থেকে সব জিনিসপত্র এক করে প্রত্যেককে দেখানো হয়ে যায়। যারা প্রস্তাব নিয়ে আসে তাদেরকে দেখায়। কোনো আত্মীয় আসলে তাদেরকেও দেখানো হয়। এমনকি জিনিসগুলো কোথাকার তা-ও বলা হয়। আজ দিল্লি থেকে কাপড় আসছে। মুরাদাবাদ গিয়েছিলো সেখান থেকে বাসনপত্র নিয়ে এসেছে। এরপর স্বামীর বাড়ি গিয়ে আবার বলে। সবই দেখানো হয়। এজন্য মেয়ের সঙ্গে একজন লোক পাঠানো হয়। সুতরাং সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনি কিন্তু তার চেয়ে বেশি করেছে। [ইসলাহুন নিসা ও হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৮৬]

যৌতুক হিসেবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ দেয়া

আমি একঘনিষ্ঠজনের ঘটনা শুনেছি যে অনেক ধনী ছিলো। সে মেয়ের বিয়েতে একটি পাল্কি, একটি কার্পেট ও একটি কোরআনশরিফ দেয়। এছাড়া আর কাপড় বা বাসনপত্র কিছুই দেয় না। এর পরিবর্তে সে একলাখ টাকা মূল্যের সম্পদ মেয়ের নামে লিখে দেয়। সে বলে, আমার ইচ্ছা ছিলো বিয়েতে একলাখ টাকা খরচ করবো। টাকাও জোগাড় করে রেখেছিলাম। ইচ্ছা ছিলো ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে দেয়া। এরপর ভাবলাম, ধুমধামে বিয়ে দিলে আমার মেয়ের লাভ কী? মানুষ খেয়েদেয়ে চলে যেতো। আমার টাকা নষ্ট হতো। যা মেয়ের কোনো উপকারে আসতো না। এজন্য এমন ব্যবস্থা করেছি যা আমার মেয়ের উপকারে আসে। আর জায়গা-জমির চেয়ে উপকারী কিছু নেই। এর দ্বারা সে ও তার সন্তানরা ভাবনাহীনভাবে জীবন কাটাতে পাড়বে। কেউ আমাকে কৃপণও বলতে পারবে না। আমি ধুমধামে অনুষ্ঠান করিনি কিন্তু টাকাও ঘরে রেখে দিইনি। দেখুন! এটাই বুদ্ধিমানদের কাজ।

আল্লাহ যদি কারো সামর্থ দিয়ে থাকেন তাহলে মেয়েকে উপহার দেয়া দোষের কিছু নয়। তবে এমন কিছু দেয়া উচিত যা মেয়ের উপকারে আসে। কিন্তু মেয়েরা বোঝে না। তারা অনর্থক টাকা নষ্ট করে। যাতে তাদেরও কোনো উপকারে আসে না, মেয়েরও কোনো উপকারে আসে না। [হুকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ৫২]

যে পরিমাণ টাকা নষ্ট করা হয় তা দিয়ে তাদের কোনো সম্পত্তি কিনে দেয়া হলে বা ব্যবসা শুরু করিয়ে দিলে তাদের আরাম হবে। [ইসলাহুন নিসা: পৃষ্ঠা: ১৫৮]

যৌতুক হিসেবে কাপড় দেয়া

বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহার বা যৌতুক হিসেবে অতিরিক্ত কাপড় দেয়া হয়। একবার মিরাঠের এক গ্রামে যাই। সেখানে এক নববধূ শুধু পনেরশো টাকার কাপড় নিয়ে আসে। বাসনপত্র, বাটি-ঘটি আর অলঙ্কারতো আছেই। আমি অনেক বাড়িতে দেখেছি, বিয়েতে এতো কাপড় দেয়া হয় মেয়ে সারাজীবন পরেও তা শেষ করতে পারে না। এখন সে কী করবে? উদার হলে বিলানো শুরু করে। এক একজনকে এক এক জোড়া কাপড় দেয়। আর কৃপণ হলে সিন্দুকে আটকিয়ে রাখে। তখন অনেক জোড়া পরারও ভাগ্য হয় না। এটা ঘরে রেখেই মাটি হয়। এভাবে অপচয়ের মাধ্যমে মেয়েদের সম্পদ নষ্ট হয়।

বিয়েতে এতো কাপড় দেয়ার কী প্রয়োজন? আবার দেবেও না কেনো? এতে যে নাম হয়! অমুক তার মেয়েকে এতো কিছু উপহার বা যৌতুক দিয়েছে। এতোগুলো কাপড় দিয়েছে। এভাবে অহঙ্কার করতে গিয়ে অর্থ অপচয় করে।

[হুকুকুল বাইতঃ পৃষ্ঠাঃ ৫২]

অধিকাংশ সময় এমন হয়, মেয়ে মারা যায় এবং হাজারো টাকার এ সম্পদ নষ্ট হয়। এরপর তার কাপড় পুরো গোত্রের মাঝে বণ্টন করা হয়। কখনো পছন্দও হয় না, অনেক দোষ বের করা হয়। অথচ তারা বলে, আমরা প্রথা মানি না।

[ইসলাহুন নিসাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৮৫]

যৌতুক দেয়ার সঠিকপদ্ধতি ও সময়

মেয়েকে যা কিছু দেয়া হয় তা কন্যাবিদায়ের সময় দেয়া উচিত নয়। কেননা তখন দেয়া হয় শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে। যৌতুকের জিনিস মেয়ের সঙ্গে না দেয়াই যৌক্তিক। কেননা সবকিছু মেয়েকে দেয়া হয় অথচ সে তা গ্রহণ করতে পারে না। সে জানেও না তাকে কী দেয়া হলো। দেয়ার পদ্ধতিটা হলো, সবকিছু ঘরে রেখে দেবে। যখন ঝামেলা মিটে যাবে এবং মেয়ে বাপের বাড়ি আসবে। তখন সবকিছু তার সামনে রেখে বলবে, সবকিছুর মালিক তুমি। তোমার যা দরকার, যা তোমার মনে চায়, যখন মনে চায় শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে। যা কিছু এখানে রাখতে চাও রেখে দাও। তখন সে যা কিছু রেখে দেবে তা যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করবে।

উত্তম হলো, বিয়ের দিন কোনো জিনিস নেবে না। কেননা তার কোনো প্রয়োজন এখনো তৈরি হয়নি। যখন তার প্রয়োজন হবে তখন তা নিয়ে যাবে। এটাই যৌক্তিক এবং অহংকারমুক্ত। কিন্তু যেহেতু এখানে প্রদর্শন করার সুযোগ নেই তাই কেউ এমনটি করে না। আর কেউ করলে লোকে তাকে ভালো-মন্দ

বলে। তাকে কৃপণ সাব্যস্ত করে। বলে খরচ বাঁচানোর জন্য ধর্মকে বর্ম বানিয়েছে। কিন্তু এটাই সঠিক ও শরিয়তসিদ্ধ।

[হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮ ও ইসলাহুন নিসা: পৃষ্ঠা: ১৮৬]

যৌতুকের সম্পদ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া খরচ করা যায় না

উপহারের সম্পদ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী খরচ করতে পারবে না। কারণ উভয়ের মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন। স্বামীর জন্য অবিচার হবে স্ত্রীর সম্পদ তার আন্ত রিক সন্তুষ্টি ছাড়া ব্যয় করা। স্ত্রীর জন্য প্রতারণা হবে স্বামীর সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া ব্যয় করা। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮৬]

আন্তরিক সন্তুষ্টি কাকে বলে

সন্তুষ্টির অর্থ তার চুপ থাকা বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করা নয় বা জিজ্ঞেস করার পর লজ্জায় পড়ে সম্মতি দেয়া নয়। বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ সময় অসন্তুষ্টি থাকার পরও লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধের কারণে অনুমতি দেয়া হয়।

কিন্তু সন্তুষ্টি হলো সন্দেহাতীত নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত মালিকের অন্তরিক অনুমতির নাম। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে সন্তুষ্টি জানতে হবে।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"সাবধান! কোনো মুসলিমের সম্পদ তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ছাড়া বৈধ হয় না।"

[ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ১৮৬]

অধ্যায় । ১৩ ।

বিয়েকেন্দ্রিক লেনদেন
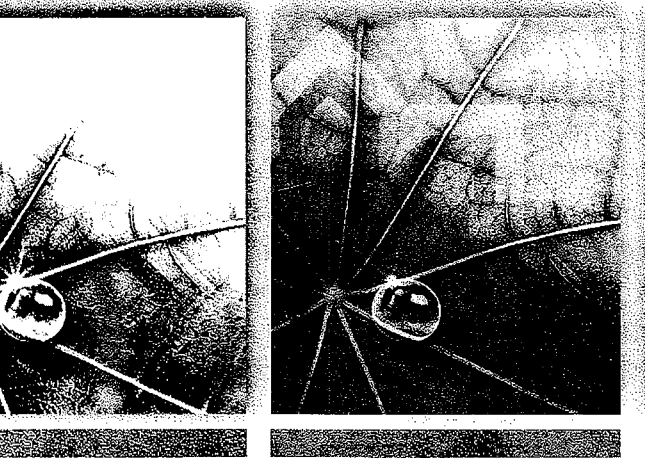
[সে যুগে বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়দের ওপর সম্মিলিতভাবে একধরনের চাঁদা ধার্য করা হতো। যা উপহার নামে আদান-প্রদান হতো এবং তা প্রদান করা ও গ্রহণ করা দুই-ই আবশ্যক ছিলো। গ্রহীতা যে পরিমাণ নিতো দাতার পরিবারের কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে ঠিক সেই পরিমাণ আদায় করতে হতো। এখনও সে প্রচলন উপমহাদেশের কোথাও কোথাও রয়েছে গেছে। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] শরিয়ত অগ্রাহ্য এই প্রথা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছেন। –অনুবাদক]

প্রচলিত লেনেদেনে ক্ষতির ভাগটাই বেশি

আদান-প্রদানের সবচেয়ে উত্তমপ্রথা যা বিয়েতে করা হয়; অল্প অল্প দিলে তা আয়োজকদেরও কাজে আসে এবং যারা দেয় তাদের ওপরও বোঝা হয় না। এটা প্রশংসনীয়। এটাকে মন্দ বলা যায় না। একজন গরিবমানুষকে কিছু দেয়ার ফলে তার বিয়ে হয়ে গেলো–এটা কি কম কথা? আমি বলি, তারা একটি উপকার দেখেছে। কিন্তু তাতে বিরাজমান অনেক কুফল তারা লক্ষ করেনি। তার একটি উপকার যেমন আছে তার অপকার কী পরিমাণ তা-ও দেখা দরকার। তাছাড়া যে উপকারের কথা বলা হয়েছে তা-ও অর্জিত হয় না। কারণ, বিয়েতে যে পরিমাণ খরচ করা হয় তার জন্য প্রদেয় টাকা যথেষ্ট নয়।

[আততাবলিবগ, আহকামুল মাল: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ৮৮]

প্রচলিত আদান-প্রদানে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না

'নবদম্পতিকে কিছু উপহার দেয়া' হজরত সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] থেকে প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে নবদম্পতিদেরকে কিছু দেয়া আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে দিলে বিদ্বেষ বাড়ে। সম্পর্ক খারাপ হয়। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, উপহার যখন আন্তরিকতার সঙ্গে হয় তখন আন্তরিকতা বাড়ে। আর প্রথাগত কারণে দিলে আন্তরিকতা বাড়ে না।

[তাতহিরে রমজান: পৃষ্ঠা: ৪১৬; ফাজায়েলে সওম ও সালাত]

বিয়ের উপঢৌকন : বাস্তবতা ও কল্যাণ

বিয়ের সময় কয়েকবার উপহার দেয়া হয়। যেমন, সেলামির সময় উপহারের টাকা একত্রিত করে বরকে দেয়া হয়।

বিয়ের উপহারের অতীত খুঁজলে পাওয়া যায়, আগে কোনো দরিদ্র্যব্যক্তির বিয়ের সময় হলে আত্মীয়-স্বজন তার সহযোগিতার জন্য কিছু টাকা-পয়সা বা জিনিস একত্রিত করতো। তখন এসব বিষয়ের এতো প্রসার ছিলো যে, সামান্য পুঁজি দিয়ে সব প্রয়োজন সম্পন্ন করা হতো। তার ওপরও বোঝা হতে দিতো না। প্রদানকারীদেরও বেশি খরচ হতো না।

যদি উপহার ও সহযোগিতার জন্য দেয়া হতো তাহলে অন্যের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান চাইতো না।

هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

"উপকারের প্রতিদান কেবল উপকারই হতে পারে।"

শরিয়তের এই নীতি অনুসারে প্রয়োজনের সময় কম-বেশির বিবেচনা না করে প্রত্যেকে তার সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করতো।

যদি ঋণ হিসেবে দিতো তাহলে ধীরে ধীরে তা পরিশোধ করতো। বাস্তবেই তখন এই বিষয়টি খুবই উপকারী ছিলো। এখন আর বিষয়টিতে কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট নেই। বিয়েতে যে পরিমাণ খরচ হয় তার উল্লেখযোগ্য অংশ যদি উপহারে না আসে তাহলে অনর্থক ঋণগ্রস্থ হওয়ার প্রয়োজন কী? বিনা প্রয়োজনে ঋণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পরে তা আদায় করতে পারে না। যদি বিয়ের সময় হাতে অর্থ না থাকে অনেক সময় সুদে ঋণ করা হয়। যা গোনাহের কাজ। যেকাজে এতো পাপ তা পরিহার করা ওয়াজিব।

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৭১]

বিয়েতে উপহার নেয়া-দেয়ার শরয়িবিধান

বিয়ের উপহার একধরনের ঋণ। শরিয়তের ঋণের যেবিধান আছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বিনা প্রয়োজনে উচিত নয়। উপহার কী ধরনের ঋণ? এখানে কী এমন প্রয়োজন আছে? দাতা নিজের ইচ্ছায় দেয় কিন্তু গ্রহণকারী নিতে বাধ্য থাকে। না নিলে আত্মীয়-স্বজন খারাপ ভাবে। এখন বলুন! এটা কেমন ঋণ যা দাতা জোরপূর্বক প্রদান করে? অন্যজন অনিচ্ছায় ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। এটা নেয়ার সময়ের বিধান। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৬৮]

উপহারপ্রদানের পরের বিধান

দেয়ার সময়ের বিধান কোরআনশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"যদি ঋণগ্রহীতা সংকটগ্রস্থ হয় তাহলে তা আদায়ে সামর্থবান হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেয়া হবে।"

অথচ এখানে সময় নির্ধারণ করা হয় অন্যজনের বিয়ে পর্যন্ত। চাই কারো সামর্থ থাকুক বা না থাকুক।

আরেকটি বিধান হলো, ঋণগ্রহীতা যখন ইচ্ছা তা আদায় করে দিতে পারে। যদি নির্ধারিত কোনো সময় থাকে এবং গ্রহীতা তার আগে আদায় করে দেয় তাহলে ঋণদাতার গ্রহণ না করার সুযোগ নেই। সে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু উপহাররূপী এই ঋণ বিয়ের সময় ছাড়া আদায় করলে গ্রহণ করা হয় না। এটা কেমন ঋণ হলো? এটা আল্লাহর বিধানে হস্তক্ষেপের শামিল।

[মোনাজায়াতুল হাওয়া ও হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৬৭]

উপহার এখন শুধুই ঋণ

অনেকে বলে, বিয়ের উপহারকে আত্মীয়তার বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কিন্তু এটা শুধুই ঋণ। কেননা আত্মীয়তার বন্ধনে কোনো প্রতিদানের শর্ত থাকে না। আর এখানে এই শর্ত আছে। তা স্পষ্ট হোক বা অস্পষ্ট। বিয়ের উপহার জোরপূর্বক আদায় করা হয়।

এখানে একটি বিয়ে হয়েছিলো। যাতে উপহার কম আসে। তখন তারা তালিকা বের করে দেখলো, অনেকে উপহার দেয়নি। বিয়ে শেষ তবুও তারা এক বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করে। যে কয়েক মাস পর্যন্ত উপহার উসুল করে। এর নাম আত্মীয়তা! যা এভাবে আদায় করতে হয়? এটা শুধু মুখের দাবি। প্রকৃতপ্রস্ত াবে এটা ঋণ। এছাড়া অন্যকোনো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যখন তা ঋণ তখন তার ওপর ঋণের শরয়িবিধান কার্যকর হবে। শরিয়তের বিধান কেউ পরিবর্তন বা পাল্টানোর অধিকার রাখে না। যেমন, কোনো শাসক যদি কোনো লেনদেনকে অন্যকোনো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে তার বিধান জারি করে তবে তা মানতে বাধ্য থাকে। তখন কারো অধিকার থাকে না বিধানটি নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা। যখন পৃথিবীর শাসকের একটি বিধান পালন করা আবশ্যক হয়, বিবেকের আদালতে যার গ্রহণযোগ্যতা এখনো জানা যায়নি তখন মহান প্রভু আল্লাহর বিধান কেনো আবশ্যক হবে না? [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৬৭]

উপহারের কুফল

প্রচলিত পদ্ধতিতে উপহার আদান-প্রদানের কুফল অগণিত। যার অন্যতম হলো, যখন কোনোব্যক্তি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহারগ্রহণ করে তখন সে দাতাদের কাছে ঋণী হয়ে যায়। হাদিসশরিফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ঋণীব্যক্তি যতোক্ষণ না দাতাদের ঋণ আদায় করবে ততোক্ষণ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। [আততাবলিগ: পৃষ্ঠা: ৯২]

বিয়ের উপহারে মিরাস

আরেকটি বড়ো সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। যা পরিহার করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সমাধান নেই। প্রচলিত উপহার যেহেতু ঋণ তাই তাতে মিরাস জারি হয়। যেমন, স্ত্রী মারা গেলে তার ওয়ারিশগণ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মহর আদায় করে নেয়। এমনিভাবে এখানেও উত্তরাধিকারসম্পত্তি জারি হওয়া চাই এবং ওয়ারিশগণ যা ইসলামিশরিয়ত অনুযায়ী ভাগ করে নেবে। কিন্তু তার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৬৭]

যেমন, কোনোব্যক্তি মারা গেলো দুটি ছেলে রেখে। সে পাঁচ টাকা উপহার দিয়েছিলো। তাহলে পাঁচ টাকা তার পরিত্যক্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তা আদায় করা হবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা ওয়াজিব। তা যেভাবেই আদায় হোক না কেনো। যদি এই বাড়িতে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হয় তাহলে পাঁচ টাকা উপহার হিসেবে আদায় করা হবে। এখন যদি একছেলে বিয়ে হয় এবং পাঁচ টাকা আদায় করা হয় তাহলে সে একা পাঁচ টাকার মালিক হবে না বরং সে আড়াই টাকা পাবে। বাকিটা অপর ভাইয়ের অংশ। যা আদায় করে দেয়া আবশ্যক। কিন্তু আদায় করা হয় না। এজন্য দাতার দায়িত্ব থেকে পাঁচ টাকা আদায় হবে না। আদায় হবে আড়াই টাকা। বাকি আড়াই টাকা দায়িত্বে থেকে যাবে। এখন যদি সে মারা যায় তাহলে আড়াই টাকার মিরাস বিস্তৃত হতে থাকবে। একসময় এই আড়াই টাকার মালিক হবে হাজারো মানুষ। কেয়ামতের দিন তার ওপর এই আড়াই টাকার দায় বর্তাবে। তখন এক এক টাকা, এক এক পয়সা করে খোঁজা হবে। শেষপর্যন্ত তার সমাধান কী হবে। এমন ভয়ানক কুফল রয়েছে প্রচলিত উপহারে। কিন্তু মানুষ শরিয়তের জ্ঞান রাখে না বলে তারা তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৩]

মূলত এটা মিরাসের বিধান লঙ্ঘন। যা সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে–

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ

"আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান।"

আগে বর্ণিত হয়েছে, যেব্যক্তি আল্লাহর বিধান মান্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহর বিধান মানে না তাকে জাহান্নামে দেয়া হবে। এই আয়াত দ্বারা মিরাসের বিধানকে দৃঢ় করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, প্রচলিত বিয়ের উপহারে কী করা হয়। অনেক জায়গায় কেউ যদি উপহার ছেড়ে মারা যায় তাহলে তা বড়োছেলের বিয়ের সময় আদায় করা হয়। বড়োছেলে তা নিজের বিয়ের কাজে খরচ করে। অথচ তা সব ওয়ারিশের অধিকার। সে একা খরচ করে। তা দিয়ে খাবারের আয়োজন করা হয়। সব আত্মীয় তা খায়। এতে অন্যওয়ারিশদের অধিকার নষ্ট করা হয়। তাদের অনুমতি ছাড়া খায়। এটা বান্দার অধিকার। ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে তার অংশও খাওয়া হয়। তখন বিষয়টা দাঁড়ায় বান্দার অধিকার নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হলো। যে সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

"যারা অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ গ্রাস করে তারা আগুন দিয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করে। অতি শিগগিরই তারা জাহান্নামের প্রবেশ করবে।"
কোনো মুসলমান কি এমন হুঁশিয়ারির পরেও তা বাকি রাখার গোনাহ করবে? দেয়াতো দূরের কথা এমন হুঁশিয়ারির পর নিজের প্রদেয় টাকা আদায় করতে ভুলে যাবে? এটা হলো, প্রচলিত উপহারের পরিণতি। যাতে সব আত্মীয়-স্বজন লিপ্ত। [মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৬৯]

প্রচলিত আদান-প্রদান না করার সমস্যা

একজন প্রচলিত লেনদেন সম্পর্কে বলেন, যদি এটা বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে দূরত্ব সৃষ্টি হবে। সম্পর্ক নষ্ট হবে। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, প্রচলিত লেনদেনের ফলে আন্তরিকতা বাড়ে না; বরং কমে। যারা দেয় প্রথাগত কারণে লজ্জায় পড়ে দেয়।
দ্বিতীয়ত ভালোবাসা কম হয়। কারণ, যতোক্ষণ না তা আদায় করা হয় ততোক্ষণ মিল হয় না। তারা দেয়া আবশ্যক মনে করে। এজন্য এমন প্রথা বন্ধ করা প্রয়োজন।
[মালফুজাতে আশরাফিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ২০৮ ও হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৩১৮]

উপহার দেয়ার সঠিকপদ্ধতি

যদি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয় এবং কিছু দিতে হয় তা প্রচলিত পদ্ধতিতে না দিলে কোনো সমস্যা নেই। যদি বিয়ের সময় না দেয় সময় পরিবর্তন করে, যখন কারো আশাই থাকবে না তখন দিতে পারে। বিনা আশায় যদি দুই টাকাও পায় তখন অনেক খুশি হয়। ভালোবাসা বাড়ে। আন্তরিকভাবে খুশি হয়। প্রাণে শিহরণ জাগে। যদি প্রথাগত কারণে দেয় তাহলে কেবল অপেক্ষার কষ্ট শেষ হয়। যেনো শাস্তি থেকে মুক্তি পেলো, জাহান্নাম থেকে রেহাই পেলো। কিন্তু জান্নাত প্রাপ্তি হয়নি। অর্থাৎ গালমন্দ ও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পেলো বটে কিন্তু খুশি হয়নি।

[মালফুজাতে আশরাফিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ২০১ ও ২১০]

এখন উচিত প্রচলিত উপহারপদ্ধতি ত্যাগ করা। আর পাঠকের দায়িত্ব হলো, এখন থেকে যাকে উপহার দেয়া হবে তা কোনো সময়ের অপেক্ষা ছাড়া দেয়া।

[জামিউত তাবলিগঃ খণ্ডঃ ১৫, পৃষ্ঠাঃ ৯১]

বিয়ের সময় বিয়ের খরচ দেয়া

বিয়ে বা অন্যান্য আয়োজনের সময় ছেলে বা মেয়ের পক্ষ থেকে খরচ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে একজন বড়ো আলেম আপত্তি করে বলেন, যদি সন্তুষ্টচিত্তে দেয়া হয় তাহলে তা জায়েজ হবে। মানুষ যা করে তাতে সমস্য কোথায় যে, তাদেরকে সাধারণভাবে নিষেধ করা হবে?

উত্তরে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এ ব্যাপারে কথা আছে যে, মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে দেয় না, লোকচক্ষুর ভয়ে দেয়। আমি কাউকে কিছু দিলাম কিন্তু মনে একটা চাপ থাকলো তাহলে সন্তুষ্টি কোথায় থাকলো?

কন্যাদানের সময় বিয়ের খরচ নেয়া

অনেক ভদ্রমানুষ একটি ভুল করেন। স্বামী বিয়ে বা কন্যাদানের সময় মেয়েপক্ষ থেকে কিছু টাকায় আদায় করেন বিয়ের মধ্যে খরচ করার জন্যে। এটা ঘুষ। সম্পূর্ণ হারাম। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৮]

কন্যাদানের সময় প্রদেয় জিনিসের বিধান

লোকচক্ষুর ভয়ে বা প্রথাগত কারণে দেয়া জিনিস নেয়া বৈধ নয়। বায়হাকিশরিফ ও দারাকুতনিতে উল্লেখ আছে,

أَلَا لَا تَظْلِمُوْا أَلَا لَا تَظْلِمُوْا أَلَا لَا تَظْلِمُوْا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"সাবধান! তোমরা অবিচার করো না। সাবধান! তোমরা অবিচার করো না। সাবধান! তোমরা অবিচার করো না। নিশ্চয় কোনো মানুষের সম্পদ তার আন্তরিক অনুমতি ছাড়া বৈধ হয় না।"

অনেকে ভুল করেন যে, আমাদের কী করার আছে। দোষই বা কী; যে দেবে সন্তুষ্টির সঙ্গে দেবে। কিন্তু বাস্তবতা তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে। অবস্থা বুঝা যায় দাতাদের দেখে। তৃতীয় এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে সম্পর্ক খোলামেলা রয়েছে সে তাকে শপথ করে জিজ্ঞেস করুক, তুমি কি সন্তুষ্টির সঙ্গে দিয়েছো না-কি অসন্তুষ্টির সঙ্গে? খুব সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। একই উত্তর পাওয়া যাবে, বিয়ের সময় মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষ থেকে অথবা ছেলেপক্ষ মেয়েপক্ষ থেকে যা আদায় করে তার ব্যাপারে। অর্থ হোক বা জিনিসপত্র। চেয়ে দিক বা প্রথাগত কারণে দিক অথবা চক্ষুলজ্জার ভয়ে দিক। অনেকে না চাইলেও দেয়। কিন্তু দেয়ার ভিত্তি ওই প্রথা-প্রচলনই। তারা জানে, না দিলে হয়তো চাইবে। অথবা বদনাম করবে। এমন অর্থ ও জিনিসপত্র হালাল নয়। এমনিভাবে তা চাওয়া এবং দেয়া বৈধ নয়। এমন অর্থ ও আসবাবপত্র ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

[হুকুকুল ইলমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮]

বিয়ের সময় কেউ যদি মেয়ের বিনিময়ে টাকা নেয়া তা হারাম। কেননা ইসলামিশরিয়ত মেয়েকে অমূল্য সম্পদ মনে করে। যার কোনো মূল্য হতে পারে না। [আততাবলিগঃ খণ্ডঃ ১০, পৃষ্ঠাঃ ৫৭]

বিয়ে ও বরযাত্রী

অধ্যায় । ১৪ ।
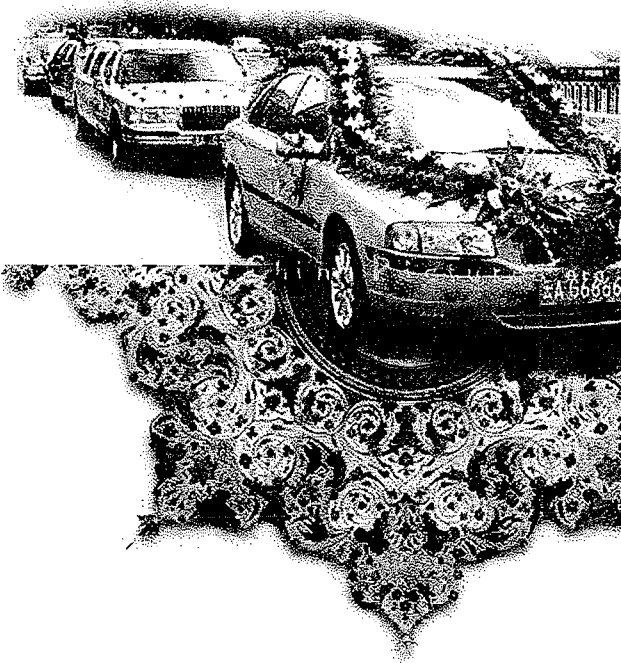
বরযাত্রী হিন্দুয়ানিপ্রথা

বরযাত্রী হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উদ্ভাবিত প্রথা। অতীতে মানুষের নিরাপত্তা ছিলো না। অধিকাংশ ছিনতাইকারী ও ডাকাতের হাতে সর্বস্ব হারাতো। এজন্য বর-কনে, অলঙ্কার ও জিনিসপত্রের নিরাপত্তার জন্য একদল মানুষের প্রয়োজন ছিলো। নিরাপত্তার কারণে বরযাত্রীর উদ্ভব হয়েছে। এজন্য প্রত্যেকঘর থেকে একজন মানুষ নেয়া হতো। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে যেনো একঘর থেকে একজন বিধবা হয়। এখন মানুষ নিরাপদ সুতরাং একদল মানুষের কী প্রয়োজন? এখানে নিরাপত্তার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল প্রথাপূজা ও নাম কামানো উদ্দেশ্য। [আজলুল জাহিলিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৬৭ ও ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬২]

বরযাত্রীর কোনো প্রয়োজন নেই

প্রিয়পাঠক! এসব প্রথা মুসলমানকে ধ্বংস করে ছাড়ছে। এজন্য আমি বদনামের নাম ছোটো কেয়ামত এবং বিয়ে ও বরযাত্রীর নাম বড়ো কেয়ামত রেখেছি।

বর্তমানে বরযাত্রীকে বিয়ের অপরিহার্য অংশ মনে করা হয়। যা ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। এ নিয়ে ছেলেপক্ষ আবার কখনো মেয়েপক্ষ বড়ো ধরনের জেদাজেদি ও মনোমালিন্যে লিপ্ত হয়। যার উদ্দেশ্য কেবল সুনাম ও সুখ্যাতি। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে দেন। বিয়ে ঠিক করার সময় হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিয়ের সময় হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] নিজেই উপস্থিত ছিলেন না। বিয়ে হয় ঝুলন্ত। সেখানে বলা হয় إِنْ رَضِيَ عَلِيٌّ 'যদি আলি রাজি থাকে।' তিনি যখন উপস্থিত হন তখন বলেন, 'আমি সন্তুষ্ট' তখন পূর্ণতালাভ করে। আমার উদ্দেশ্য এটা না যে, ঘটনা শুনে বর ভেগে যাবে। কিছু মানুষ এমনটি বুঝতে পারে। উদ্দেশ্য হলো, বরযাত্রী ইত্যাদি প্রথা নিয়ে বাড়াবাড়ি দরকার নেই। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] নিজে বরের উপস্থিতি আবশ্যক মনে করেননি। সেখানে বরযাত্রীর কেনো আবশ্যক মনে করা হবে?

[আজলুল জাহিলিয়্যাহ: পৃষ্ঠা: ৩৬৬ ও ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬২]

বরযাত্রীর কিছু কুফল

বরযাত্রী অনৈক্য ও অপমানের কারণ

বর্তমানে বরযাত্রী কেন্দ্র করে কখনো ছেলেপক্ষ আবার কখনো মেয়েপক্ষ তুমুল জেদাজেদি ও মনোমালিন্যে লিপ্ত হয়। যার উদ্দেশ্য কেবল সুনাম ও সুখ্যাতি। অধিকাংশ সময় দেখা যায় দাওয়াত দেয়া হয়েছে পঞ্চাশজন যায় একশোজন।

প্রথমত বিনা দাওয়াতে কারো বাড়ি যাওয়াই হারাম। হাদিসশরিফে বলা হয়েছে, 'যেব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া গেলো সে গেলো চোর হয়ে। আর ফিরলো ডাকাত হয়ে। অর্থাৎ চুরি-ডাকাতির মতো সে গোনাহ করে।
দ্বিতীয়ত এতে একজন মানুষকে লজ্জিত করা হয়। আর কাউকে লজ্জিত করা গোনাহের কাজ। তাছাড়া এর কারণে উভয়পক্ষের মধ্যে এমন জেদাজেদি ও মনোমালিন্য হয় যা সারাজীবন মনে লেগে থাকে। যেহেতু অনৈক্য হারাম তাই যা তার কারণ হয় তা-ও হারাম। সুতরাং এমন অপ্রয়োজনীয় প্রথা পরিহার করা উচিত। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬৩]
এখন বরযাত্রীপ্রথার কারণে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার–যা বিয়ের মূল উদ্দেশ্য, তার পরিবর্তে অধিকাংশ সময় মনোকষ্ট, মনোমালিন্য ও পরস্পর অভিযোগের সৃষ্টি হয়। বরং পুরনো শত্রুতা জাগ্রত হয়। আপনজনের দুর্নাম করা ও তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। এমনিভাবে অন্যান্য কুফল দেখা দেয়। যেহেতু এভাবে নেয়া এবং খাওয়ানো আবশ্যক মনে করা হয় তাই কোনো আনন্দই হয় না। কেননা তারা আন্তরিকতাহীন একটি ঋণ পরিশোধ করে। না আনন্দ হয় গ্রহীতাদের, না দাওয়াতিদের। কেননা গ্রহীতারা তা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার মনে করে। যা তারা একসময় দিয়েছিলো। তাহলে আর আন্তরিকতা থাকলো কোথায়? এজন্য সবধরনের নবসৃষ্ট ফেতনা উচ্ছেদ করা ওয়াজিব। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮৮]

আমি বরযাত্রীপ্রথাকে হারাম মনে করি

আমার মনে হয়, বর্তমানে যেসব কারণে বরযাত্রীকে নিষেধ করা হয় বরযাত্রীর সূচনাকালে তা ছিলো না। বর্তমানে আমি এই প্রথাকে সম্পূর্ণ হারাম মরে করি। যদি কারো বুঝে না আসে তাহলে ইসলাহুর রুসুমের [২য় অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ এবং ইমদাদুল ফতোয়ার পঞ্চম খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠা] দেখে নেবে। সেখানে আমি বিস্তারিত প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি। আল্লাহ আমার কলম দিয়ে কিছু বিষয়ের অনিষ্টতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। যা অন্যরা করেনি। এজন্য লোকেরা আমাকে কঠোর হিসেবে জানে।

[আজলুল জাহিলিয়্যাহ ও হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৬৮]

বিয়ে, বরযাত্রীতে যাতায়াত না হলে আন্তরিকতা হবে কী করে

অনেকে বলেন, যদি প্রথা-প্রচলন থেমে যায় তাহলে মিল-মহব্বতের উপায় কি হবে? তার উত্তরে বলবো, মিল-মহব্বতের জন্য গুনাহে লিপ্ত হওয়া কোনোভাবেই জায়েজ নয়। তাছাড়া মিল-মহব্বত এসব প্রথা-প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রথা-প্রচলন ছাড়া কেউ যদি কারো বাড়ি যায়, কাউকে বাড়িতে

দাওয়াত করে খাওয়ায়, সাহায্য-সহযোগিতা করে যেমনটি বন্ধুরা করে তাহলে মিল-মহব্বত হতে পারে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৭]

বরযাত্রী ও অন্যান্য প্রথা নাজায়েজ হওয়ার প্রমাণ

আমার মতে, সামগ্রিকভাবে বিয়ের সময় যা হয় সবকিছুতে আশু পরিবর্তন আবশ্যক। প্রত্যেকটি প্রথায় সম্পদ অপচয় এবং প্রদর্শনপ্রিয়তা, অহঙ্কার, অন্যকে কষ্ট দেয়া ও পাপের অনুগামী হওয়ার মতো গোনাহের কারণ। জাগতিক বিচারেও যার গ্রহণযোগ্য কোনো উপকার নেই। আমার দৃষ্টিতে এখানে মন্দের ভাগটাই ভারী। আমার মতামতের সারকথা হলো, [সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে] প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। যদিও পৃথকভাবে চিন্তা করলে অধিকাংশ জিনিস মোবাহ [এমন কাজ যা করা বৈধ। তবে বিনিময়ে পাপ-পুণ্যের কোনো হিসাব নেই] প্রমাণিত হবে।

কিন্তু শরিয়তের বিধান ও যুক্তির দাবি হলো, যে মোবাহকাজ পাপের কারণ এবং অন্যায়ের সহায়ক হয় তখন তা-ও পাপ ও অন্যায় হিসেবে গণ্য হয়। বিয়ে উপলক্ষে কি মুসলমান ঋণগ্রস্থ হচ্ছে না? তারা কি মহাজনদেরকে সুদ দেয় না? তাদের জায়গা-জমি নিলাম হয় না? বিয়েতে উভয়পক্ষের মনে কি অহঙ্কার, আত্মগরিমা ও প্রদর্শনের ইচ্ছা থাকে না? যদিও সাধারণ সভায় প্রকাশ না করা হয় তবুও কি বিশেষ মহলের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র দেয়া হয় না যে, ঘরে গিয়ে অলঙ্কার ও আসবাবপত্র দেখানো হবে এবং এর মূল্য অনুমান করা হবে? এসব প্রথায় পরম্পরতার বিষয়টি এমন যে, একজন করলে ধীরে ধীরে সবার জন্য করা আবশ্যক হয়ে যায়। এসব রীতি-নীতিকে কি শরিয়তের বিধান থেকে বেশি পালনীয় মনে করা হয় না? নামাজের জামাত ছুটে গেলে কি কেউ এতোটা লজ্জিত হয় যৌতুকে খাট-পালঙ্ক দিতে না পারলে যতোটা হয়? কেমন যেনো তার কোনো প্রয়োজন নেই। উপহার হিসেবে প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতিগুরুত্ব দেয়া শরিয়ত ও যুক্তির আলোকে মন্দ নয় কিন্তু এটাতো নিশ্চিত এক এক স্থানে প্রয়োজন ভিন্ন হবে। যখন সবজায়গায় একই জিনিস দেয়া হয় তখন স্পষ্ট হয়ে যায় প্রথা-প্রচলনই এখানে মুখ্য। প্রয়োজনের কোনো ভিত্তি নেই। এমনভাবে প্রথা পালন করা যুক্তির আলোকেও অগ্রাহ্য এবং শরিয়তের দৃষ্টিতেও অবৈধ। সুতরাং যাতে এতো অকল্যাণ নিহিত বিবেক ও শরিয়ত তার অনুমতি কীভাবে দিতে পারে? [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ২৭৯]

সম্পদশালী ব্যক্তির জন্যও বরযাত্রী বৈধ নয়

অনেকে বলেন, যার সামর্থ আছে সে করবে। যার সামর্থ নেই সে করবে না। প্রথমে তার উত্তরে বলবো, সামর্থবানের জন্যও গোনাহ করা বৈধ নয়। যখন প্রথাটি গোনাহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে তখন তা করার অনুমতি কীভাবে হতে পারে?

দ্বিতীয়ত যখন সামর্থ্যবান করবে তখন তার আত্মীয়-স্বজনও নিজেদের মান-সম্মান রক্ষার্থে অবশ্যই এমনটি করবে। এজন্য প্রয়োজন হলো, সবাই তা পরিহার করবে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৭]

যদি বলা হয়, সামর্থ হলে ওপর্যুক্ত ধর্মীয় ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে এবং নিয়তের শুদ্ধতা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন। আমরা এসব বিষয়কে আবশ্যক মনে করি না। অহংকার ও প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য বিষয়টি বৈধ হওয়া চাই।

কিন্তু বিষয়টি মানা যায় না। অভিজ্ঞতাও তা সমর্থন করে না। তার সামর্থ যেমনই থাকুক কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা তার থাকে। নিয়তেও সমস্যা হয়। কিন্তু আমরা যদি বিতর্ক পরিহার করি তাহলে এমন দু-একজন ব্যক্তি অনেক কষ্টে বের হতে পারে।

আর অবস্থা যখন এমন তখন একটি বিধান স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন কারো কোনো অনাবশ্যক বৈধকাজ অন্যের জন্যে আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, ধারণা বা বিশ্বাসগত দিক থেকে তখন তা আর বৈধ থাকে না। এ নিয়ম অনুসারে এমন কাজগুলো এই বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারীর জন্যও অবৈধ হবে। কেননা অন্যান্য ব্যক্তিরা তার অনুসরণ করতে গিয়ে পাপে লিপ্ত হবে।

বংশীয় সহমর্মিতা

ওপর্যুক্ত শরয়িবিধানের মূলকথা হলো, বংশীয় সহমর্মিতা। যার দাবি হলো, পারলে কারো উপকার করো, নয়তো কারো ক্ষতি করো না। কোনো পিতা–যার সন্তানের জন্য মিষ্টি ক্ষতিকর, সে কি তার সন্তানের সামনে মিষ্টি খাওয়া পছন্দ করবে? তার কি একবারও মনে হবে না, আমার লোভের কারণে ছেলেও খেতে পারে! তাতে তার অসুখ বেড়ে যাবে। এমনিভাবে সব মুসলমানের প্রতি সহমর্মিতা কী প্রয়োজন নয়? সুতরাং শরিয়ত ও যুক্তির আলোকে প্রমাণিত হলো, কোনো ব্যক্তির জন্যই এসব করা জায়েজ নয়।

যেহেতু এসব বিষয়ের কুফল স্পষ্ট তাই সে প্রমাণাদির দরকার নেই। মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইমান ও বিবেকের দাবি হলো, যখন এসব বিষয়ের কুফল প্রমাণিত হয়েছে তখন তা বিদায় জানানো। সুনাম ও বদনামের দিকে না তাকানো। বরং অভিজ্ঞতার দাবি হলো, আল্লাহর আনুগত্যের মাঝেই সম্মান ও সুনাম রয়েছে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৭]

বরযাত্রী পাপের আকর

অধিকাংশ বিয়েতে যেসব শরিয়তবিরোধী প্রথা পালন করা হয় তা পাপের আকরে পরিণত হয়। সেসব বিয়েতে অংশগ্রহণ করবে না, আর প্রথাতো দূরের কথা। আজকাল বরযাত্রীই পাপের মূলে পরিণত হয়েছে। যদি অন্যকোনো গোনাহ না-ও হয় তবুও এই গোনাহটা অবশ্যই হয় যে, দাওয়াতপ্রাপ্ত লোকদের চেয়ে মানুষ বেশি যায়। যার কারণে মেজবান বেচারা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। দুশ্চিন্তা করে। ঋণ নেয়। ইত্যাদি অনেক কুফল রয়েছে।

[হুকুক ও ফারায়েজ: পৃষ্ঠা: ৪৯৯]

মেয়ের বাড়ির অনুষ্ঠান

ভাই মুন্সি আকবর আলির এক মেয়ের অনুষ্ঠানে আমি শুধু এজন্য অংশ নেইনি যে, তাদের পরিবারের লোকেরা অনুষ্ঠানের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলো। এরপর তিনি আমাকে বলেন, আমরা অনুষ্ঠান করবো না। আমি বললাম, এতে আপনাদের অসম্মান হবে। অপরপক্ষ মনে কষ্ট পাবে। কেননা তাদেরকে আগেই দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তারা অত্যন্ত সন্তুষ্টির সঙ্গে আমার অনুপস্থিতি মেনে নেন। বলেন, আপনি দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন মহান ব্যক্তি। আমরা দীনের ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি করতে চাই না। [হুসনুল আজিজ: পৃষ্ঠা: ৩৪৩]

বর্তমান সময়ের বিয়ে পরিহার করা উচিত

যদি বিয়েতে আর কোনো প্রথা পালন না-ও করা হয় তবুও এতোটুকু হয় যে, যার খেলাম তাকে খাওয়াতে হবে। আর সবপ্রথার মূলকথাই এটা। তাই যথাসম্ভব তা পরিহার করা উত্তম। তবে কারো মনে কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। তাই কৌশল অবলম্বন করা উচিত। যদি কোনো প্রিয়জনের প্রতি উপকার করতে হয়, তা প্রথাগতভাবে না হলেও সমস্যা নেই। নিজে সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হয়। পরেও দেয়া যায়। [মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৩১]

শরিয়তের প্রমাণ

একটি হাদিসে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি এসেছে। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এমন দুইব্যক্তির খাবার খেতে নিষেধ করেছেন যারা পরস্পর অহংকার করার জন্য খাবার খাওয়ায়। একথা স্পষ্ট নিষেধের কারণ, অহংকার ও প্রদর্শন ছাড়া কিছুই না।

সুতরাং এমন সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা নিষেধ হবে যার উদ্দেশ্য অহংকার ও প্রদর্শন উদ্দেশ্য। [আসবাবে গাফলাহ: দীন ও দুনিয়া: পৃষ্ঠা: ৪৮৪]

অনুসরণীয় ব্যক্তি ও আলেমদের উচিত প্রথাসর্বস্ব বিয়ে পরিহার করা

আমার বৈপিত্রীয় বোনের বিয়েতে প্রচলিত সবপ্রথা পালন করা হয়। ঘটনা হলো, তার মাকে মহিলারা প্ররোচিত করে। বলে, তোমার একটাই তো মেয়ে। দিল উজার করে বিয়ে দাও। যদিও এই ভয় আছে, সে অর্থাৎ আমি বিয়েতে অংশগ্রহণ করবে না তবুও অংশগ্রহণ হয়ে যাবে। সে যেসব প্রথাকে খারাপ বলে তাতে অংশগ্রহণ করবে না। বিয়ে সুন্নত। সেখানে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে। আম্মা বেচারি তাদের কথায় প্ররোচিত হন। বরযাত্রী আসার দিন শুক্রবার ছিলো। আমি জামে মসজিদে জুমা পড়ে সোজা ভিসানিপুর চলে যাই। এখানের কাউকে কিছু বলি না। এমনকি ঘরের মানুষেরও কোনো খবর নেই। মাগরিবের পর বিয়ের সময় হলে বিয়ে পড়ানোর জন্য খোঁজা হয়। আমাকে পায় না। সকালে সেখানে থাকি। সকাল কাটিয়ে রওয়ানা হই। যাতে কোনো একটা মন্দ জিনিসের মুখোমুখি না হয়।

আমার অংশগ্রহণ না করার কারণে পুরো বংশ তওবা করে। তারা স্বীকার করে বড়ো খারাপকাজ হয়েছে। এখন আর এমনটি করবে না। আল্লাহর রহমতে এরপর থেকে বংশে আর কোনো প্রথার পালন হয়নি।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২]

অধ্যায় ।১৫।

বিয়ের কিছু নিষিদ্ধকাজ
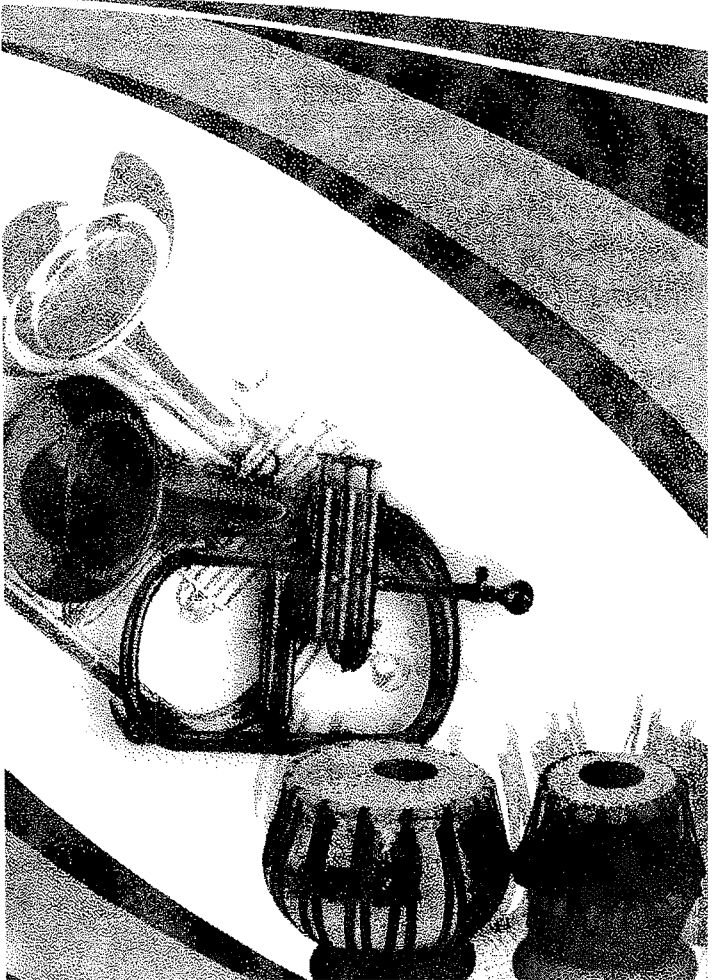
বিয়ে উপলক্ষে নাচ-গান করা

বিয়েতে দুই ধরনের নাচ হয়। এক. নর্তকীদের নাচ ও অন্যান্যদের নাচ এবং দুই. মহিলাদের বিশেষ অঙ্গনের নাচ। দুই নাচই নাজায়েজ ও হারাম।

নর্তকীর নাচে যে পাপ ও অকল্যাণ তা সবাই জানে। যাদেরকে দেখা হারাম এমন নারীদের সব পুরুষ দেখে; চোখের ব্যভিচার হয়। তার কথা ও গান শুনে। কানের ব্যভিচার হয়। তার সঙ্গে কথা বলে; মুখের ব্যভিচার হয়। তার প্রতি মন আকর্ষিত হয়; অন্তরের ব্যভিচর হয়। যারা আরো বেশি নির্লজ্জ তারা শরীরে হাত দেয়; হাতের ব্যভিাচার হয়। তাকে দেখার জন্য হাঁটে; পায়ের ব্যভিচার হয়। হাদিসশরিফে এসেছে, ব্যভিচারে যেমন গোনাহ্ ঠিক একই পরিমাণ গোনাহ্ কানে শোনা, চোখে দেখা ও পায়ে চলা ইত্যাদিতে। আর প্রকাশ্য পাপাচার শরিয়তের দৃষ্টিতে আরো জঘন্য ধরনের পাপ।

হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে, যার মূলকথা হলো, যখন কোনো জাতি বা গোষ্ঠিতে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা প্রকাশ্য রূপলাভ করে তখন অবশ্যই তাদের মধ্যে প্লেগ ও এমন রোগ ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কখনো হয়নি।

এখন থাকলো যে নাচ মহিলাদের বিশেষ অঙ্গনে হয়। তা হলো, একজন মহিলা নাচে। নাভি ও কোমর দুলিয়ে তামাশা করে। কেউ কেউ নাচনেওয়ালির মাথায় টুপি পড়িয়ে দেয়। সবকিছু যেকোনো বিবেচনায় নাজায়েজ। চাই তারা ঢোল-তবলা ইত্যাদি বাজনা ব্যবহার করুক বা না করুক। কিতাবে বাদরের নাচ পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে মানুষের নাচ কীভাবে নিন্দনীয় হবে না? কখনো ঘরের পুরুষরাও দেখে ফেলে। নাচনেওয়ালি গানও গায়। ঘরের বাইরের পুরুষদের কানে তা যায়। আর পুরুষের জন্য যখন মহিলাদের গান শোনা গোনাহ্ তখন যারা তার গোনাহের মাধ্যম হবে তারাও গোনাহের অংশীদার হবে। যেহেতু অধিকাংশ সময় প্রেমময় গানের মিষ্টিকণ্ঠের যুবতী গায়িকাদের আনা হয় এবং বেশিরভাগ সময় পুরুষ তাদের কণ্ঠ শুনতে পায় তাই মহিলারা গোনাহের মাধ্যম বিবেচিত হবে।

অনেক সময় প্রেমময় গানের কথাগুলো অন্তরে এমন মন্দপ্রভাব ফেলে যে, তাদের স্বামীর অন্তর নর্তকির প্রতি ঝুঁকে যায়। স্ত্রীর প্রতি মন থাকে না। যা সারাজীবনের

কান্নার কারণ হয়। অনেক সময় রাতভর অনুষ্ঠান হয়। এতে অনেক মহিলার নামাজ ছুটে যায়। এজন্য এটা নিষিদ্ধ। মোটকথা, বর্তমানে যতোপ্রকার নাচ-গান হয় সব গোনাহের কাজ। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৬]

আতশবাজি

বিয়ে উপলক্ষে বোম ও পটকা ফাটানো, আতশবাজি করাতে কয়েকটি গোনাহ।
এক. অর্থের অপচয়। কোরআনশরিফে সম্পদ অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।
দুই. একটি আয়াতে বলা হয়েছে, সম্পদ অপচয়কারীকে আল্লাহ চান না। অর্থাৎ অসন্তুষ্ট হন।
তিন. হাত-পা পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ঘরে আগুন লাগার ভয় থাকে। আর নিজের জীবন ও সম্পদ হুমকির মুখে ফেলা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দার কাজ।
চার. অধিকাংশ সময় লেখাবিশিষ্ট কাগজ আতশবাজির জন্য ব্যবহৃত হয়। অক্ষর সম্মানের বিষয়। তা এমন কাজে ব্যবহার করা নিষেধ; বরং অনেক কাগজে কোরআনের আয়াত, হাদিস ও নবি [আলায়হিমুস সালাম]-এর নাম থাকে। এখন বলুন, তাদের সঙ্গে বেয়াদবি করা কতোটা ভয়ংকর!

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৬]

ছবি উঠানো

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ

"সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে।"

[বোখারি]

আরো বলেন,
"আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে ছবিপ্রস্তুতকারী।"
ওপর্যুক্ত হাদিসদ্বয়ের মাধ্যমে ছবি তোলা ও কাছে রাখা দুই-ই হারাম প্রমাণিত হয়। এজন্য ছবি উঠানো বা রাখা থেকে বাঁচা উচিত।

[বেহেশতি জেওর: পৃষ্ঠা: ৩২৫]

বিশুদ্ধহাদিস দ্বারা প্রমাণিত, ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা দুই-ই হারাম। ছবি অপসারণ করা, নষ্ট করা এবং ধ্বংস করা ওয়াজিব। এজন্য ছবি তোলা বড়ো ধরনের পাপ। ছবি তোলা বা ফটোগ্রাফারের চাকরি করা নাজায়েজ।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫৪-২৫৮]

ইসলামিশরিয়তের আলোকে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা সাধারণভাবেই গোনাহ। চাই যার ছবিই তোলা হোক না কেনো। শরীরবিশিষ্ট হোক বা না হোক। আয়নার সঙ্গে তুলনা করা–ছবি আয়নার প্রতিবিম্বের প্রতিলিপি; আর আয়না দেখা যেহেতু জায়েজ তাই ছবি তোলাও জায়েজ– এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এটা বৈসাদৃশ্য তুলনা। আয়নার মধ্যে কোনো চিহ্ন বাকি থাকে না। সামনে থেকে সরানোর পর প্রতিবিম্ব চলে যায়। কিন্তু ছবি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া কারিগরি কারণেও ছবিতে সম্পূর্ণ হাতে আঁকা ছবির বিধান কার্যকর হবে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৫৪-২৫৮]

বিয়ের ভিডিও করা

আফসোস! আজ এমন দুঃসময় যাচ্ছে, সমাজে অদ্ভুত সব সংস্কার দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে যখন নিজের ভাইয়ের হাতে দুশ্চিন্তার উপকরণগুলো বিদ্যমান। ফিল্ম কোম্পানি অর্থহীন বিনোদন মাধ্যম হওয়া প্রমাণিত। আর অর্থহীন ক্রিয়া-কৌতুক ও বিনোদনকে ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে টেনে আনা ধর্মের অপমান ও খাটো করার শামিল। হাদিসশরিফে একজন গায়িকা বালিকাকে فِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ 'আমাদের মধ্যে নবি বিদ্যমান। যিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন'– বলতে নিষেধ করেছেন। যদিও কিছু বিশ্লেষক এখানে অন্যসম্ভাবনার কথা বলেছেন কিন্তু ধর্মের অপমানের কথা অস্বীকার করেননি। কারণ ধর্মের অপমান হয় এমন কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার ওপর উম্মতের ইজমা বা ঐক্য সংগঠিত হয়েছে; যদি এখানে অকাট্যভাবে প্রমাণিত না-ও হয়।

ভিডিওতে ছবি থাকে, মানুষ তা উপভোগ করে। ছবি তোলা পাপ ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। চাই তা পুণ্যবান ভালোমানুষের ছবি হোক না কেনো। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বায়তুল্লাহশরিফে থাকা হজরত ইবরাহিম ও হজরত ইসমাইল [আলায়হিমাস সালাম]-এর ছবির সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন তা কারো অজানা নয়। তিনি তা ধ্বংস ও বিলীন করে দেন।

মুসলমানের ছবি তোলা আরো বেশি গোনাহের। কারণ, সে বিশ্বাস করে ছবি তোলা পাপ। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৮৬]

কোনো অপছন্দনীয় বিষয় সম্পৃক্ত না হয় এবং নিছক আনন্দ উপভোগ উদ্দেশ্য হয় তবুও ছবি তোলা ও ভিডিও করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা কোনো জিনিস দেখে স্বাদ নেয়া বা উপভোগ করাও

ইসলামিশরিয়তে হারাম। আর ছবির কোনো দোষ-ক্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করা হলে তা হবে অন্যআরেকটি পাপ। তখন পরনিন্দা হবে। ইসলামিশরিয়তে আঁকা ও লেখার মাধ্যমে দোষবর্ণনা করাও পরনিন্দার শামিল। এমনিভাবে কারো বিকৃত ও ক্রুটিযুক্ত ছবি আঁকা, বরং এটা আরো বেশি মারাত্মক।

বিশেষ কোনো ভঙ্গিতে ছবি তোলা ব্যক্তির প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ– যেমন, কোনো নারীর ছবি পর্দা ছাড়া প্রকাশ করা। এখন ছবিটি যদি কোনো আকর্ষণীয় যুবতী মেয়ের হয় তাহলে কুদৃষ্টির গোনাহও হবে। ছবি মানুষের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। আর অপরিচিত মেয়ের কাপড় নোংরা মানসিকতার সঙ্গে দেখাও হারাম। বিশেষ করে যখন অমুসলিমদেরকে মুসলিমনারীর প্রতি তাকানোর সুযোগ করে দেয়া হয়।

যদিও ভিডিওতে বাজনা-বাদ্য যোগ করা হয় অথবা অপরিচিত নারীর গান থাকে তাহলে তা শোনাও হারাম হবে। যখন ভিডিওফিল্ম তৈরির অনিষ্টতা ও পাপ সম্পর্কে জানা গেলো তখন প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব সাধ্য অনুযায়ী তা বন্ধের চেষ্টা করা এবং ফুর্তিবাজদেরকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা। যেনো আল্লাহর শাস্তি সবাইকে পেয়ে না বসে।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৪৩ ও ২৬০]

বিয়েতে ঢোল ও খঞ্জনি বাজানো

আমারো বিষয়টা খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয়নি। তাই প্রসিদ্ধ মতামতের ওপর ভিত্তি করে মনে করেছিলাম, বিয়েতে দফ [একপাশ খোলা ঢোল] বাজানো জায়েজ। অন্যান্য বাদ্য নাজায়েজ। কিন্তু কিছুদিন আগে চোখে একটা বিষয় পড়লো, তখন থেকে দফ বাজানোর বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়; এবং সতর্কতাস্বরূপ পরিহার করা এবং অন্যকে নিষেধ করার দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করি। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭৯]

বিয়ের সময় গান করা

বিয়েতে সংগীত বৈধ শুনে অধিকাংশ মানুষ নিঃসঙ্কোচে গায়িকা ভাড়া করে গান পরিবেশন করে। তাদের কণ্ঠ কি পরপুরুষের কানে পৌঁছে না? বিয়ে হারাম এমন নারীর কণ্ঠ পরপুরুষের কানে যাওয়া এবং এভাবে গান শোনা কি হারাম নয়? এরপর সেই গানের সুরের এমন বৈশিষ্ট্য যে, আমাদের মনের নোংরামি ও মন্দ অবস্থাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। আর মন্দ অবস্থা বাড়িয়ে দেয়া হারাম নয় কি? এরপর প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এমনকি কোথাও সারারাত ঢোল বাজে। যাতে সাধারণত আশপাশের বাড়ি-ঘরের মানুষের ঘুম নষ্ট হয়। সকালবেলা সবাই

মুর্দার মতো পড়ে থাকে। ফজরের নামাজ কাজা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, নামাজ কাজা করা এবং যার জন্য নামাজ কাজা হয় তা হারাম কী-না?
কোথাও কোথাও গানের কথাও শরিয়তবিরোধী হয়। তা গাওয়া ও শোনা উভয় দ্বারা গোনাহ্ হয়। এমন গান গাওয়া ও গাওয়ানো হারাম কী-না? যখন তা হারাম হবে তখন তার পারিশ্রমিক নেয়া-দেয়া কীভাবে জায়েজ হবে? আর পারিশ্রমিক কীভাবে নেয়া হয়? মেজবানতো দেয় তাদের অনুষ্ঠানে তাকে ডেকে এনেছে বলে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নোংরামি হলো, সে জোর করে আরো উপরি কিছু আদায় করে নিয়ে যায়। যারা দেয় না তাদেরকে অপমান করে। তাদের সমালোচনা ও কুৎসা রটায়। এমন গান গাওয়া ও এমন অধিকার কেনো হারাম বলা হবে না? [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৭৩]

গানের নির্দেশ দেয়া

কিছু মানুষ যারা বিয়ের সময় গানের উপকরণ জোগাড় করে এবং তার ব্যবস্থা করে, অন্যদেরকে তার প্রতি ডাকে– তাদের কী পরিমাণ গোনাহ হয়; বরং অনুষ্ঠানে উপস্থিত যতো মানুষকে গোনাহের প্রতি ডাকা হয়। প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে যে পরিমাণ গোনাহ হয় তার একার সে পরিমাণ গোনাহ হবে। যেমন, অনুষ্ঠানে একশো মানুষ হলো তাদের প্রত্যেকের যে গোনাহ হবে অনুষ্ঠানের আয়োজকের একার একশোজনের গোনাহ হবে। বরং তার দেখাদেখি ভবিষ্যতে যতো মানুষ এমন অনুষ্ঠান করবে তার গোনাহও এই ব্যক্তির হবে। এমনকি মৃত্যুর পরও তার সূচিত কাজের গোনাহের ভাগ তার নামে জমা হবে।
আবার এসব অনুষ্ঠানে নির্দ্বিধায় বাজনা বাজায় যা আরেকটি গোনাহ্। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, "আমাকে আমার প্রভু বাজনা ধ্বংস করতে বলেছেন।"
ভাবার বিষয়, যে জিনিস ধ্বংস করার জন্য রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে নির্দেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করার গোনাহ কেমন মারাত্মক হবে? [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩২৪]

বিয়েতে ব্যান্ড বাজানো

কেমন আফসোস ও আক্ষেপের কথা! রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ আমাকে হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন সমগ্র পৃথিবী থেকে গান-বাজনা মিটিয়ে দিতে।' [আবুদাউদ]

তিনি আরো বলেন, 'আমার উম্মতের একটি দল শেষযুগে শূকর ও বাঁদর হয়ে যাবে।' সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কি মুসলমান হবে না অন্যজাতি?'
জবাবে রাসুল বলেন, "তারা সবাই মুসলমান হবে। তারা আল্লাহর একত্ববাদ ও আমার রেসালাতের সাক্ষী দেবে। রোজাও রাখবে। কিন্তু ক্রিয়া ও বিনোদনের মাধ্যম তথা বাজনা বাজাবে। গান শুনবে। মদপান করবে। হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হবে।" [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৯১]

যদি ছেলে বা মেয়েপক্ষ রাজি না হয়

অনেকে বলে, মেয়েপক্ষ মানছে না। অপারগ হয়ে করছি। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা– যদি মেয়েপক্ষ বলে, শাড়ি পরে তোমাকে নাচতে হবে তাহলে কি তুমি নাচবে? না-কি রাগে ক্ষোভে মারামারির জন্য প্রস্তুত হবে? মেয়ে পাওয়া না পাওয়ার কোনো তোয়াক্কা করবে না।
মুসলমানের দায়িত্ব হলো, শরিয়ত যে জিনিসকে হারাম করেছে তার প্রতি এই পরিমাণ ঘৃণা রাখা, যে পরিমাণ ঘৃণা নিজের স্বভাববিরোধী কোনো কাজ করার সময় হয়। যেমন, শাড়ি পরে নাচতে বললে বিয়ে হওয়া না হওয়ার তোয়াক্কা করা হয় না তেমনি শরিয়তবিরোধী কাজে স্পষ্ট উত্তর দেবে– বিয়ে করো আর নাই করো আমরা নাচ-গান হতে দেবো না। এমন বিয়েতে অংশগ্রহণ করাও উচিত নয়। [বেহেশতি জেওরঃ খণ্ডঃ ৬, পৃষ্ঠাঃ ৩২৫]

অধ্যায় । ১৬ ।
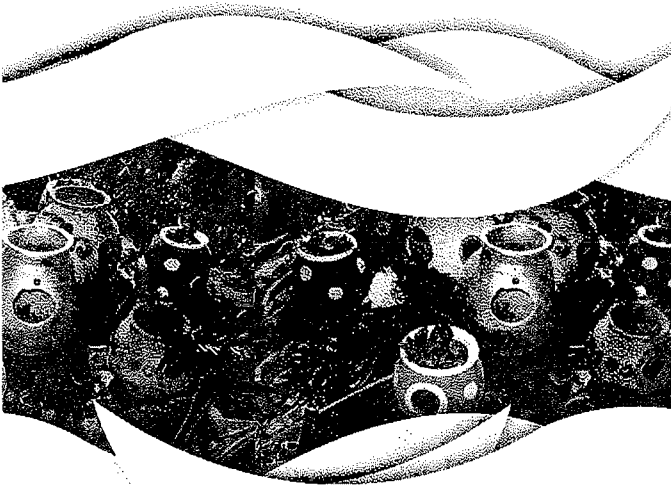
বিয়ের বিভিন্ন প্রথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথার পরিচয়

প্রথা শুধু বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে যা হয় তাকে বলে না বরং প্রত্যেক এমন অপ্রয়োজনীয় কাজ যা আবশ্যক নয় তাকে আবশ্যক করে নেয়াকে বলে। চাই অনুষ্ঠানে হোক বা দৈনন্দিন কাজে হোক।
[কামালাতে আশরাফিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৪৫ ও ইসলাহুল মুসলিমিনঃ পৃষ্ঠাঃ ৮২]

কোনটি প্রথা কোনটি প্রথা নয়

যখন কোনো কাজ প্রথার উদ্দেশ্যে হবে না এবং প্রথা অনুসারীদের মতো হবে না তখন তা প্রথা হিসেবে গণ্য হবে না– না বাস্তবে না আকৃতিতে। এটাই পার্থক্যের ভিত্তি। [ইসলাহুল মুসলিমিনঃ পৃষ্ঠাঃ ৮২]

প্রথা দুই প্রকার

প্রথা দুই প্রকার। **এক.** শিরক ও বেদাতের প্রথা। যেমন, বউকে মাদুরের ওপর বসিয়ে তার কোলে বাচ্চা দেয়া। এর দ্বারা সৌভাগ্যগ্রহণ করে যেনো বাচ্চা সৌভাগ্যশীল হয়। অধিকাংশ সময় এমন যাদু-মন্ত্র মিথ্যা প্রমাণিত হয়।
দুই. অহংকার ও আত্মপ্রদর্শনের প্রথা। দ্বিতীয় প্রকার প্রথা পরিহার করা হয়নি। বরং মানুষ সম্পদশালী হওয়ার কারণে তা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। আগে এতোটা আত্মগরিমা ও প্রদর্শনপ্রিয়তা ছিলো না। কারণ, তখন সম্পদ কম ছিলো। মানুষের প্রকৃতিতেও সরলতা ছিলো। এখন খাওয়া-দাওয়াও গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের মতো সাদাসিধে নেই। এখন পোলাও হয়, কাবাব হয়, কোপতা ও বোরহানি হয়। [ইসলাহুন নেসাঃ পৃষ্ঠাঃ ১৮৫]
একব্যক্তি আমাকে বলে, আল্লাহর শুকরিয়া, আগের তুলনায় এখন প্রথা ও রীতি কমে গেছে। আমি বলি, কখনো না। প্রথা দুই প্রকার। **এক.** যা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে যায় তা কমেছে এবং **দুই.** যার মূল অহংকার তা বেড়ে গেছে। আগে শিরকের আশ্চর্য আশ্চর্য প্রথা ছিলো। [মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৪৭]

রীতি ও প্রথা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত

আজকাল অনেক প্রথা আছে যার প্রতি কোনো খেয়াল নেই। ছাড়লে মন খারাপ হয়, এটা গোনাহ। সবচেয়ে মন্দ বিষয়, এমন গোনাহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো, প্রথাও রীতিতে পরিণত হয়েছে। কেননা মানুষের প্রকৃতি তাতে

অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তার মন্দত্ব মাথা থেকে দূর হয়ে যায়। যা পরিহারের কোনো আশাও থাকে না। মানুষ সেই জিনিসই পরিহার করে যা সে মন্দ জানে। আর যার সম্পর্কে ধারণা খারাপ থাকে না তা কেনো পরিহার করবে? এটা হলো সেই অবস্থা যাকে আত্মার মৃত্যু বলে। এরপর তওবার আর কী আশা থাকে? তওবার মূলকথা লজ্জিত হওয়া। মানুষ লজ্জিত হয় সেই কাজে যাকে সে মন্দ জানে। আর গোনাহ্ যখন অন্তরে এমন অবস্থান করে নেয় যে তা গর্বের বিষয়ে পরিণত হয় তখন লজ্জা কোথায় থাকে?

[মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৩৫]

এসব প্রথা এতোটা প্রচলিত হয়ে গেছে যে– যেমন, হলদি, মসলা ও লবণ ছাড়া তরকারি হয় না তেমনি এগুলো ছাড়া যেনো মানুষের জীবন অচল। যে মরিচ বেশি খায় তাকে যদি কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার বলে, মরিচ খেলে ক্ষতি হয় তাহলে তার মন তা মানে না। সে উত্তর দেয়, ডাক্তারি রাখেন। আপনার মাথা খারাপ। সারাজীবন খেলাম কোনো ক্ষতি হলো না আজ কী হবে? মরিচ ছাড়া তরকারির স্বাদই বা কোথায়?

এমনিভাবে মুসলমান অন্যজাতির সংশ্রবে এমন প্রথাপূজারী হয়েছে যে, তা ছাড়া বিয়ের স্বাদ পায় না। চাই বাড়ি বিরান হয়ে যাক না কেনো– প্রথা ছাড়া যাবে না। মূলকারণ হলো, তাকে আর গোনাহ ও পাপ হিসেবে বিশ্বাস করে না। যদি কোনো প্রথা পালন করা না হয়ে থাকে তাহলে মরার সময় তা পালনের অসিয়ত করে যায়। [মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪২৪]

বর্তমানের প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ

প্রথমে বুঝতে হবে, গোনাহ কী জিনিস। গোনাহের মূলকথা হলো, আল্লাহর বিধান পালন না করা। আপনি গোনাহের যে তালিকা করবেন তা শরিয়তের করা তালিকা থেকে অনেক ছোটো। এমন অনেক গোনাহ্ আছে যা আপনার দৃষ্টিতে প্রথাগত কারণে গোনাহ নয়। আমি বলি, শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি গোনাহ্ হলো গর্ব করা। যেকাজে তা পাওয়া যাবে তা নষ্ট করে ছাড়বে। খুব ভালো করে জেনে নিন, শরিয়তের তালিকায় এমন অনেক গোনাহ্ আছে যা প্রথা-প্রচলনের অংশ হয়ে গেছে। যার মধ্যে অহংকার, আত্মগরিমা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতায়ালা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

আরো বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহপাক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْكِبْرِ

"এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে এক অণুপরিমাণ অহংকার থাকে।"

অন্যহাদিসে এসেছে–

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ رَاْيَا رَاْيَا اللهُ بِهِ

"যেব্যক্তি খ্যাতির জন্য কোনো কাজ করবে আল্লাহ তাকে খ্যাতি দেবেন। যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য কোনো কাজ করবে আল্লাহ মানুষকে তা দেখাবেন।"

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যেব্যক্তি প্রদর্শন ও খ্যাতির জন্য কোনো পোশাক পরবে আল্লাহতায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।" [মোসনাদে আহমাদ]

এসব আয়াত ও হাদিস দ্বারা অহংকার ও অহমিকা, কৃত্রিমতা ও প্রদর্শনপ্রিয়তার মন্দত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এখন দেখার বিষয় হলো, প্রথা ও রীতির ভিত্তি এগুলোর ওপর কী-না।

আমার কাছে প্রমাণ আছে যার ভিত্তিতে আমি এসব প্রথা ও রীতিকে মন্দ বলি। তা হলো, শরিয়ত অহংকার ও দাম্ভিকতাকে গোনাহ বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং যেকাজে তা পাওয়া যাবে তা-ও গোনাহ বলে বিবেচিত হবে। এখন দেখার বিষয় হলো, অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রথা-প্রচলনের প্রধান অংশ কী- না। এটা এমন একটা অংশ যা অন্যসব অংশ যা বৈধ ছিলো তার বৈধতা নষ্ট করে দেয়।

যেমন, কাপড় পরিধান করা জায়েজ। কিন্তু যখন অহংকার এসে যায় তখন নাজায়েজ হয়ে যায়। খাবার খাওয়া জায়েজ। কিন্তু দাম্ভিকতা এসে গেলে নাজায়েজ। সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আত্মীয়-স্বজন কাউকে কিছু দেয়া খুব ভালো কাজ। কিন্তু দাম্ভিকতার সঙ্গে জায়েজ নয়। অহংকার বৈধ জিনিসকে এমনভাবে নোংরা করে ফেলে যেমন ময়লা কূপকে অনুপযোগী করে ফেলে। অথচ এই বিষয়টাকে আমরা কতো সহজ মনে করে রেখেছি। আমাদের তালিকা থেকে তার নামই বাদ দিয়েছি। চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রথা-প্রচলনের ভিত্তি ও মূলকথা অহংকার। এমনকি মেয়েকে যে উপহার দেয়া হয় তার ভিত্তিই অহংকার। মেয়েকে কলিজার টুকরো বলা হয়। সারাজীবন তার সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে যে, চুপে চুপে তাকে খাওয়ানো হতো। কেউ দেখুক এটাও পছন্দ করতো না; যেনো

নজর না লাগে। বিয়ের কথা উঠতে এমন কি উল্টে গেলো যে, প্রত্যেকটা জিনিস অনুষ্ঠানে দেখানো হয়। আসবাবপত্র, কাপড়-চোপর, সিন্দুক; এমনকি আয়না-চিরুনী পর্যন্ত দেখানো হয়। চিন্তা করলে তার কারণ কেবল অহংকার বের হবে। যাতে আত্মীয়-স্বজন বুঝতে পারে আমি এতো এতো দিয়েছি। এটা চিন্তা করে না যে, আমার মেয়ের কাছে জিনিসপত্র বেশি হবে। এজন্য উপহারের জিনিসগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যা বাহ্যিক চাকচিক্যে উজ্জ্বল এবং দামে হাল্কা হয়। বাজারে গিয়ে বলে, বিয়ের জিনিস কিনতে এসেছি। লেনদেনের জিনিস দেখাও। [মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৪১ ও ৪৪৮]

বিয়ের প্রথা নাজায়েজ হওয়ার প্রমাণ

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

"মদ ও জুয়া দ্বারা শয়তানের উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়া এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখা।"

আল্লাহতায়ালা এই আয়াতে মদ ও জুয়ার দুটি ক্ষতির কথা বলেছেন। একটি হলো, শয়তান এর মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় হলো, আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখে। এর দ্বারা বুঝে আসে, শত্রুতা ও বিদ্বেষ, নামাজ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখার মদ ও জুয়া হচ্ছে মাধ্যম। আর যতো জিনিস মাধ্যম হবে তার বিধান এমনটিই হবে। এজন্য রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

كُلُّ مَا أَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ

"যা-ই তোমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখবে তা-ই জুয়া।" [নাসবুর রায়াহ]

হাদিসশরিফে তাকেই জুয়া বলা হয়েছে যার মধ্যে একই কারণ পাওয়া যায়। আর স্পষ্ট যে-

نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

"রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মদ ও জুয়া থেকে বারণ করেছেন।"

এর কারণ اِلْهَاءُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ [আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা]। সুতরাং যা-ই নামাজ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখবে। তা-ই মদ ও জুয়ার হুকুমে হবে। এখন এসব প্রথা ও প্রচলনের বিধান বের হয়ে যাবে। হাদিসের ভাষ্যমতে, এগুলো স্পষ্টত মদ ও জুয়ার হুকুমে। কেননা তা নামাজ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়ার কারণ।

যদি অন্যান্য প্রমাণ খণ্ডন করা হয় তবুও এটা এমন একটি প্রমাণ যার পরে আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এর কোনো উত্তরও নেই। যদি কখনো মনে চায় তাহলে দেখে নেবেন যেখানে এসব প্রথা পালন করা হয় সেখানে নামাজের প্রতি নিয়মানুবর্তিতা বা গুরুত্ব থাকে না। সুতরাং রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ঘোষণা অনুযায়ী তা জুয়ার অন্তর্গত। জুয়ার বিধান প্রযোজ্য হবে। জুয়াকে কোরআনে رِجْسٌ নাপাক ও শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। আমি নই বরং কোরআন বলছে, এসব প্রথা-প্রচলন শয়তানের কাজ।

আরো যেসব দলিল জানা আছে দাও। এটাই বা কম কি তার নাম শয়তানের কাজ হয়েছে। শরিয়তের বিধান এটাই। যে প্রমাণ দেয়া হয়েছে স্থূলবুদ্ধির মানুষও তা বুঝবে। [মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৬৪]

জায়েজের প্রবক্তাদের দলিল বিশ্লেষণ

বর্তমানে কিছু খুব সুন্দর জায়েজ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে চালাকি করা হয়। জোড়া-তালি দিয়ে জায়েজ করা হয়। আলেমদের কাছে এভাবে জিজ্ঞেস করা হয়, নিজেদের ভেতর মিল-মহব্বত জায়েজ কী-না। কোনো আত্নীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করা জায়েজ কী-না। উত্তরদাতা মুফতি জায়েজ ছাড়া আর কী উত্তর দেবেন? তারা জায়েজ উত্তর নিয়ে এসব প্রথাকে গোনাহের তালিকা থেকে বের করে দেন। কাজটাকে তারা জায়েজ মনে করে এবং মনে করে, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছু জায়েজ। তার কিছু আবার নাজায়েজ হয় কী করে? এখনকার অতিশিক্ষিত মানুষের কাছে জায়েজ হওয়ার এটাই প্রমাণ। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এসব প্রথা-প্রচলনের এমন কিছু অংশ রয়েছে যা শরিয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ। যেমন, অহংকার, দাম্ভিকতা ও প্রদর্শনপ্রিয়তা।

এখন দেখার বিষয়, প্রথা ও রীতিগুলোর ভিত্তি এসব কী-না। যদি তা-ই হয় তাহলে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছু কীভাবে জায়েজ হলো? সুতরাং আপনাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আর গোনাহের অংশ উল্লেখ না করে এবং শুধু জায়েজ অংশের উল্লেখ করে ফতোয়া নেয়া চালাকি ছাড়া আর কী?

আল্লাহ এমন চালাকির অনাচার থেকে রক্ষা করেন। কুফল নিজ প্রভাব বিস্তার করবেই; চাই যে ব্যাখ্যাই করা হোক না কেনো। কেউ যদি হাতে বিষ নিয়ে

এই ব্যাখ্যা করে তা খায় যে, চিনি সাদা এটাও সাদা। তাহলে তাকে কেনো আমি চিনি বলবো না? এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করালে বিষ নিষ্ক্রীয় হয়ে যাবে? এমনিভাবে পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও উঠা-বসায় যদি শরিয়তের অকল্যাণ থাকে তা কি এমন ভাবনা দ্বারা দূর হয়ে যাবে যে, পোশাক জায়েজ, উঠা-বসা জায়েজ, আদান-প্রদান করা জায়েজ। তাহলে তার সমষ্টি কেনো নাজায়েজ হবে? যদি অনুসন্ধান করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে নাজায়েজ অংশও উল্লেখ করে যেকোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করো যে, অহঙ্কারের পোশাক পরিধান করার বিধান কী? উত্তর দেবেন নাজায়েজ। এমনিভাবে জিজ্ঞেস করবে, দাম্ভিকতার জন্য প্রথা পালন করার বিধান কী। দেখবেন কী উত্তর দেন।

[মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৪২]

শরিয়তের প্রমাণ

তোমার ধারণা ছিলো খাবার খাওয়া জায়েজ। মুফতি সাহেবও ফতোয়া দেন, খাওয়া জায়েজ। কিন্তু শরিয়তের তালিকায় চোখ বুলালে দেখবেন হাদিসের ভাষ্য দ্বারা এগুলোকেও গোনাহ বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ

"রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এমন দু'জনের খাবারগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, যারা প্রতিযোগিতা করে খানা খাওয়ায়।" [আবুদাউদ]

দেখুন! খাবার খাওয়া জায়েজ। এজন্য একথা বলা বৈধ হবে না যে, খানা খাওয়ালে কী সমস্যা? এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়কে তুলনা করবে যার সমষ্টির নাম প্রথা। প্রথা জায়েজ হওয়ার পক্ষে এ প্রমাণ পেশ করা হয় খাওয়া-খাওয়ানো, নেয়া-দেয়া, আসা-যাওয়া প্রত্যেকটি পৃথকভাবে বৈধ কাজ। তাহলে একত্রিত হলে কীভাবে অবৈধ হবে। আমি বলি, কাপড় পরা জায়েজ কিন্তু শরিয়তের একটি শর্ত আছে।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন–

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যেব্যক্তি দেখানোর জন্য পোশাক পরবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন।"

এমনিভাবে মানুষকে খাওয়ানো জায়েজ। কিন্তু তাতে শরিয়তের একটি শর্ত আছে। এখন দেখার বিষয় হলো, এসব প্রথার মধ্যে সে শর্ত পাওয়া যায় কী-না। এসব ব্যাপারে আজকাল বিচক্ষণ মানুষও প্রতারিত হয়।

[মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৪৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথার যৌক্তিক কুফল ও জাগতিক ক্ষতি

প্রথাপালনে যৌক্তিকক্ষতি লক্ষ করুন। যে সম্পদ বহু পরিশ্রমে ও জীবন শেষ করে উপার্জন করা হয়েছিলো তা নির্দয়ভাবে খরচ করা হয়। মালিকের খরচ পর্যন্ত ওঠে না। তার সন্তানেরা মুখাপেক্ষী থেকে যায়। আমি এমন মানুষকে দেখেছি যাদের পিতা-মাতার অবস্থা ভালো ছিলো। অনেক কিছু রেখে গিয়েছিলো। কিন্তু তারা আত্মীয়-স্বজনকে সন্তুষ্ট করতে এবং লোক দেখাতে গিয়ে সব শেষ করে ফেলে। কিছুদিন পরে খুব আক্ষেপ হয়। এখন নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী। অপচয় করে আনন্দ পাওয়া কোন বিবেকের কথা? আত্মীয়-স্বজনকে খাইয়ে খাইয়ে নিজে নিঃস্ব হয়ে গেছে। ধর্মের কথা বাদ দিয়ে শুধু বিবেক দ্বারা বিচার করলেও এর বিপরীত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সব আত্মীয় টাকা দেবে যাতে একজনের জন্য যথেষ্ট অর্থ জমা হয়। আত্মীয়-স্বজন জানতেও পারবে না। কিন্তু আমরা দীন বা বিবেকের আলোকে কাজ করলে তো! আমাদের নিয়ন্তা প্রবৃত্তি! তার সামনে কেউ বুঝে না কী করছি। তার ফল কী? প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষের শত্রু। সে কখনো মানুষের উপকারের কথা বলবে না। সবসময় এমন কথা বলবে যা ধর্মবিরোধী এবং বিবেকবহির্ভূত। আমাদের প্রকৃতি এমন অজ্ঞতাপূর্ণ যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারি না। নিজের ভালো-মন্দও চোখে পড়ে না। [মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ১৭২-১৭৩]

প্রথা মানুষকে ঋণগ্রস্থ ও অভাবী করে

বিয়ে সবার জীবনে আসে। গরিবমানুষও বোকামির কথা বুঝে। যদি কাজে সামান্য ত্রুটি হয় তাহলে এর ক্ষতি সারা জীবন মাথা নিচু করে রাখবে। এজন্য সুদগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষতির ভয়ে নিজের ভবিষ্যত ক্ষতিগ্রস্থ করে। ধ্বংস করে। গরিবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কি আছে। গরিবের খরচ গরিবের মতো হয় আর ধনীর খরচ ধনীর মতো হয়।

ধনাঢ্যব্যক্তিরাও প্রথা-প্রচলনের কারণে ঋণ থেকে বাঁচতে পারে না। ধনীদের বাগদান অনুষ্ঠান সাধারণ বিয়ের থেকে জমজমাট হয়। তারা তাদের অবস্থান অনুযায়ী খরচ ও আপ্যায়ন করে। যা তাদের পরকাল নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে

ইহকালেও অপদস্থ করে। ভালো ভালো পরিবারকে দেখা গেছে একবিয়ের ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৫০]

পাঠক! বিয়ে অনেক সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করা উচিত। যাতে পরে আফসোস না হয়– হায় আমি এ কী করলাম! যদি কারো কাছে অনেক অর্থবিত্ত থাকে তাহলে তা এভাবে নষ্ট করা ঠিক নয়। দুনিয়ামুখী মানুষের জন্য কিছু টাকা জমানো ভালো। এতে অন্তর প্রশান্ত থাকে এবং ইবাদতে একাগ্রতা আসে।

[আলকামালু ফিদ্দীন লিননিসা: পৃষ্ঠা: ১১২]

বিয়েতে অপব্যয় ও অপচয়

বিয়ের সময় মানুষ চোখ বন্ধ করে ফেলে। তার এই হুঁশ থাকে না যে, এখানে খরচ করা উচিত কি উচিত নয়। খুব ভালো করে বুঝুন! খরচেরও একটি সীমা আছে। যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদির সীমা আছে। যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ চার রাকাতের স্থলে ছয় রাকাত এবং রোজা এশা পর্যন্ত রাখে তাহলে সে গোনাহগার হবে।

ধনীব্যক্তিরা বিয়ের সময় খুব বেহিসেবি হয়ে যায়। মুসলমানের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। তারা আগ-পর কিছুই ভাবে না। খুব অপব্যয় করে। এমনকি সে ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে দেউলিয়া হয়ে যায়। এমন অবস্থা মুসলমানের এজন্য হয় যে, তারা ইসলামের লৌহদূর্গের দরোজা খুলে দিয়েছে। নয়তো ইসলামিবিধান অনুযায়ী জীবন চালালে কখনো অপদস্থ হতো না। সম্পদের অধিকার রক্ষা করা খুব প্রয়োজন। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৩৮ ও ১৪৩]

বিয়েতে অধিক খরচ করা বোকামি

একজন ধনীব্যক্তি ছিলো। তিনি বিয়েতে সীমাহীন খরচ করেন। মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] সেখানে যান এবং বলেন, মাশাল্লাহ! অনেক খরচ করেছেন। আপনার উচ্চমানসিকতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি এতো খরচ করে এমন একটি জিনিস ক্রয় করেছেন যা প্রয়োজনের সময় বিক্রি করতে চাই কেউ তা একটি ফুটোপয়সার বিনিময়েও নেবে না। আর তাহলো সুনাম। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৪২]

প্রথা-প্রচলন মুসলমানকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। এজন্য আমি বাগদানকে ছোটো কেয়াতম এবং বিয়েকে বড়ো কেয়ামত বলেছি। এমন বিয়ের ফলে ঘরে ঘুণ লেগে যায় এবং ধীরে ধীরে পুরো ঘর শেষ হয়ে যায়।

[আজলুল জাহিলিয়্যাহ: পৃষ্ঠা: ৩৬৬]

অপচয়ের ক্ষতি

অপচয় কৃপণতার তুলনায় নিন্দনীয়

যদি মানুষ অপব্যয় থেকে বাঁচে তাহলে অনেক বরকত হয়। অপব্যয় বড়ো ক্ষতিকর কাজ। এর ফলে মুসলমানের শিকড় আলগা হয়ে গেছে। কার্পণ্যের তুলনায় অপচয় অনেক বেশি নিন্দার। কার্পণ্যে অস্থিরতা নেই তবে অপচয়ে আছে।

অপচয়কারীর ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে যে, সে দীন হারিয়ে না ফেলে। এমন অনেক ঘটনা আছে অপচয়ের পরিণতিতে একসময় কাফের হয়ে গেছে। কারণ, অপচয়কারী নিজের প্রয়োজন পূরণে অপারগ হয়, ফলে দীন বিক্রি করে দেয়। কৃপণব্যক্তি অপারগ হয় না। তার হাতে সবসময় অর্থ থাকে। সে বরং খরচ করে না। [আল ইফাজাত: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৫৩]

এজন্য আমি বলি, এখন সম্পদের যত্ন নেয়া দরকার। সম্পদ না থাকলে মানুষ অনেক সমস্যায় পড়ে। দীন বিক্রি বা ধর্মব্যবসা বিপদের একটি অংশ।

[আল ইফাজাত: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৫]

যে বিয়েতে বরকত থাকে না

হাদিসশরিফে এসেছে–

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

"নিশ্চয় অধিক বরকতপূর্ণ বিয়ে হলো, যা খরচের বিবেচনায় সহজ হয়।"

[মোসনাদে আহমাদ]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, বিয়েতে যতো বেশি খরচ করা হবে তার বরকত ততো কমে যাবে। [মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ৫১]

বিয়েতে অধিক খরচ করার সঠিকপদ্ধতি

১. একব্যক্তি আমাকে অভিযোগের সুরে বলেন, খুশির সময় আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ খরচ করতে চাই। আল্লাহ যখন দিয়েছেন তখন কেনো খরচ করবো না। সুতরাং আপনি যেসব খাতকে নিষিদ্ধ বলেন সেগুলো ছাড়া অন্যখাতের কথা বলুন। আমি বলি, আপনার যদি খরচ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই পদ্ধতিটি যুক্তিগ্রাহ্য যে, আপনি দরিদ্রদের একটি তালিকা করবেন এবং যতো অর্থব্যয়ের ইচ্ছা করেছিলেন তা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। দরিদ্রপরিবারের মেয়েদের বিয়েতে আপনি এই অর্থ ব্যয় করবেন। দেখবেন

কেমন সুনাম হয়। যদিও তার নিয়ত করা যাবে না তবুও দরিদ্রমানুষের উপকার হবে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০২ ও ওরাউল উয়ুব]

২. যদি নিজের ঘরোয়া লোক এবং মেয়ে-জামাইয়ের জন্য খরচ করতে হয় তাহলে তার উত্তমপথ হলো, একজন ধনীব্যক্তি যা করেছিলো– সে তার মেয়েকে বিয়ে দেয় কিন্তু ধুমধাম করার পরিবর্তে একলাখ টাকার সম্পদ মেয়ের নামে লিখে দেয়। সে বলে, আমার ইচ্ছা ছিলো বিয়েতে একলাখ টাকা খরচ করবো। টাকাও জোগাড় করে রেখেছিলাম। ইচ্ছা ছিলো ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে দেয়া। এরপর ভাবলাম, ধুমধামে বিয়ে দিলে আমার মেয়ের লাভ কী? মানুষ খেয়েদেয়ে চলে যেতো। আমার টাকা নষ্ট হতো। যা মেয়ের কোনো উপকারে আসতো না। এজন্য এমন ব্যবস্থা করেছি যা আমার মেয়ের উপকারে আসে। আর জায়গা-জমির চেয়ে উপকারী কিছু নেই। এর দ্বারা সে ও তার সন্তানরা ভাবনাহীনভাবে জীবন কাটাতে পারবে। কেউ আমাকে কৃপণও বলতে পারবে না। আমি ধুমধামে অনুষ্ঠান করিনি। কিন্তু টাকাও ঘরে রেখে দিইনি। দেখুন! এটাই বুদ্ধিমানদের কাজ। [হুকুকুল বাইত: পৃষ্ঠা: ৫২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়ের জমকালো আয়োজন

বর্তমান সময়ের প্রথা ও পদ্ধতি এতোটা অর্থহীন যার দ্বারা না হয় উপকার। না হয় সুনাম। উপকার না হওয়ার প্রমাণ দেখুন, একজন ধনীব্যক্তি ধনী থেকে এক এক অনুষ্ঠান করে রসাতলে গেছে। আর সুনামের অবস্থা হলো, আজ কেউ যদি কোনো অনুষ্ঠানে সত্তর হাজার টাকা খরচ করে এরপর কেউ তার চেয়ে সামান্য বেশি খরচ করলে বলে, আরে অমুক ব্যক্তি কী করেছিলো? সুনামই কী জিনিস? সত্ত্বাগতভাবে তা নিন্দিত।

[ওরাউল উয়ুব ও আততাবলিগ: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০২]

যতো ধুমধাম ততো বদনাম

আমি বলি, সুনাম অর্জনের যতো চেষ্টা করে ততো বদনাম হয়। একজন মহাজন অনেক ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে করে। অনেক খরচ করে। বরযাত্রায় প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেয়। যখন বরযাত্রী থেকে ফিরছিলো তখন তার মনে হয় প্রত্যেক গাড়িতে আমাকে স্মরণ করছে এবং প্রশংসা করছে। সে কোনো এক বাহানায় সেগুলো শুনতে চাইলো। ফলে একস্থানে গোপনে দাঁড়িয়ে গেলো। বরযাত্রী সেই স্থান দিয়ে অতিক্রম করছিলো। কিন্তু কোনো গাড়িতেই নিজের আলোচনা শুনতে পেলো না। অবশেষে একগাড়িতে সে নিজের আলোচনা শুনতে পায়। সে অনেক আগ্রহ করে কান পাতে। একজন বলে, দেখো কেমন নাম কামালো। প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিলো। এমন কাজ কেউ করে নি। অপরজন বলছে, শালা! একটি করে দিলো, দুটি দিলে কি মরে যেতো? এর অর্থ হলো, নামের জন্য সম্পদ ব্যয় করে কিন্তু তা সহজে অর্জন হয় না। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৪২]

মানুষ যার জন্য সম্পদ ব্যয় করে সে তার বদনাম করে

মানুষ যার জন্য খরচ করে, বিপদের সময় তাদের কেউ পাশে দাঁড়ায় না। ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে বলে সম্পদ নষ্ট করতে কে বলেছিলো? নিজের দোষে ধ্বংস হয়েছে। আমি দেখেছি, যারা খুশি করার জন্য বলে, যেখানে তোমার ঘাম ঝরবে সেখানে আমি রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত। তারা বিপদের সময় পাশে দাঁড়ায় না। সবাই চোখ বন্ধ করে থাকে। তারা পাল্টে যায়। [আততাবলিগ: খণ্ড: ১৫, পৃষ্ঠা: ১৪৩]

মহাআয়োজনে বিয়ে করার মহাক্ষতি

একজনের ধুমধাম দেখে অন্যান্য সম্পদশালীর অন্তরে হিংসা হয় 'এ তো আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।' তখন তারা চেষ্টায় থাকে ব্যবস্থাপনায় কোনো দোষ বের করতে। যদি আয়োজনে কোনো ত্রুটি পায় তাহলে উপায় থাকে না। চারদিকে গুঞ্জন শুরু হয়। আরে আমরা তো হুক্কাই পেলাম না। আরেকজন বলে, ক্ষুদায় মরেছি। রাত দুটো বাজে খানা পেয়েছি। যখন ব্যবস্থা করতে পারবে না তখন এতো মানুষকে কেনো ডেকেছে? অপদার্থের কী দরকার ছিলো? টাকাও নষ্ট হলো, নাকও কাটা গেলো। অনেক সময় হিংসায় রান্না করা ডেগে এমন কিছু দিয়ে দেয় যাতে খাবার নষ্ট হয়ে যায়। এরপর প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তার গুঞ্জন উঠে। তখন ভালোভাবে নাককাটা যায়। যদি সবকিছুর ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে হয় তাহলে কেউ দোষ না বললেও কেউ প্রসংশাও করে না।

[দীন ও দুনিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৯৮]

ধুমধামের মধ্যে নামাজ হারিয়ে যায়

যেবিয়ে মহাধুমধামে প্রথা অনুযায়ী হয় সেখানে নারী-পুরুষ, মেজবান-মেহমান ও ঘরের কাজের লোকদের নামাজের হুঁশ থাকে না। সারারাত খাওয়া-দাওয়া, মেহমানদারি ও নেয়া-দেয়ার মধ্যে কেটে যায় কিন্তু নামাজের সুযোগ হয় না। এটা শরিয়তের সীমালঙ্ঘন নয় কী? যেখানে কোনো প্রয়োজনে নামাজ ছেড়ে দেয়া জায়েজ নেই সেখানে বিনা প্রয়োজনে নামাজ ছেড়ে দেয়া হয়।

অনেক মহিলা নামাজ ছাড়ার ব্যাপারে অপারগতা পেশ করে যে, ঘরে এতো ভীড় নামাজ কোথায় পড়বো? বেগম সাহেবা! সবকাজের জায়গা হয় নামাজের জায়গা হয় না? যখন শোয়ার সময় হয় তখন তাদের শোয়ার জায়গা হয় না? তখন অবশ্যই জায়গা হয়। যদি একজন মহিলার সামান্য কষ্ট হয় তাহলে সব আত্মীর নাককাটা যায়। যদি মহিলারা শোয়ার মতো নামাজকেও আবশ্যক মনে করতো তাহলে নামাজের জায়গা না পেলেও আত্মীয়দের নাককাটা যেতো। তারা নামাজই পড়ে না। সব নির্লজ্জ অজুহাত!

বাস্তবতা যাই হোক; মেনে নেয়া হলো, জায়গা ছিলো না কিন্তু তাতে আল্লাহর দায় কী? আল্লাহ কি এমন অনুষ্ঠানে যেতে বলেছিলেন, যেখানে নামাজও পড়া যাবে না? সময় হলে শতো চেষ্টা করে হলেও নামাজ আদায় করবে। চাই অনুষ্ঠানে আদায় করো বা অনুষ্ঠানের মুখে ছাই দাও। ঘরে গিয়ে নামাজ আদায় করো। যে কারণেই হোক নামাজ ছাড়ার গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। যেঅনুষ্ঠান নামাজের প্রতিবন্ধক শরিয়ত সেঅনুষ্ঠানের বৈধতা দেয়নি। যদি এক এক ওয়াক্ত নামাজ কারো ছুটে যায় তাহলে তা অনুষ্ঠানের নিন্দার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের ভালো-মন্দের কোনো বিচার নেই। [মুনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৬৩]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিয়ের খরচ

মহিলারা যখন বিয়ের খরচ পুরুষদেরকে বলে এবং স্বামী প্রশ্ন করে– এতো খরচ আমি কোথা থেকে জোগাড় করবো? আমার তো এতোটা সামর্থ নেই। তখন তারা বলে, ঋণ করো। বিয়ের ঋণ থাকে না। সব আদায় হয়ে যায়। আল্লাহই ভালোজানেন তারা এই কথা কোথা থেকে পেলো– বিয়ের ও নির্মাণ কাজের ঋণ শোধ হয়ে যায়; চাই তা সুদিঋণ হোক-চাই অযথা খরচ হোক।

পাঠক! আমি ঋণের দায়ে বাড়ি-ঘর নিলাম হতে দেখেছি। যখন এমন অবস্থার মুখোমুখি হয় তখন তারা নিজেরাও কিছু কিছু বুঝতে পারে। তবুও পুরো বুঝে না। এখনো অনেক প্রথা বাকি আছে।

শিরক ও বেদাতের প্রথা কমেছে কিন্তু অহমিকার প্রথা বেড়ে গেছে। আসবাবপত্র ও কাপড়। কাপড়ের নানা প্রকারের লৌকিকতা তৈরি হয়েছে। আগে এমন ছিলো, এসব জিনিস দু'-একজনের থাকতো। লোকজন বিয়ের সময় তাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কাজ করতো। [দীন্ ও দুনিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৫০০]

বিয়ের জন্য ঋণ দেয়ার নিয়ম

এমন বিয়েতে ঋণ দেয়া নিষেধ যেখানে প্রথাপালন করা হয় এবং অপচয় হয়। যেনো ঋণদাতার উদ্দেশ্য সম্পদ নষ্ট করা না হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সম্পদ নষ্ট করা হয় এবং মাধ্যম বা কারণ হয় দাতা। নিষিদ্ধকাজে লিপ্ত হওয়া যেমন নিষেধ তেমন নিষিদ্ধকাজের উপলক্ষ্য হওয়াও নিষেধ। প্রমাণ কোরআনের আয়াত–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে। তাহলে তারা অজ্ঞতার কারণে শত্রুতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে।"

[সুরাঃ আনআম, আয়াত:১০৮]
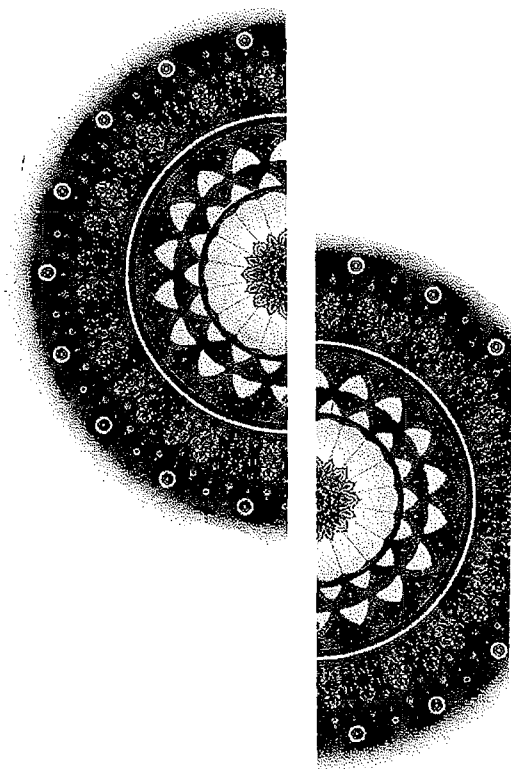
নারী ও প্রথাপালন

অধ্যায় । ১৭ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহিলাদের অবস্থা বেশি খারাপ। তারা নিজের চিন্তার ওপর এতোটা দৃঢ় যে, তাতে দীন নষ্ট হচ্ছে না দুনিয়া নষ্ট হচ্ছে– খেয়াল থাকে না। প্রথাসমূহ এবং নিজের জেদের জন্য যাই হোক না কেনো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কিছু মহিলাকে দেখা যায়, তাদের হাতে সম্পদ ছিলো; কোনো অনুষ্ঠান অথবা বিয়েতে খরচ করে নিঃস্ব হয়ে যায়। সবসময় সমস্যার মধ্যে থাকে। কিন্তু করুণা হয় যে, তবুও প্রথার ক্ষতি তাদের বুঝে আসে না। তারা বলে, আমি অমুকের ভালোর জন্য এতোটা করেছি। তার বিয়ে এমন ধুমধামের সঙ্গে দিয়েছি। আমাদের এসব অর্থ আল্লাহর কাছে জমা আছে। কেমন জমা–চোখ বুজলেই টের পাবে। যখন দুনিয়ার ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য কষ্ট প্রভাব ফেলছে না তখন পরকালের কষ্ট যা অদৃশ্য তা কীভাবে বুঝবে? [মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৩২]

মহিলাদের একটি রোগ যা এই অনাচারকে গতি দিচ্ছে। তা হলো, মহিলারা প্রথা-প্রচলনের কঠোর অনুসারী। স্বামীর সম্পদ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে উড়ায়। বিশেষ করে বিয়ে-শাদি ও অহমিকার কাজে। অনেক জায়গায় শুধু মহিলারাই খরচের অধিকারী হয়। এর ফল হলো, স্বামী ঘুষ খায় বা ঋণগ্রস্থ হয়। পুরুষদের অনেক বেশি অবৈধ উপার্জনে লিপ্ত হওয়ার জন্য দায়ী স্ত্রীদের অপব্যয়। যেমন, কোনো বাড়িতে বিয়ে হলে আদেশ হয় হয় দামি কাপড় লাগবে। স্বামী তখন এক-দুইশো [বর্তমানে কয়েক হাজার] টাকার প্রস্তুতি নেয়। স্বামী ভাবে, এই দুই-একশো টাকায় পাপ মোচন হবে। কিন্তু স্ত্রী বলে, এটাতো বিয়ে [মেহেদিঅনুষ্ঠানে]-এর কাপড় হলো। মেয়ে প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য কাপড় লাগবে। তখন সে কাছাকাছি আরেকটা বাজেটের জন্য প্রস্তুত হয়। তখন আবার বলে, কিছুতো দিতে হবে। উপহারের জন্য আলাদা কাপড় লাগবে। কাপড় কিনতেই শত শত [হাজার হাজার] টাকা চলে যায়।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৫২ ও ৩৪৬]

যখন আত্মীয়দের মধ্যে খবর ছড়ায়, অমুক বাড়িতে বিয়ে তখন সবনারীর দামি কাপড়ের চিন্তা শুরু হয়। কখনো স্বামীকে বলে, কখনো কাপড়বিক্রেতাকে বাড়ি ডেকে বাকিতে ক্রয় করে। কখনো সুদে ঋণ নিয়ে কেনে। স্বামীর সামর্থ না

থাকলেও আপত্তিগ্রহণ করে না। সন্দেহ নেই, এসব কাপড় অহমিকা ও প্রদর্শনের জন্য। এ উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করা অপচয়ের শামিল। স্বামীর সাধ্যের বাইরে বিনা প্রয়োজনে চাপ দেয়া কষ্ট দেয়ারই নামান্তর। যদি এসব আয়ের কারণে স্বামীর মানসিকতা নষ্ট হয়, অবৈধ আয়ের প্রতি চোখ যায়, কারো অধিকার নষ্ট করে, ঘুষ খায় এবং তার চাহিদা পূরণ করে তাহলে সব গোনাহের জন্য স্ত্রী দায়ী থাকবে। এসব প্রথাপূরণে অধিকাংশ মানুষ ঋণগ্রস্থ হয়। এমনকি বাগান বিক্রি করে বা বন্ধক দেয়। সুদ নিতে হয়। এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া, প্রদর্শনপ্রিয়তা, অহমিকা, অপচয় ইত্যাদির মতো কুফল রয়েছে। সুতরাং নিষিদ্ধকাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৬-৫৭]

প্রথা-প্রচলনের শক্তভিত নারী

বিয়ের যতো উপকরণ আছে সবকিছুর ভিত্তি অহংকার ও প্রদর্শন। অহংকার পুরুষও করে কিন্তু শেকড়ে রয়েছে মহিলারা। তারা এই শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক। তারা এতোটা অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ যে, খুবসহজে মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে। যেব্যক্তি যেশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয় সে তার আনুষঙ্গিক খুব ভালো করে জানে। একটি সামগ্রিক নিয়মের অধীনে সব বুঝিয়ে দেয়। যখন জিজ্ঞেস করে বিয়ের সময় কী কী করা উচিত তখন এককথায় বুঝিয়ে দেয় বেশি করার দরকার নেই নিজের সাধ্য অনুযায়ী করবে। এটা সামগ্রিক নিয়ম নয় বরং খাদ। এমন খাদ যাতে হাতিও ঢুকে যায়। সে এমন একটি বাক্য বলেছে ব্যাখ্যাকারগণ যদি এর ব্যাখ্যা করে তাহলে এতো দীর্ঘ হবে যে, তা থেকে হাজারো অংশ বের হয়ে আসবে। যা থেকে দুনিয়ার কোনো অনিষ্ট এবং আখেরাতের কোনো পাপ বাদ পড়ে না। তারা শুধু একটি বাক্য– 'নিজের অবস্থান অনুযায়ী করবেন' বলেছে। পুরুষ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এতো বাড়িয়ে ফেলে যে, জমিদারের জমিদারি শেষ হয়। হাজারো গোনাহের বোঝা মাথায় ওঠে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯৮ ও ৯৯]

মহিলাসম্মিলনের ক্ষতিসমূহ

মহিলাদের সম্মিলনে অনেক ক্ষতি ও গোনাহ। যা জ্ঞানী ও ধার্মিক মানুষের জানা আছে। চিন্তা করলে সহজে বুঝে আসে। আমার মতে মহিলাদের সম্মিলন সব পাপের মা বা উৎস। তা বন্ধ করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

[আশরাফুল মালুমাত: পৃষ্ঠা: ১৪ ও ৩৩]

আমি বলি, মহিলাদেরকে পরস্পরে মিশতে দিয়ো না। এক তরমুজ দ্বারা অন্যতরমুজের রঙ পাল্টায়।

আমার নিঃসঙ্কোচ মতামত হলো, মহিলাদেরকে একত্রিত হতে দিয়ো না। যদি শরিয়তসিদ্ধ কোনো প্রয়োজনে হয়, তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু তখনো স্বামীর দায়িত্ব হলো, স্ত্রীকে কাপড় পাল্টাতে না দেয়া। যে অবস্থায় রান্না ঘরে থাকে সে অবস্থায় চলে যাবে। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৭]

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহিলারা কিছু উপলক্ষে একত্রিত হয়। যার ক্ষতির কোনো সীমা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হলো। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬৮]

বিয়েতে নারীসংক্রান্ত সমস্যা

১. দাম্ভিক মহিলাদের স্বভাব হলো, তারা উঠা-বসা ও চলা-ফেরায় তা প্রকাশ করে। যেখানে যায় নির্দ্বিধায় ঘরে প্রবেশ করে। এই ভয় করে না যে, সেখানে কোনো বিয়ে বৈধ এমন পুরুষলোক থাকতে পারে। বার বার বিয়ে বৈধ এমন পুরুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তবুও মহিলাদের হুঁশ হয় না যে, একটু যাচাই করে ঘরে প্রবেশ করবে।

২. কেউ ঘরে ঢুকে উপস্থিত লোকদের সালাম করলো, তখন অনেকে জিহ্বাকে কষ্ট দেয় না। শুধু মাথায় হাত রেখে দেয়। ব্যস সালাম হয়ে গেলো। হাদিসে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেউ আবার শুধু সালাম শব্দ উচ্চারণ করে। এটাও সুন্নতপরিপন্থী। আসসালামু আলায়কুম বলা আবশ্যক। জবাবের অবস্থা বুঝুন। যতোজন থাকুক– বিধবা হোক-সধবা হোক, ভাই হোক-বাচ্চা হোক। গোষ্ঠী ধরে উপস্থিত কিন্তু ওয়ালায়কুমুস সালাম বলা কঠিন। যা সবকিছুর সমন্বয়কারী।

৩. সেখানে গিয়ে এমন জায়গায় বসে যেনো সবার দৃষ্টি তার ওপর পড়ে। হাত-কান অবশ্যই দেখাবে। হাত যদি কিছুতে ঢোকানো থাকে তবুও কোনো বাহানায় তা বের করবে। কান যদি ঢাকা থাকে তাহলে গরমের অজুহাতে বা অন্যকোনো প্রয়োজন দেখিয়ে তা দেখাবে। বুঝাবে আমার কাছে এতো অলঙ্কার আছে। যদি কারো দৃষ্টি না পড়ে তাহলে কান চুলকিয়ে দেখিয়ে দেবে। যাতে এই ধারণা হয়, যখন তার পরনে এতো অলঙ্কার, না জানি বাড়িতে কতো কিছু আছে!

৪. অনুষ্ঠান জমে উঠলে মূলকাজ গল্প করা। বসেই পরনিন্দা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। যা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যা অকাট্য হারাম। মহিলাদের দাম্ভিকতার দু'টি অবস্থা হয়। এক খুশির আর এক চিন্তার। তারা দুই অবস্থায় মিলিত হয়।

৫. কথা বলার সময় প্রত্যেক মহিলা চেষ্টা করে যেনো তার পোশাক ও অলঙ্কার সবার চোখে পড়ে। হাতে, পায়ে, মুখে তথা সারাদেহে তা প্রকাশ পায়। যা স্পষ্ট লৌকিকতা। সবার জানা মতে যা হারাম।

৬. প্রত্যেক মহিলা যেমন অন্যের কাছে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। তেমনি অন্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার চেষ্টা করে। যদি কাউকে নিজের চেয়ে নিচুস্তরের পায় তাহলে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে। নিজেকে বড়ো মনে করতে থাকে। যা সুস্পষ্ট অহমিকা ও গোনাহ। আর কাউকে নিজের চেয়ে উঁচুস্তরের পেলে হিংসা, অকৃতজ্ঞতা ও লোভ প্রকাশ পায়। যা সবার কাছে হারাম।

৭. খাওয়ার সময় ঝড় [লঙ্কাকাণ্ড] শুরু হয়। আল্লাহ রক্ষা করেন! এক একজন মহিলার সঙ্গে চারজন করে বাচ্চা থাকে। প্রত্যেকের প্লেট ভর্তি করে দিতে হয়। মেজবানের সম্মান নষ্ট হওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।

৮. অধিকাংশ সময় হৈ চৈ ও অনর্থক ব্যস্ততায় নামাজ গুরুত্ব হারায়। নয়তো সময় থাকে না।

৯. আয়োজকবাড়িতে পুরুষ অসতর্কতাবশত এবং তাড়াহুড়োর কারণে দরোজার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মহিলাদের ওপর দৃষ্টি পড়ে। তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কেউ আবডালে চলে যায়। কেউ মাথা নিচু করে ফেলে। ব্যস, পর্দা হয়ে গেলো।

১০. অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার সময় ইয়াজুজ-মাজুজের মতো ঢেউ শুরু হয়। একজন অপরজনের ওপর, সে অন্যজনের ওপর। মোটকথা, দরোজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে– প্রথমে আমি উঠবো!

১১. এরপর কারো কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে প্রমাণ ছাড়াই কারো ওপর দোষ চাপানো হয়। তার প্রতি কঠোরতা করা হয়। অধিকাংশ বিয়েতে এই পরিস্থিতি হয়। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬০]

পোশাক, অলংকার ও মেকআপের সমস্যা

একটি বিপদ হলো, একবিয়েতে একটি পোশাক বানালে অন্যবিয়ের জন্য তা যথেষ্ট হয় না। তার জন্য আবার একসেট বানাতে হবে। পোশাক প্রস্তুত থাকলে অলঙ্কারের চিন্তা হয়। যদি নিজের না থাকে তাহলে অন্যেরটা চেয়ে পরে। জিনিসটা অন্যের সে কথা গোপন রাখে, নিজের বলে প্রকাশ করে। এটা এক প্রকার মিথ্যা।

হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে, 'যেব্যক্তি অন্যের জিনিস দ্বারা ভণিতা করে নিজের ভালোঅবস্থা প্রকাশ করে তার দৃষ্টান্ত হলো, সেইব্যক্তি যে মিথ্যা ও প্রতারণার দু'টি পোশাক পরিধান করেছে। অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত মিথ্যা আর মিথ্যা দ্বারা আবৃত।

এরপর এমন অলঙ্কার পরে যার ঝংকার দূর থেকে শোনা যায়। যাতে অনুষ্ঠানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি পড়ে। ঝংকার তুলে এমন অলঙ্কার পরিধান করা

নিষেধ। হাদিসে এসেছে, বাজনার শব্দ হয় এমন প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে একটি করে শয়তান থাকে।

২. অনেক মহিলা এতো অসতর্ক হয় যে, পাল্কি [বর্তমানে গাড়ি] থেকে আঁচল ঝুলে থাকে বা কোনো পাশের পর্দা খুলে যায়। আতর ও সুগন্ধি এতো বেশি মাখে যে, রাস্তায় ঘ্রাণ ছড়িয়ে যায়। এটা বেপর্দা সমতুল্য সজ্জা। হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে, যে মহিলা ঘর থেকে এমনভাবে আতর মেখে বের হলো যাতে অন্যরাও ঘ্রাণ পায় সে অমন [চরিত্রহীন নারী]। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৯]

নারীদের একটি মারাত্মকভুল

আশ্চর্য! ঘরে তারা মা-বোন হয়ে থাকে আর গাড়ি এসেছে শুনেই সেজে-গুজে নববধূ হয়ে যায়। তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, ভালোকাপড় পরার উদ্দেশ্য কেবল মানুষ দেখানো। আশ্চর্য! যার মাধ্যমে কাপড় পেলো, যে মূল্য দিলো সে, তার সামনে কখনোই পরা যাবে না। অন্যের সামনে পরতে হবে। আফসোস! স্বামীর সঙ্গে কখনো সুন্দর ভাষায় কথা বলে না। তার সামনে ভালোকাপড় পরে না। অন্যের বাড়ি গেলে মুখে মধু ঝরে। কাপড়ও একটার চেয়ে একটা ভালো পরে। সুখ হয় অন্যের, মূল্য দেয় স্বামী। এটা কেমন বিচার? [আততাবলিগ]

আবশ্যক মাসয়ালা

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, 'যেব্যক্তি কোনো কাপড় দেখানোর জন্য পরিধান করে আল্লাহতায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন অপমানের পোশাক পরাবেন।'

মহিলাদের এসব কর্মকাণ্ড দেখে কেউ কি বলতে পারবে প্রথা-প্রচলনের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ত ঠিক আছে? মহিলাদের এই ভ্রুক্ষেপও নেই যে, নিয়তের শুদ্ধতা কী আর অশুদ্ধতা কী।

কোনো সন্দেহ নেই, তারা পোশাক বানানোর সময় দু-চারটা কাপড়ের মধ্যে ভালোকাপড়টা দিয়ে পোশাক বানায় যাতে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, প্রদর্শন করতে পারে। স্মরণ রেখো! নিজের মনকে তুষ্ট করতে কাপড় পরা নির্দোষ। কিন্তু অন্যকে দেখানোর জন্য পরা নাজায়েজ।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৪৬]

নারীকে অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখার কৌশল

আমি একটি পদ্ধতি পুরুষকে শেখাই নারীরা যা অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তা দাম্ভিকতার চিকিৎসা। তা হলো, মহিলাদেরকে একথা বলা যাবে না যে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

করবো না। সেখানে অপারগতাও আছে। কেননা স্বাভাবিক নিয়ম হলো, الجنس

يميل الى الجنس –প্রত্যেকেই সগোত্রের অনুরক্ত হয়। তাদের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কোথাও যাওয়ার সময় কাপড় পাল্টাতে দেবে না। এর অর্থ কিন্তু আমি দারোগা হতে বলিনি। বরং যখন যাবে তখন কাপড় না পাল্টাতে বাধ্য করবে। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯১]

বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে মহিলাদেরকে বাধা দেয়ার সহজউপায় হলো যেতে বাধা দেবে না। কিন্তু বাধ্য করবে যেনো কাপড়-গহনা ইত্যাদি পাল্টাতে না পারে। যে অবস্থায় ঘরে থাকে সে-ই অবস্থায় যাবে। তাহলে নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে।

[আশরাফুল মামুলাত: পৃষ্ঠা: ৩৩]

স্ত্রী যদি প্রথা-প্রচলন থেকে বিরত না হয়

একব্যক্তি মাওলানা কাসেম নানুতাভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দরবারে অনুষ্ঠানের প্রথাসমূহের অবৈধতা সম্পর্কে বলছিলো যে, স্ত্রী তা মানে না। হজরত বলেন, না গিয়ে বুঝাও মেনে নেবে। লোকটি বললো, অনেক বুঝিয়েছি কোনোভাবেই মানে না। মাওলানার রাগ হলো। তিনি বললেন, যদি সে অন্যপুরুষের সঙ্গে শোয়ার অনুমতি চায় তাহলে কী দেবে। তখন সে চুপ হয়ে গেলো। [আল আশরাফ: রমজান সংখ্যা-১৩৫০]

বিয়ের অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ আছে কী?

বিয়ের অনুষ্ঠান বা পরপুরুষের মধ্যে নারীদেরকে যেতে নিষেধ করা হয় ফেতনা বা বিশৃংখলার ভয়ে। সাধারণ অর্থে ফেতনা হলো, এমন কাজ যা শরিয়ত নিষেধ করেছে। 'ইসলাহুর রুসুম'-এ আমি যা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। [এই বইয়ের প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে।]

বাকি যে যে ফেতনাকে নিষেধের কারণ মনে করবে সেটাই যখন ফেতনার সম্ভাবনা থাকবে না তখন নিষেধও থাকবে না। যেখানে যাওয়ার অনুমতি আছে সেখানে শর্ত হলো সাজ-সজ্জা [মেকাপ] করতে পারবে না। এর কারণও ফেতনা। নারীরা যখন বেপর্দা হয় তখনই ফেতনার সম্ভাবনা থাকে।

[আনফাসে ইসা: পৃষ্ঠা: ৩৫৪, ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭৮]

নারীরা শুনে নাও! কাপড় যদি একেবারে ময়লা হয়ে যায় তাহলে তা পরিবর্তন করে নাও এবং তা যেনো সাদাসিধে হয়। নয়তো পরিবর্তন করবে না। সাধারণ কাপড়ে একত্রিত হও। দেখাশোনার যে উদ্দেশ্য তা সাধারণ কাপড়েও অর্জন

হবে। চারিত্রিকশুদ্ধতাও রক্ষা পাবে। আর যদি মনে হয়, এতে আমাদের অবজ্ঞা করা হবে। তাহলে উত্তর হলো, প্রবৃত্তিকে অবজ্ঞাই করা উচিত।

আরেকটি সান্ত্বনা পাওয়ার মতো উত্তর হলো, যখন একেক এলাকায় তার প্রচলন হয়ে যাবে তখন সবাই সাধারণ কাপড়ে মিলিত হবে। তখন দোষ ও অবজ্ঞার বিষয় থাকবে না। আর যদি দিনমজুরের দরিদ্র্যবউ বেগম সেজে যায় এবং কোনো মহিলার তার ঘরের অবস্থা জানা থাকলে বলবে, দুর্ভাগা! ধার করা কাপড় ও অলঙ্কার পড়ে এসেছে!! [আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯৩]

কেউ মনে করো না আমি ভালোপোশাক পরতে নিষেধ করছি। আমি ভালোপোশাক পরতে নিষেধ করছি না বরং পোশাকে নিহিত বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করছি। তা হলো কপটতা ও অহমিকা। যদি কেউ বাঁচতে পারে তাহলে সে পরবে।

ভালো হওয়ার দু'টি স্তর। **এক.** খারাপ না হওয়া। যাতে মন তৃপ্তি পায়। অন্যের সামনে অপমানিত না হতে হয়। এতে কোনো সমস্যা নেই এবং **দুই.** অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। যাতে অন্যের দৃষ্টি কাড়া যায়। মানুষের কাছে বড়ো হওয়ার জন্য পরা। এটা নিন্দনীয়, নাজায়েজ। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৪৫]

প্রথাপালনে বৃদ্ধনারীদের ত্রুটি

একজন মহিলা আমার মুরিদ হতে চাইলো। আমি শর্ত দিলাম, প্রথা পরিহার করতে হবে। সে বললো, আমার কিছুই নেই। না অর্থ, না সন্তান। আমি কী প্রথা মানবো? আমি বললাম, প্রথা পালন করবে না কিন্তু পরামর্শ অবশ্যই দেবে।

বৃদ্ধনারীরা প্রথার ব্যাপারে শয়তানের খালা। নিজেরা না করলেও অন্যকে শিক্ষা দেয়। এজন্য দেখি, যেসব মহিলার সন্তান নেই তারা নিজেরা তো কিছু করেই আবার অন্যকেও শিক্ষা দেয়। কেউ কি জিজ্ঞেস করবে-তাদের দায়টা কী? তাদের উচিত ছিলো, তাসবিহ নিয়ে জায়নামাজে বসে থাকা। কোনো চিন্তা নেই। আল্লাহ সবচিন্তা থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। হায়! যদি তারা সময়ের মূল্য বুঝতো। কিন্তু তাদের থেকে তা কখনো আশা করা যায় না। তাদের কাজ হলো কারো পরনিন্দা করা বা কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া। যেনো এটাই তাদের প্রার্থনা। তারা কথায় কথায় নাকগলায়।

স্মরণ রাখবে, বেশি বললেই তার সম্মান হয় না। সম্মান করা হয় সেই মহিলাকে যে চুপ থাকে। যদি চুপ করে একজায়গায় বসে আল্লাহর নাম নেয় তাহলে তাকে বড়ো সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হয়। কথা বলা যাদের অভ্যাস হয়ে যায় সে চুপ থাকে কী করে? যদিও সে অপমানিত হয়। যদিও কেউ তার কথায়

কান না দেয়। তার কাজ চিল্লানো। অন্যান্য নারীরা তার বকবক শুনে বলে, বসেন তো। কিন্তু তার শান্তি তো পেতে হবে। আমি বলি, যদি তুমি একদম চুপ থাকো। তাহলে কার দায় ঠেকেছে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে? আমাদের কথার কারণেই অধিকাংশ বিশৃংখলা ও গোনাহ হয়ে থাকে।

বাস্তবিকই অধিকাংশ গোনাহ আমাদের হয়ে থাকে মুখের কারণে। কথাটা পুরুষ-মহিলা সবার মনে রাখা উচিত। কিন্তু এখন সমস্যা হলো, মানুষের জন্য চোখের পানি ফেলবে, আক্ষেপ করবে। শুনে বলবে, ব্যস! মন আমার ঠিকানা কী!

ভাই! কথায় কাজ হয় না। কাজ করতে হয়। সুতরাং কাজ করো। কথা বলো না। [ওয়াজুদ্‌দীনঃ পৃষ্ঠাঃ ১০২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মূলত্রুটি পুরুষের

যেকাজ থেকে নারীদেরকে নিষেধ করা হয় পুরুষ তা করে আনন্দ পায়। তা থেকে নিষেধ করা দোষের মনে করে। এমনকি নারীরা যখন তা করে তখন পুরুষ নিষেধ করে। তখন তারা বলে, তোমার কথা শুনে আমার লাভ কী? পুরুষ তখন চুপ হয়ে যায়। যেনো তার মনেও কথা শুনবে এ খাহেশ আছে। যখন তার কাজেই ত্রুটি থেকে যায় তখন তার অধীনদের কাজে কেনো ত্রুটি হবে না?
আপনি এটা বলতে পারেন না 'তারা কখনো সঠিক পথে আসবে না।' কেননা আল্লাহতায়ালা আপনাকে শাসক বানিয়েছেন এবং তাদেরকে অধীন করেছেন।

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

"পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী।" [সুরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৩৪]

পুরুষ নারীর জন্য শাসক। শাসক অধীনস্থদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে। ঘর-গৃহস্থালির কাজে দেখা যায়, স্ত্রী তরকারিতে লবণ বেশি দিয়েছে এবং আপনি দুই-চার কথা বলে চুপ-চাপ খেয়ে উঠলেন; দুনিয়ার ব্যাপারে তা কখনোই হয় না। আপনি রেগে উঠেন। কিন্তু সস্তা হলো দীন। সে ব্যাপারে তাদেরকে মনমতো ছেড়ে দেবে। মেয়েদেরকে দুই-একবার উপদেশ দিয়ে থেমে যাওয়ার কারণ হলো, তা থেকে নিষেধ করাকে খারাপ মনে করা হয় অথবা পুরুষ তা করে আনন্দ পায়। [মোনাজায়াতুল হাওয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৩৮]

পুরুষ নারীকে চালক বানিয়েছে

পুরুষ আয়োজন-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নারীকে চালকের আসনে বসিয়েছে। নিজে কিছুই করে না। অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজ তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে।
কানপুরের একটি বরযাত্রী আসে। তখন মেয়েপক্ষকে আত্মীয়রা জিজ্ঞেস করে, বরযাত্রী কোথায় থামবে? তখন তারা বলে, আমরা কী বলবো? মেয়ের মায়ের

কাছে জিজ্ঞেস করুন! এতোটুকু কথাও মেয়ের মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়!

আজ পুরুষ তাদের নাকের দড়ি নারীর হাতে তুলে দিয়েছে। সামান্য সামান্য কাজও তারা তাদের অমতে করে না। কিন্তু তাদের উচিত ছিলো, শরিয়তের কাছে জিজ্ঞেস করে কাজ করা। মূর্তিঘর ছেড়ে মসজিদে আসা। কিন্তু সে জিজ্ঞেস পিরানি [মহিলাপির]-কে। মাদরাসা থেকে কাবার দিকে যাবো না-কি মূর্তিঘরে? কখনো কোনো পুরুষ কোনো মৌলভি সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে না বিয়েতে এই কাজগুলো করবো কী-না? এই ফতোয়া চাওয়া হয় নারীদের কাছে। ফলে যেমন মুফতি তেমন ফতোয়া দেয়া হয়। তারা পুরুষকে বেকুব বানায়। আর নিজেরা অনুষ্ঠানে এমনভাবে মত্ত হয়, শেষে কোনো হুঁশ থাকে না। [আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১০০ ও ওরাউল উয়ুব]

প্রথাবিরোধী দুই শ্রেণীর মানুষ

আশ্চর্য! অধিকাংশ পুরুষ প্রথা-প্রচলনের ব্যাপারে নারীদের অনুগত হয়ে যায়। কেউ কেউ বাধা দেয়। তারা দুই শ্রেণীর। **এক.** দীনদার মানুষ। তারা দীনের কারণে বিরোধিতা করে এবং **দুই.** ইংরেজিশিক্ষিতলোক। তারা ধর্মীয় দৃষ্টি থেকে বিরোধিতা করে না। তারা অযৌক্তিক মনে করে। প্রথম শ্রেণীর লোকই সম্মানযোগ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের অবস্থা হলো–

فَرَّ مِنَ الْمَطَرِ وَقَعَدَ تَحْتَ الْمِيْزَابِ-

"বৃষ্টি থেকে পালালো এবং পয়োনালীর নিচে বসলো।"

[মোজামুল আমসাল: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯০]

নারীরা প্রথা-প্রচলনের জন্য সারাজীবনে দুই-তিনবার খরচ করে। এজন্য তাদেরকে গালমন্দ করা হয় যে, তারা অনর্থক খরচ করে। আর তারা রাতদিন এর চেয়ে বড়ো অপব্যয়ে লিপ্ত। কোথাও চিত্রকর্ম, কোথাও হারমোনিয়াম, কোথাও ছোরা-তলোয়ার কিনে অনর্থক খরচ করে রুম সাজায়। ছয় ছয় জোড়া জুতা রাখে। ফ্যাশনের জন্য দামি দামি কাপড় বানায়। কিছু মানুষের কাপড় লন্ডন থেকে সেলাই ও প্রস্তুত করে। তারা রাতদিন এমন কাজে ব্যস্ত থাকে। নিজের এই অবস্থা আর নারীদেরকে অপব্যয়ের কথা বলে।

এইসব সাহেবগণ! নারীদেরকে প্রথা থেকে বাধা দেয় যেনো তাদের দুই দিকে খরচ না হয়। তাদের এই বাধা দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মের জন্য নিষেধ করাই কাম্য এবং বাধাদানকারী নিজেও তা থেকে বিরত থাকবে।

[আল আকিলাতুল গাফিলাত: পৃষ্ঠা: ৩৪৬]

পুরুষের অভিযোগ

নারীদের কী দোষ দেবো? আমি পুরুষদেরই বলি, এমন খুব কম হয় যে, কারো মনে কিছু করতে চাইলো। এরপর সে ভেবে দেখলো, এই কাজ আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বিধান অনুযায়ী হচ্ছে কী-না? মনে যা চায় তা-ই করে ফেলে। কখনো কোনো পুরুষ কোনো মৌলভিকে জিজ্ঞেস করে না বিয়েতে এটা করা যাবে কী-না।

আর যদি কাজটি জাগতিক বিচারে কল্যাণকর হয় তাহলে ভাবার অবকাশই নেই– এটা আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বিধানপরিপন্থী হলো কী-না। কেউ যদি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা নাজায়েজ তাহলে তা শুনে না। আর শুনলেও জোড়াতালি দিয়ে তা জায়েজ করে ছাড়ে। আগে সেটা একটি গোনাহ ছিলো, এখন গণ্ডমূর্খ পর্যায়ের হয়ে গেলো এবং গোনাহের ওপর কঠোরতা করে আরেকটি গোনাহ অর্জন করলো।

[আততাবলিগ: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১০০ ও মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৩২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথা-প্রচলন বন্ধ করার পদ্ধতি

১. এসব প্রথা প্রচলন বন্ধ করার দু'টি পদ্ধতি। **এক.** সব আত্মীয় একমত হয়ে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে। দেখাদেখি অন্যান্যরাও এমনটি করবে। কিছুদিন পর এটাই সাধারণ নিয়ম হয়ে যাবে। করার প্রতিদান সেই ব্যক্তি পাবে। মৃত্যুর পরও সেই সোয়াব পেতে থাকবে। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৮১]

২. ধর্মপ্রাণ মানুষের উচিত, তারা নিজেরাও করবে না এবং যেসব অনুষ্ঠানে প্রথা পালন করা হয় তাতে কখনো অংশগ্রহণ করবে না। আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিপরীতে জাতি-গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি কোনো কাজে আসবে না। [ইসলাহুর রুসুম]

৩. না শুনে, না বুঝে শুধু প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে কোনো কাজ করবে না। তাতে ইমানের পূর্ণতালাভ করা সহজ হবে। রাসুলুলাহ [সল্লাল্লা আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

"তোমাদের কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মোমিন হতে পারবে, যতোক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত হবে।" [মেশকাতঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৬]

কিছুমানুষ বলে, আমরা দুনিয়াদার। শরিয়ত আমাদেরকে কীভাবে বাধা দেবে? আরে ভাই! জান্নাতের সামনে যখন দাঁড়াবে তখন বলে দেবে আমরা দুনিয়াদার। আমরা কীভাবে তার মধ্যে যাবো? শরিয়তকে এমন ভয়ানক বিষয় মনে করেছো যা দুনিয়াদারদের সাধ্যে নেই। অথচ শরিয়তে অনেক প্রশস্ততা বা সুযোগ আছে। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৭৬]

প্রথা-প্রচলন উচ্ছেদ করার শরয়িপদ্ধতি

প্রথা-প্রচলন দূর করার জন্য আমলের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কেননা অন্তর থেকে লিপ্সা বের হয় না কিন্তু আমল পরিবর্তনের মাধ্যমে তা দূরীভূত করা

সম্ভব। এজন্য লিপ্সা দূর করা তথা অন্তর থেকে এই রোগ দূর করার জন্য এমন করা [বৈধ ও অবৈধ সংশ্লিষ্ট সব বন্ধ করা] আল্লাহর কাছে অপারগতা হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রমাণ হাদিসশরিফ। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] একসময় তৈলাক্তপাত্রে নাবিজ [ফলের রসের তৈরি পুষ্টিকর পানীয়। যা মদ তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার হতো] বানাতে নিষেধ করেন। এরপর বলেন–

وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ فَانْبِذُوْا فِيْهَا وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ

"আমি তোমাদেরকে কিছু পাত্র থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তাতে নাবিজ বানাতে পারো। আর তোমরা সবধরনের নেশাদ্রব্য পরিহার করো।"

[মাজমাউল জাওয়ায়েদ লিল বায়হাকি: খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৪৬]

অন্যহাদিসে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে,

وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ

"কেননা পাত্র কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম করতে পারে না।"

পাত্র কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম করে না। এরপরও নিষেধ করেছিলেন যেনো যারা মদে অভ্যস্ত ছিলো তারা সামান্য নেশা অনুভব করতে না পারে। মানুষ আগে এসব পাত্রে মদ বানাতো। এজন্য মদ থেকে পুরোপুরি বাঁচতে পারবে না, গোনাহগার হবে। তাই পুরোপুরি বাঁচার পদ্ধতি হলো, এসব পাত্রে 'নাবিজ' বানানো পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। যখন মানুষ প্রকৃত মদ থেকে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হয়ে যায় এবং সামান্য নেশা বুঝে আসে তখন অনুমতি দেন।

এমনিভাবে এসব প্রথার অবস্থা হলো, মানুষ এর বাহ্যবৈধতা দেখে গ্রহণ করে অথচ তার ভেতর নিহিত খারাপগুলো চিনতে পারে না। সুতরাং কিছুদিন পর্যন্ত মূলকাজটাই পুরোপুরি বন্ধ করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। যাতে মূলকাজ বাকি থাকে এবং মন্দত্ব দূর হয়ে যায়। যখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তখন আমরা তা ছাড়া অন্যচেষ্টা কেনো করি? তাছাড়া যখন একটি পদ্ধতি যুক্তির আলোকে উপকারী মনে হয় এবং শরিয়তের আলোকে তা প্রমাণিত হয় তখন তা উপেক্ষা করার কী প্রয়োজন?

[তালিমে রমজান: পৃষ্ঠা: ৩৭]

সবপ্রথা একবারে বন্ধ করার ব্যাপারে হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মতামত

একব্যক্তি আমাকে বিয়ের প্রথাসমূহের ব্যাপারে বলে, একবারে সবপ্রথাকে নিষেধ করেন না। আমি বললাম, সেলাম সাহেব! যখন আমি একটি নিষেধ

করবো আর একটি নিষেধ করবো না তখন এই মন্দধারণা হবে যে সবপ্রথার ক্ষেত্রে উভয়টাই তো সমান। একটা কেনো নিষেধ করা হয়েছে, আরেকটা কেনো করা হয়নি। তাছাড়া বারবার নিষেধ করলে মনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে যে, এই লোক নিত্য নিত্য একটা বিষয় নিষেধ করে। আল্লাহ জানেন কোথায় গিয়ে ধরবেন। এজন্য সব একসঙ্গে নিষেধ করবো। তবে বাধ্য করবো সব একসঙ্গে ছেড়ে দিতে। তোমরা একে একে ছেড়ে দাও।

যদি কারো মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকে তাহলে প্রথমে সব একসঙ্গে বলে দাও। কিন্তু প্রথমে একটি ছাড়িয়ে দেবে, এরপর দ্বিতীয়টি, এরপর তৃতীয়টি ছাড়িয়ে দেবে।

প্রথাবিরোধীরা আল্লাহর ওলি এবং প্রিয়বান্দা

অনেক মানুষ কুৎসা ও সমালোচনার ভয়ে প্রথাপালন করে। কিন্তু যার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার ভিত আছে সে প্রথা পরিহার করতে কারো কুৎসা ও সমালোচনার ভ্রুক্ষেপ করবে না। ইমানিশক্তি ও সাহসিকতার কাছে কোনোকিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ ধর্মবিরোধিতার মুখে এমন ব্যক্তি প্রসংশারযোগ্য। আল্লাহর ওলি ও প্রিয়বান্দা। [আল আকিলাতুল গাফিলাত: পৃষ্ঠা: ৩৪৭]

প্রথাপূজারীরা অভিশাপের যোগ্য

রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, ছয়জন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ, আমি ও ফেরেশতাগণ অভিশাপ করে। তাদের মধ্যে একজন হলো, যারা মূর্খতাযুগের প্রথা চালু বা সতেজ করে।

অপর একহাদিসে রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, তিনব্যক্তির ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বেশি ক্রোধ। তারমধ্যে একজন হলো, যে ইসলামের ছায়াতলে এসে জাহেলিযুগের কাজ করতে চায়। ওপর্যুক্ত অর্থে অসংখ হাদিস রয়েছে। এই ব্যাপারে তোমরা শরিয়তের বিরোধিতা করছো। আল্লাহর জন্য বিধর্মীদের প্রথা পরিহার করো।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৬ ও আজলুল জাহিলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ৩৮১]

সবমুসলিমের দায়িত্ব

প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের দায়িত্ব হলো, এসব অনর্থক প্রথা-প্রচলন উচ্ছেদ করতে সাহস করা এবং প্রাণপণ চেষ্টা করা যেনো একটি প্রথাও অবশিষ্ট না থাকে। যেভাবে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর যুগে বিয়ে সাদাসিধেভাবে হতো এখনো যেনো সেভাবে হয়। যারা এমন চেষ্টা করবে তারা অনেক সোয়াব পাবে।

হাদিসশরিফে এসেছে, যেব্যক্তি কোনো সুন্নত মিটে যাওয়ার পর তা পুনর্জীবিত করবে সে একশো শহিদের সোয়াব পাবে।

[বেহেশতি জেওরঃ খণ্ডঃ ৬, পৃষ্ঠাঃ ৩২৮]

নারীর প্রতি আহ্বান

নারীরা চাইলে সবপ্রথা শেষ হয়ে যাবে। তাদের প্রতি আহবান হলো, তারা পুরুষকে বাধা দেবে। তাদের বাধা দেয়া অনেক কার্যকরী। কারণ, প্রথা-প্রচলনের প্রতিষ্ঠা তাদের হাতে। যখন তারা নিজেরা বিরত থাকবে এবং পুরুষকে বাধা দেবে তাহলে আর কোনো কথা হবে না।

তাছাড়া তাদের চাল-চলন ও কথা সীমাহীন প্রভাব ফেলে। তাদের কথা অন্তরে ঢুকে যায়। এজন্য তারা চাইলে খুব দ্রুত বাধা দিতে পারে।

[আততাবলিব ও ওরাউল উয়ুব]
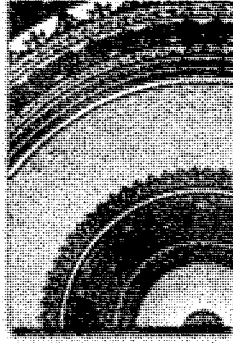
বিভিন্ন প্রথা

অধ্যায় ।১৮।
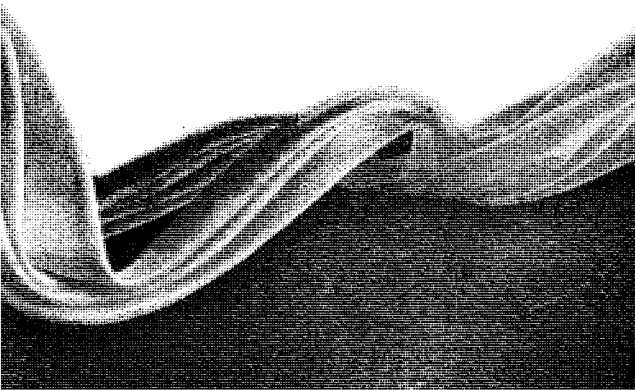
প্রথম পরিচ্ছেদ

নির্জনে বসানো এবং প্রসাধনী মাখানো

বিয়ের আগেই কনের ওপর এমন বিপদ চেপে বসে যে, তাকে কঠোর জেলে বন্দী করা হয়। যা আপনাদের পরিভাষায় বলা হয় নির্জনে বসা। আত্মীয়স্বজন ও বংশের মহিলারা একত্রিত হয়ে মেয়েকে পৃথক স্থানে বসিয়ে রাখে। এই প্রথাটাও কিছু নবউদ্ভাবিত বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথমত তাকে আলাদা বসানো আবশ্যক মনে করা। চাই সে রাগ করুক। হাকিম জালেনুস [ইউনানিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ] ও বাকরাতিজ বলেন, এমন করলে সে অসুস্থ হয়ে যাবে। যাই হোক না কেনো ফরজ কাজ! ছাড়া যাবে না।

ঘরের এককোণে আটকে রাখা হয় যেখানে বাতাসও যায় না। সারাবাড়িতে কথা বন্ধ হয়ে যায়। নিজের প্রয়োজনে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। একা একা পেশাব পায়খানায় যেতে পারে না। ফলে সে জাগতিকশাস্তি ভোগ করে।

বিপদ হলো, বন্দীশালায় নামাজ পর্যন্ত পড়তে পারে না। কেননা সে মুখে পানি চাইতে পারে না। আর বৃদ্ধামহিলাদের নিজেদেরই নামাজের গুরুত্ব নেই, তার কী খবর রাখবে? মরার সময় নামাজ মাফ নেই কিন্তু এই সময় তা কাজা করা হয়।

যদি তার অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে বংশের সবাই মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার গোনাহে অংশীদার হবে!

নারীরা লজ্জার পরীক্ষাও করে। তারা মেয়েকে সুরসুরি দেয়। যদি সে হেসে দেয় তাহলে নির্লজ্জ। আর যদি না হাসে তাহলে লজ্জাশীল। আপনি কি বলতে পারেন এসব গর্হিত বিষয় থাকার পরও এসব প্রথা জায়েজ হতে পারে?

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের বাইরেও এই বিষয়টা যুক্তিবিরোধী। এখানে মানুষকে ইতরপ্রাণী বরং জড়ে পরিণত করা হয়। শুধু এইজন্য যদি কম খাওয়ার অভ্যাস না হয় তাহলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খাবে এবং টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হবে। যা লজ্জার ব্যাপার। অনেক জায়গায় দেখা যায়, উপবাস করতে করতে মেয়ে অসুস্থ হয়ে যায়। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ –যখন কেউ ধর্মের আনুগত্য পরিহার করে তখন বিবেকও লোপ পায়। বিয়ের বিশৃংখলা তথা প্রথা কতো উল্লেখ করবো? যেকোনো প্রথা দেখতে পারো যা ধর্মপরিপন্থী তা যুক্তিবিরোধীও।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৪৫৩ ও ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৪ ও আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮৫]

গায়ে হলুদ•

যদি শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও কোমলতার জন্য গায়ে হলুদের প্রয়োজন হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। সাধারণভাবে কোনো প্রকার প্রথা-প্রচলনের মধ্যে না গিয়ে পর্দার সঙ্গে গায়ে মাখাও। ব্যস! শেষ হয়ে গেলো। এতো হৈ চৈ করার প্রয়োজন কি। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৫৪]

সেলামি ও মালিদার•• প্রথা

মহিলারা বরদেখা এবং বরযাত্রীর তামাশা দেখা ফরজ ও বরকতের মনে করে। মহিলাদের জন্য পরপুরুষকে নিজের শরীর দেখানো নাজায়েজ। তেমনিভাবে বিনা প্রয়োজনে অপরিচিত পুরুষকে দেখা নিষিদ্ধ। ফেতনার সম্ভাবনা থাকায়। বরকে যখন ঘরে ডাকা হয় তখন পর্দা পুরোপুরি নষ্ট হয়। তার কাছে অনেক নির্লজ্জ কথা জিজ্ঞেস করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না তা পাপ ও আত্মমর্যাদাহীনতার শামিল।

বরের ঘরে যাওয়ার সময় কোনো বাছ-বিচার বা হুঁশ থাকে না। অনেক কঠোর পর্দাপালনকারী নারীও সেজেগুজে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে করে, এখনতো তার লজ্জার সময়, সে কাউকে দেখবে না। ভালো বিপদের কথা! এটা কীভাবে বুঝলো সে দেখবে না? নানা প্রকৃতির ছেলে হয়। আজকালের অধিকাংশ ছেলেই মন্দপ্রকৃতির হয়। আর তারা যদি না-ই দেখলো তুমি তাকে কেনো দেখছো?

হাদিসশরিফে বলা হয়েছে, আল্লাহ অভিশাপ করেন যে দেখে এবং যাকে দেখে উভয়কে। মোটকথা সে সময় বর ও নারী সবাই গুনাহে মত্ত হয়।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৬১-৬২ ও ৭১]

জুতা লুকানো এবং হাসি-ঠাট্টা করা

বর যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন শালীরা তার জুতো লুকিয়ে রাখে। লুকানোর নামে কমপক্ষে একটাকা আদায় করে। [বর্তমানে হাজার টাকা]

শাবাশ! চুরিও করলো, পুরস্কারও পেলো। প্রথমত এমন অনর্থক কৌতুক করা যে, একটা জিনিস নিয়ে লুকিয়ে রাখলো। হাদিসে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত হাসি-অন্তরঙ্গতার বৈশিষ্ট্য। যা সঙ্কোচ দূর করে। একজন পরপুরুষের সঙ্গে এমন সম্পর্ক ও যোগাযোগপ্রতিষ্ঠা করা শরিয়তপরিপন্থী। এরপর

• এখানে মূলউর্দুতে 'উবটন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ একপ্রকার সুগন্ধি প্রসাধন। আমাদের দেশে প্রচলিত কাঁচা হলুদের মতো, যা বর-কনের গায়ে মাখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলন না থাকায় গায়ে হলুদ অর্থ করা হলো।

•• ঘি ও রুটির তৈরি একধরনের খাবার যা আমাদের দেশের শরবতের মতো বরকে খাওয়ানো হয়।

পুরস্কারকে অধিকার মনে করা একপ্রকার চাপ প্রয়োগও সীমালঙ্ঘন। অনেক স্থানে জুতা লুকানোর প্রথা নেই তবু টাকা তাদের অধিকার আছে। কেমন বাজে ব্যাপার! [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬১-৬২ ও ৭১]

কনের কোরআনখতমপ্রথা

প্রশ্নঃ আমাদের এখানের একটি প্রথা হলো, মেয়েবিদায়ের সময় সবনারী মিলে মেয়েকে কোরআনশরিফ খতম করায়। যার বিবরণ হলো, যে শিক্ষিকা মেয়েকে কোরআনশরিফ পড়িয়েছিলেন তিনি থাকেন। মেয়ে বউ সেজে কোরআনশরিফ পড়া শুরু করে। ঘরে হৈ চৈ হতে থাকে। ছেলেপক্ষের দ্রুত বিদায় নেয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যতোক্ষণ মেয়ে খতম করবে না ততোক্ষণ পর্যন্ত মেয়ে বিদায় দেয়া হয় না। খতম করার প্রতিদানে নগদ অর্থ ও কাপড়ের সেট উপহার দেয়া হয়। বিষয়টাকে এতোটা আবশ্যক মনে করে যে, যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে তাকে অভিশাপ ও গালমন্দ করা হয়। তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। লোকটা খতম করতে দিলো না এবং তা নাজায়েজ বলে। এখন ওলামায়েকেরামের কাছে জিজ্ঞাসা হলো, মেয়ে বিদায় দেয়ার সময় কোরআনশরিফ খতম করার কোনো ভিত্তি আছে কী-না? এমন প্রথাভঙ্গকারী গোনাহগার হবে না-কি সোয়াবের অধিকারী হবে?

উত্তর : জ্ঞানীব্যক্তিদের বোঝার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, একটি অনাবশ্যক জিনিসকে আবশ্যক মনে করা বেদাত। তা পরিহারকারী বা বাধাপ্রদানকারীকে গালমন্দ করা বেদাত হওয়াকে শক্তভাবে প্রমাণ করে।

যারা ধর্মীয় জ্ঞান রাখেন না তাদের জন্য আরো যোগ করা যেতে পারে। একই কল্যাণ বিবেচনা করে যদি মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক নাইওরের সময় এই প্রথার উপর আমল করে, তারা আবশ্যক করে নেয় যে, বরযাত্রীর পর যতোক্ষণ না পুরো কোরআন খতম হবে ততোক্ষণ নাইওর পাঠানো হবে না। নাইওরের লোকরা কি তা পছন্দ করবে? যদি পছন্দ না করে তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? যদি কারো প্রকৃতিতে সুস্থতা ও সুবিচার থাকে তাহলে মানতে আপত্তি থাকবে। বাকি জড়পদার্থের কোনো চিকিৎসা নেই।

[ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৪, প্রশ্ন-২৯৯]

বরযাত্রীর সবাইকে ভাড়া দেয়া

নিজের পক্ষ থেকে বরযাত্রীর সবাইকে ভাড়া দেয়া হয় নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য। এমনিভাবে আগতব্যক্তিদের এটা মনে করা যে, ভাড়া দেয়া তার দায়িত্ব। এটা একপ্রকার চাপ প্রয়োগ বা জুলুম। লৌকিক ও জুলুম উভয় স্পষ্টত শরিয়তবিরোধী। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৭৬]

উপহারে চাপপ্রয়োগ হারাম। জানতে হবে, চাপপ্রয়োগের অর্থ কী? চাপপ্রয়োগের অর্থ কেবল মাথায় লাঠি মেরে কিছু আদায় করা নয় বরং এটাও চাপপ্রয়োগের শামিল যে, না দিলে দুর্নাম হবে। গ্রহীতারা ঝগড়া করে আদায় করবে। আর বেচারা নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য দিয়ে দেয়। এর পুরোটাই হারাম। [ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৬৬]

টাকা নিয়ে বউকে নামতে দেয়া

বউকে পালকি থেকে নামতে দেয় না যতোক্ষণ তাদের প্রাপ্য দেয়া না হয়। তারা বলে, আমরা বউকে ঘরে উঠতে দেবো না। এটা جَبْرٌ فِي التَّبَرُّعِ উপহারের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ যা হারাম।

যদি এটা উপহার হয় তাহলে جَبْرٌ فِي التَّبَرُّعِ উপহারের ব্যাপারে চাপপ্রয়োগ কাকে বলে? আর যদি প্রতিদান হয় তাহলে প্রতিদানের মতো আদায় করা উচিত। তাকে বাধ্য করা প্রথাপূজা ছাড়া আর কিছুই না।

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৭৬]

[আমাদের দেশে বাসর সাজানোর জন্য বরের ছোটোভাই-বোনেরা ভাবীর কাছ থেকে যা আদায় করে]

বউ কোলে করে নামানো

বিয়ের একটি প্রথা বউকে পালকি বা অন্যবাহন থেকে কোলে করে নামানো। সে নিজে নামে না, অন্যকেউ নামায়। হাড্ডিসার, কাঠি, মোটা ও হাতি সবাই কোলে চড়ে নামে। কখনো পড়েও যায়। ব্যথাও পায়। স্বামী বউকে নামায় لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ –তাদের একটু লজ্জাও করে না। হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] এর বিয়েতে কি এসব অশ্লীলতা হয়েছিলো? কখনো না। শাদি এমন পদ্ধতিতে করো যেমনটি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] করেছেন। এটাই আল্লাহর ঘোষণার অর্থ–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তমআদর্শ।"

[সুরাঃ আহজাব, আয়াত:২১; আল ইতমাম লিনিয়ামাতিল ইসলামঃ পৃষ্ঠাঃ ২৩০]

অনেক জায়গায় কনে বরকে কোলে নেয়। কেমন আত্মমর্যাদাহীনতার কথা!

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বউয়ের পা ধোয়ানো

একটি প্রসিদ্ধপ্রথা হলো, বউয়ের পা ধুয়ে সারা ঘরে সে পানি ছিটানো। 'তাজকিরাতুল মউদুআত' গ্রন্থে এসব বিষয়কে ভিত্তিহীন ও অনর্থক বলা হয়েছে।
[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৫২]

নতুন বউয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত লজ্জা পাওয়া

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিদায়ের পরের দিন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাঁর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, সামান্য পানি আনো! হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] নিজে উঠে গিয়ে পানিপাত্র নিয়ে আসেন। এর দ্বারা বুঝে আসে, নতুন বউয়ের এতো বেশি লজ্জা দেখানো যে চলা-ফেরা করা, নিজের হাতে কোনো কাজ করাকে দোষের মনে করা সুন্নতপরিপন্থী। [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৫২ ও ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৯১]

নতুন বউয়ের জেলখানা

বিয়ের পর নতুন বউ আশ্চর্য প্রাণীতে পরিণত হয়। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ তাকে দেখতে আসে এবং আগত মানুষের ব্যাপারে তাকে জড়পদার্থে পরিণত করে। তার দৃষ্টি থাকে না, ফলে সে কিছু দেখে না। তার ভাষা থাকে না, ফলে সে কিছু বলতে পারে না। টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে অন্যরা হাত ধরে নিয়ে যায়। মুখে হাত দিয়ে রাখে। বরং হাতের ওপর মুখ রাখে। কেননা নতুন বউ উভয় হাঁটুর ওপর হাত রেখে হাতের ওপর মুখ রাখে। তখন সে মানুষের কাছে মৃতজীবে পরিণত হয়। বয়স্করা যেভাবে রাখে সেভাবে থাকতে হয়। এসব কুসংস্কার কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভালো বলবে? সে বন্দীশালায় নামাজ একদম নাজায়েজ। তেলওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের তো নামই নেই।

সবকাজ হবে কিন্তু নামাজের সময় হলে তা লজ্জার বিষয় হয়ে যায়। তা কীভাবে পড়বে? যদি কোনো নতুন বউ নামাজের কথা বলে ওজুর পানি চায় তাহলে বৃদ্ধা মহিলারা হৈ চৈ করতে থাকে এবং তার পেছনে লেগে যায়। বলে, আফসোস! এমন যুগ এসে গেলো, যখন নতুন বউয়ের চক্ষুলজ্জাও নেই!
[আততাবলিগঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১৭৮]

যদি কখনো সে নিজে পানি চেয়েও বসে তখন চারপাশে হৈ চৈ পড়ে যায়– হায় হায় কেমন নির্লজ্জতার সময় এসে গেলো! [হুকুকুল জাওজাইনঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৫৪]

মুখ দেখানো

বউকে নামানোর পর ঘরে বসানো হয়। এরপর মুখ খোলা হয়। সর্বপ্রথম শ্বাশুরি বা বংশের বড়োনারীরা বউয়ের মুখ দেখে। মুখের সামান্য অংশ দেখানো হয়। এমনভাবে মুখ দেখে যে পাশে যারা জড়ো হয় তারা কখনো দেখতে পারে না। উদ্দেশ্য তা আবশ্যক মনে করা। যা স্পষ্টত শরিয়তের সীমালঙ্ঘন।

এটা বুঝে আসে না যে, তাকে কেনো মুখে হাত দিয়ে রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়? কেউ যদি এমন না করে তাহলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বংশের মধ্যে সে নির্লজ্জ ও বেহায়া খ্যাতি পায় এবং এতো আশ্চর্য হয় যেমন কোনো বিধর্মী মুসলমান হলো এরপর জিজ্ঞেস করলো– এটা সীমালঙ্ঘন হলো কী-না?

এমন লজ্জায় লজ্জায় অধিকাংশ নতুন বউ নামাজ কাজা করে। সঙ্গের লোকজন নামাজ পড়িয়ে দেয় তাহলে ভালো নয়তো নারী আইনে এই অনুমতি নেই– সে নিজে উঠে গিয়ে অথবা কাউকে বলে কয়ে নামাজের ব্যবস্থা করে নেবে। তার চলা-ফেরা করা, কথা বলা, শরীর চুলকানো, হাই আসলে বা শরীর ম্যাজ ম্যাজ করলে হাই তোলা, শরীর মোচরানো, ঘুম আসলে শুয়ে পড়া, প্রশ্রাব-পায়খানার বেগ হলে তাদের তা জানানো পর্যন্ত নারীদের নীতিতে হারাম বরং কুফরির শামিল। আল্লাহই ভালোজানেন, সে কি পাপ করেছিলো যে তাকে কঠোর জেলখানায় বন্দি করা হলো। এরপর সব মহিলা মুখ দেখে। কোনো কোনো শহরে এই নির্লজ্জতাও আছে যে, পুরুষও নতুন বউয়ের মুখ দেখে। আসতাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ! [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮০]

চতুর্থিউৎসব

বউ আসার আগের দিন তার একজন আত্মীয় দুই-চারটা গাড়ি এবং কিছু মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আসে। এই আসার নাম চতুর্থিউৎসব। এটাও অনর্থক বিষয়কে আবশ্যক করার শামিল। তাছাড়াও এই প্রথা হিন্দুদের থেকে নেয়া। হাদিসের বর্ণনা– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যেব্যক্তি যেজাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবে সে তাদের অন্তরগত' অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

চতুর্থিউৎসবে বউয়ের ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় যাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ তাদেরকেও ডাকা হয়। তারা বউয়ের সঙ্গে পৃথকস্থানে একান্ত সাক্ষাৎ করে। অধিকাংশ সময় শরিয়তের দৃষ্টিতে তাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ। কিন্তু তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না যে, বিয়ে বৈধ এমন পুরুষর সঙ্গে একান্তে বসা বিশেষ করে সেজে-গুজে কতোটা গোনাহ ও অসম্মানের কথা। [ইসলাহুর রুসুম, পৃষ্ঠা: ৮০]

দেওর শব্দ ব্যবহর করা ঠিক নয়

আমাদের সমাজে দেওর [দেবর] শব্দব্যবহার করা হয় যা খুবই খারাপ। হিন্দুরা ওর বলে স্বামীকে। দে শব্দের অর্থ দ্বিতীয়। সুতরাং দেওর অর্থ দ্বিতীয় স্বামী। অনেক মূর্খলোক দেওরকে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত মনে করে। এজন্য এই শব্দ পরিবর্তন করা উচিত। এমনিভাবে আমার কাছে শালা শব্দটি অনেক খারাপ মনে হয়। [মালফুজাতে আশরাফিয়া: পৃষ্ঠা: ১৩৪]

প্রত্যেক ঘর থেকে শস্য মিষ্টি ও কাপড় দেয়া

বিয়ের পর দুই বছর পর্যন্ত বউ বিদায়ের সময় কিছু মিষ্টি ও কাপড় ইত্যাদি উভয় পক্ষ থেকে বউয়ের সঙ্গে যারা আসে তাদেরকে দেয়া হয়। আত্মীয়দের বিভিন্ন বাড়িতে অনেক দাওয়াত পড়ে কিন্তু সব হলো জরিমানার দাওয়াত। হয়তো দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য। অথবা সুখ্যাতি ও সুনামের জন্য আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়। এরপর এ ব্যাপারে প্রতিদান ও সমতার পুরোপুরি হিসেব করা হয়। অনেক সময় নিজে চেয়ে অভিযোগ করে দাওয়াত খায়। সেখান থেকে কিছু সমজাতীয় জিনিস যেমন, শাকপাতা, চাল, আটা, ময়দা ইত্যাদি পাঠানো হয়। বর-কনেকে কাপড় দেয়া হয় এবং এটা এতোটা আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় মনে করা হয় যে, সুদে ঋণ পর্যন্ত নেয়। তবুও তা যেনো কাজা না হয়। কিছুদিন অভ্যর্থনা ও অভিবাদন থাকে। এরপর কেউ জিজ্ঞেসও করে না ভাই আপনি কে? সবাই কথায় খুশি করে। মিথ্যা অন্তরঙ্গ মানুষ পৃথক হয়ে গেলো এখন শাস্তি ভোগ করো। জামাই-বউয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ অনর্থক খরচ করেছে তা দিয়ে যদি কোনো সম্পদ ক্রয় করা হতো বা ব্যবসা শুরু করতো তাহলে কি পরিমান লাভ হতো। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৪]

আপনি যা নিষেধ করেন তা অন্যরা নিষেধ করে না!

একব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি যেসব প্রথা নিষেধ করেন তা অন্যরা কেনো নিষেধ করে না? আমি তাকে বলি, এই প্রশ্ন তুমি আমাকে যেমন করেছো অন্যলোকদের কেনো করো না? আপনারা যেপ্রথা নিষেধ করেন না তা অমুকব্যক্তি কেনো নিষেধ করে? তার যদি জানার প্রয়োজন হয় এবং তোমার সন্দেহ থাকে তাহলে তুমি যেমন আমাকে প্রশ্ন করেছো তার উপরও প্রশ্ন হয়। আশ্চর্য কথা!

মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবকে কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি তো একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু অমুক ব্যক্তি [আমি] অংশ নেয়নি। কারণ কী? হজরত উত্তর দেন, আমি আমল করেছি ফতোয়ার ওপর এবং তিনি আমল করেছেন খোদাভীতির ওপর। তিনি বিনয়ী উত্তর দিয়েছেন। একই রকম প্রশ্ন মাওলানা মাহমুদ হাসানকে করা হলে তিনিও বিজ্ঞতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে তিনি যতোটা জানেন আমি ততোটা জানি না। তিনি বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। [আল ইফাজাত: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬৮]

অধ্যায় । ১৯ ।
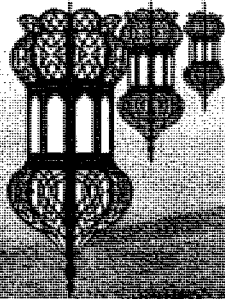
সুন্নতপদ্ধতির বিয়ে

ইসলামিশরিয়ত বিয়েকে সুন্নত ঘোষণা করেছে। প্রথাকে তার অংশ করেনি। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] এই আয়োজন করে দেখিয়েছেন। কোরআনশরিফে বর্ণিত হয়েছে–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তমআদর্শ।"

[সুরাঃ আহজাব, আয়াত:২১]

আদর্শ ও নমুনা প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, তা দেখে অন্যজিনিস তৈরি করা হবে। স্মরণ রেখো! আল্লাহতায়ালা বিধান অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ণাঙ্গ বিধান। তার বাস্তব দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-কে। এখন যদি তোমার আমল আদর্শ ও নমুনা অনুযায়ী হয় তাহলে ঠিক, নয়তো ভুল। তোমার নামাজ যদি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর নিয়ম অনুযায়ী হয় তাহলে তা নামাজ হবে, নয়তো কিছুই হবে না।

এমনিভাবে একই কথা লেনদেন ও সামাজিক আচরণের ব্যাপারে। আল্লাহ আমাদের কাছে ফেরেশতাকে নবি করে পাঠাননি। তার রহস্য হলো, যদি ফেরেশতা নবি হয়ে আসতো তাহলে সে আমাদের জন্য আদর্শ হতো না। তার না খাওয়ার প্রয়োজন হতো না কাপড়ের প্রয়োজন হতো, না বিয়ে-শাদির প্রয়োজন না সামাজিক লেনদেন ও আচরণের। এসব বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে সে কেবল আমাদেরকে পড়ে পড়ে শেখাতো।

আল্লাহ তা করেননি। তিনি আমাদের সমগোত্রীয় নবি পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের মতো পানাহার করেন। স্ত্রী-কন্যা ও আত্মীয়তা রাখেন। সামাজিক জীবন ও সামাজিকতায় অভ্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যাতে গ্রন্থে বিধান থাকে এবং নবি নিজে তা আমল করে দেখান। এতে করে উম্মতের জন্য আমল করতে সহজ হয়। মানুষ জীবনে যা কিছুর মুখোমুখি হয় তিনিও তার মুখোমুখি হন। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর স্ত্রী ছিলো। নিজের সন্তানদের বিয়ে দিয়েছেন। এখন দেখো! আমাদের কোন কাজ আদর্শ অনুযায়ী হচ্ছে? কোনো খুশির অনুষ্ঠান হলে আমরা ভেবেই দেখি না রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] এর কর্মপদ্ধতি কী।

[মোনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৫০-৪৫৬]

হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে ও কন্যাদান

বিয়ের সময় রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] একজন সাহাবিকে বলেন, যাকে সামনে পাও তাকেই ডেকে আনো। না আগে থেকে কোনো আয়োজন ছিলো, না পরে কোনো জমায়েত হয়েছে। কোনো বিশেষ আয়োজনও হয়নি। অথচো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ইচ্ছা করলে আকাশের ফেরেশতাকে ডেকে আনতে পারতেন। তিনি শুধু কয়েকজন মানুষকে ডাকেন। যাদের মধ্যে হজরত তালহা, হজরত আনাস, হজরত জোবায়েরসহ আরো দুই একজন সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] উপস্থিত ছিলেন। শুনে আশ্চর্য হবে, হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে مُعَلَّق [ঝুলন্ত] বিয়ে পড়ান। হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর কাছে খবর পৌঁছলে তিনি গ্রহণ করে নেন।

এখন শুনো কন্যাদানের কথা। বিয়ের পর উম্মেআয়মানকে বলেন ফাতেমাকে পৌঁছে দিতে। তিনি বোরকা চাদর পরিয়ে হাত ধরে তাঁকে পৌঁছে দেন। অর্থাৎ ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-কে উম্মেআয়মান [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর সঙ্গে হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর কাছে পৌঁছে দেন। না ছিলো পালকি না রথ, না দামি বরযাত্রী; পায়ে হেঁটেই যান তাঁরা।

তিনি উম্মতের জন্য দৃষ্টান্তস্থাপন করেছেন– কী করতে হবে। এসব কথা কি শুধুই গল্প না আমাদেরকে শেখানোর জন্য করা হয়েছে?

বন্ধুগণ! এই ছিলো উভয়জগতের বাদশাহের কন্যাদান। যেখানে না ছিলো ধুমধাম, না ছিলো পালকির বাহন, আর না হয়েছে কোনো হৈ চৈ, না এসেছে বরযাত্রী। নিজের মর্যাদা রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর মর্যাদার চেয়ে বেশি ভেবো না।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৪৮ ও ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯১]

কন্যাবিদায়ের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ

বর্তমানে মেয়ে বিদায়ের সময় পিতা খেয়ালই করে না সময় উপযুক্ত কী-না। যখন খুশি বরযাত্রীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। রাস্তায় ডাকাত পড়ুক না কেনো কোনো হুঁশ নেই। ছেলেপক্ষের খেয়াল করার কী প্রয়োজন? কিন্তু মেয়ের পিতার বুঝে-শুনে মেয়ে বিদায় দেয়া উচিত।

অধিকাংশ সময় আসরের সময় বরযাত্রী বিদায় নেয়। আর মেয়ের বাবা-মায়ের ওপর অভিশাপ নামে যে, তারা সেই সময় বিদায় দেয়। যেনো এখন আমাদের এ জিনিস আর প্রয়োজন নেই। নয়তো তার নিরাপত্তার কথা আগের চেয়ে বেশি ভাবা প্রয়োজন। কেননা আল্লাহই ভালো জানে সাজ-সজ্জার অবস্থায় কোন

পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। যখন মানুষ ধর্ম পরিহার করে তখন তাদের জ্ঞানও লোপ পায়। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৩৬৭-৩৬৮]

বিয়ে সবচেয়ে সহজকাজ

শরিয়ত বিয়ের ব্যাপারে কতো সহজতা ও আরামের শিক্ষা দিয়েছে। বিপরীতে যা উদ্ভাবন করেছি তাতে কতো সমস্যা। বিয়ে যতোটা সংক্ষিপ্ত অন্যকিছু এতোটা সংক্ষিপ্ত নয়। সবকিছুতে পয়সা লাগে কিন্তু বিয়েতে একপয়সাও খরচ হয় না। মানুষের থাকার ঘর লাগে তাতে পয়সা লাগে। খাওয়া-পরার জন্য পয়সা লাগে। কিন্তু বিয়েতে একপয়সাও লাগে না। কেননা বিয়ের রোকন [মূল স্তম্ভ] হলো, إِيْجَابٌ বা প্রস্তাব ও قَبُوْل বা গ্রহণ। মুখে শুধু দু'টি শব্দ বললে হয় তাতে কী-ই বা খরচ হয়!

যদি বলো বিয়েতে কীভাবে খরচ লাগে না? খোরমা বিলি করা হয়। মহরের টাকা লাগে। তার উত্তর হলো, খোরমা ছিটানো ওয়াজিব নয়। আর মহর অধিকাংশ সময় বাকি থাকে। বিয়ের মূল বিষয় আক্‌দ [কবুল বলা]। বিয়ের 'আক্‌দ' করতে একপয়সাও লাগে না। থাকলো ওলিমা। তা-ও সুন্নত, ওয়াজিব বা ফরজ নয়। সেটাও হয় বিয়ের পর। আগে ওলিমা [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] সুন্নত ছিলো। এখন আমরা তা ওয়াজিব ধরে নিয়েছি। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ ওলিমা প্রথাগত। শুধু অহমিকা প্রকাশের জন্য করা হয়। সম্পূর্ণ অর্থটাই অপচয়। ভাবলে দেখা যাবে, আমাদের অধিকাংশ অর্থ অহঙ্কার ও অহমিকা প্রকাশের পেছনে ব্যয় হয়।

[আল ইতমাম লিনিয়ামাতিল ইসলাম মুলহাকায়ে মাহাসিনে ইসলাম: পৃষ্ঠা: ২২৪]

বিয়ে-শাদি সাদাসিধে হওয়াই কাম্য

হাদিসে প্রমাণিত, বিয়ে অত্যন্ত সাদাসিধে বিষয়। কিছু বর্ণনায় এসেছে, যখন হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিয়ে হয় তখন হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বিয়ে পড়িয়ে বলেন, إِنْ رَضِيَ عَلِيٌّ 'যদি আলি রাজি থাকে।' যখন হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] খবর পান তখন বলেন, 'আমি গ্রহণ করলাম'। কেমন সাদাসিধে বিয়ে, বর উপস্থিত নেই।

কারণ হিসেবে অনেকে বলেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর কাছে কী-ই বা ছিলো। দরিদ্র অবস্থার মধ্যে ছিলেন। যাকে হজরত জিবরাইল [আলাইহিস সালাম] পাহারা দেন। যদি তিনি চাইতেন তাহলে জান্নাত থেকে ফেরেশতারা উপহার-কাপড় নিয়ে আসতো। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া

সাল্লাম]-এর মর্যাদা সম্পর্কে কী জিজ্ঞেস করবে? আল্লাহর ওলিদের আশ্চর্য শান ও মর্যাদা। তাদের চাওয়াই ফেরানো হয় না। আর রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাকতো? কখনোই না।

[আল আকিলাতুল গাফিলাত: পৃষ্ঠা: ৩৪৬]

বিয়ের সহজ ও সাধারণ পদ্ধতি

বাগদানের জন্য মৌখিক অঙ্গীকার যথেষ্ট। না হৈ চৈ-এর দরকার আছে না পোশাকের, না স্মারকের, না শিরনির। যখন ছেলে-মেয়ে উভয়ে উপযুক্ত হয়ে যায় তখন মৌখিকভাবে বা চিঠির মাধ্যমে কোনো সময় নির্ধারণ করে বরকে ডাকা হবে। তার একজন অভিভাবক এবং তার একজন সেবক সঙ্গে আসবে। কোনো মেকআপ ও প্রসাধনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই বরযাত্রীর। উপস্থিত বিয়ের সময়। কিংবা দুই একজন মেহমান রেখে মেয়ে বিদায় দেবে। নিজের সাধ্য অনুযায়ী যতোটুকু প্রয়োজনীয় ও উপকারী জিনিস উপহার দেয়ার ইচ্ছা থাকে তা ঘোষণা ছাড়া তার বাড়ি পৌঁছে দেবে অথবা নিজের ঘরে তাকে বুঝিয়ে দেবে। না শ্বশুরবাড়ির পোশাকের প্রয়োজন, না চতুর্থিবহরের দরকার আছে। যখন ইচ্ছা মেয়েপক্ষ দাওয়াত দেবে। যখন সুযোগ হবে ছেলেপক্ষ ডাকবে। যদি সুযোগ হয় তাহলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অভাবী মানুষ কিছু দান করবে। কোনো কাজ করার জন্য ঋণ করবে না। ওলিমা [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন] সুন্নত। তা-ও শুধু আল্লাহর জন্য করবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে। অহমিকার সঙ্গে সুখ্যাতির জন্য করবে না। নয়তো এমন ওলিমা নাজায়েজ। হাদিসে এমন ওলিমাকে নিকৃষ্টখাদ্য বলা হয়েছে। এমন ওলিমা করা এবং অংশগ্রহণ করা কোনোটাই জায়েজ নেই। [ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৮৮]

সহজ ও সাধারণ বিয়ের উত্তমদৃষ্টান্ত

মিয়া মোহাম্মদ মাজহার [হজরত থানভির সবচেয়ে ছোটোভাই]-এর বিয়ে সম্পূর্ণ সাধারণভাবে হয়েছিলো। শুধু একটি গরুর গাড়ি ছিলো, যাতে মাজহার ও মৌলভি সাব্বির ছিলো; সে তখনো ছোটো ছিলো। তাকে নেয়া হয়েছিলো হয়তো ঘরে আসা-যাওয়া এবং কোনো কথা বলার জন্য প্রয়োজন হবে। সেখানে গিয়ে জানা গেলো, সেখানেও কোনো ধুমধাম নেই। শুধু বিশেষ বিশেষ আপনজনদের ডাকা হয়েছে। যাদের সংখ্যা ছয়-সাতজনের বেশি হবে না। এদেরও বংশ ও গোষ্ঠী ছিলো। কিন্তু তারা শুধু এজন্য ক্ষুব্ধ ছিলো যে, কোনো প্রথা পালন করা হয়নি। বিষয়টা যখন আমি জানতে পারি তখন মেয়েপক্ষকে বলি– স্পষ্ট বলে দাও, যদি মনে চায় তাহলে অংশগ্রহণ করবে নয়তো ঘরে বসে থাকো। আমাদের শরিক করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা দাওয়াতই

কবুল করেনি। কিন্তু আমার স্পষ্ট কথা শুনে সবাই ঠিক হয়ে যায়। হাত ধুয়ে দস্তরখানে বসে পড়ে। পরে জানা গেছে, মেয়ের মা সাধারণভাবে বিয়ে হওয়াতে খুব কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করেছে। যদি বেশি হৈ চৈ হতো তাহলে তার কাছে একটি সোনার হার ছিলো তা-ও থাকতো না। ঋণ করতে হতো।

এই মেয়ের মা আমার বড়োঘরের [১ম স্ত্রীর] আপন খালা হতো। এজন্য আমি তাঁকে সামাজিক খালা হিসেবে ডাকতাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, মেয়েকে কখন বিদায় দেবেন? তিনি বলেন, এসব কাজ তাড়াহুড়োয় হয় না। তাড়াহুড়ো করলে কিছু খাবেও না, কিছুক্ষণ থাকবেও না।

আমি বলি, খাবার তৈরি করে সঙ্গে দিয়ে দেবেন যেখানে ক্ষুদা লাগে খেয়ে নেবে। অবস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই। যখন তিনি পুনরায় তার মত পেশ করলেন তখন আমি বলি, আচ্ছা আপনি যখন কন্যাদান করবেন তখন আমি চলে যাবো। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি দেরি করে মেয়ে বিদায় দেন তাহলে রাস্তায় জোহরের সময় হবে। আমি আমার দায়িত্বে মেয়েকে নামাজ কাজা করতে দেবো। তখন তাকে গাড়ি থেকে নামতে হবে। আপনারা বুঝেন, মেয়ে নতুন বউ সেজে থাকবে। উড়না চাদর পরে থাকে। আতর, তেল, সুগন্ধি মেখে থাকবে। এটা জানা কথা, বাবলা ইত্যাদি গাছে ভূত-পেতনি থাকে যদি কোনো পেতনির আচড় লাগে তাহলে আমার কোনো দায় থাকবে না। কথাটা মহিলাদের রুচি অনুযায়ী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝে আসে। বলতে থাকে, না ভাই, আমি বাধা দিচ্ছি না। আপনার মন চাইলে যেতে পারেন। আমি বলি, ফজর নামাজের পর সঙ্গে সঙ্গে রওনা হবো। তিনি রাজি হন।

টাকা বিতরণ করা

যখন সকাল হলো, বিদায়ের সময় তাদের একটা প্রথা ছিলো 'টাকা বিতরণ করা'। কন্যাদানের সময় গ্রামে কিছু টাকা বিতরণ করা হয়। আমি বলি, কিছু টাকা অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করো। কিছু টাকা মসজিদের দাও। যাতে মানুষ কৃপণতার সন্দেহ না করে।

এই বিয়ে সম্পর্কে শুনেছি, মানুষ পরে বলতো- বিয়েতো তাকেই বলা হয় যা অন্তরে সতেজতা সৃষ্টি করে, প্রশস্ততা সৃষ্টি করে; মনের দুয়ার খুলে দেয়। দুনিয়াদার মানুষই এই কথা বলেছে। সত্যিই শরিয়তের আমল করলে অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। [আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬০]

হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দায়িত্বে বিয়ে

আমি একবিয়েতে মুরব্বি হয়ে যাই। প্রথম থেকে কথা ছিলো কোনো প্রথাপালন করা যাবে না। আসরের পর বিয়ে হয়ে গেলো। মাগরিবের খাবার আসলো।

নাপিতও হাত ধুয়ে অপেক্ষায় থাকলো– তারও কিছু মিলবে। কিন্তু কিছু পেলো না। খাওয়ার পর অপেক্ষায় থাকলো। শেষে আমার সামনে একটি থালা রেখে বললো, হজরত আমাদের প্রাপ্য দিন। আমি বললাম, কেমন প্রাপ্য? আইনত প্রাপ্য না-কি প্রথাগত প্রাপ্য? তুমি তোমার মালিককে বলো, তিনি কেনো সব প্রথা বন্ধের কথা মেনে নিয়েছিলেন?

তখন একজন মৌলভি সাহেব খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এটা প্রথাগত প্রাপ্য নয় বরং সেবার প্রাপ্য। সেবকদের দেয়া ভালোকথা।

আমি তার উত্তরে উচ্চকণ্ঠে বললাম, সেবার প্রাপ্য নিজের সেবককে দেয়া হয় না-কি দুনিয়ার সব সেবককে দেয়া হয়? আমার নাপিত আমার সেবা করে। আমি তাকে কিছু দিলে সেটা তার প্রাপ্য। অন্যের সেবক আমার ওপর কী প্রাপ্য রাখে? আমার বিবরণে মৌলভি সাহেবের চোখ খুলে যায়।

সকালবেলা খরচের তালিকা সম্পর্কে আলোচনা হলো। প্রথাপূজারীদের একটি তালিকা হয় যাতে তাদের সেবকদের প্রদেয় সম্পর্কে লেখা থাকে। কিন্তু তাদের কারো সাহস ছিলো না আমার সামনে তা পেশ করবে। আমার একজন বন্ধু ছিলো, তারা তার মাধ্যমে উপস্থাপন করে। সে আমাকে বলে, এ ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কী? আমি বলি, সেদিন রাতের সিদ্ধান্তই বহাল আছে।

তারা তালিকা পেশ করে। নাপিত দিয়ে কাজ তারা করিয়েছে, ভাস্তি দিয়ে তারা পানি ভরিয়েছে আর মজুরি দেবো আমরা?

মেহমান দিয়ে মজুরি দেওয়ানো কেমন হীনমন্যতার কথা! প্রথার পেছনে পরে বিবেক হারিয়েছে। এখন আত্মমর্যাদা লোপ পাচ্ছে।

কন্যাদানের সময় হলে মেয়েপক্ষ দাবি করে, পালকি বা গরুর গাড়ি আনতে হবে। পালকি বা বাহন ছাড়া কন্যাদান হবে না। আমি বলি, এমন কন্যাদান আমরা চাই না। সাথীরা জিজ্ঞেস করলো, সিদ্ধান্ত কী? আমি বললাম, এটাই সিদ্ধান্ত। কেননা বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি, তোমরা নিজেরাই বউ নিয়ে আমাদের পিছে পিছে আসবে। তখন সোজা হয়ে যায়।

এরপর বলে উপহর নেয়ার জন্য ঠেলাগাড়ি আনতে হবে। আমি বলি, আমরা উপহার নেই না। শেষপর্যন্ত ঠেলাগাড়িও তারা আনে। মহিলারা আমাদের সঙ্গে মল্ল করতে থাকে। তারা মজলুম বা অপারগ ছিলো। কিন্তু জালেমের কথা শুনে থমকে যায়। এমন বরকতময় বিয়ে হয় যে, উভয়পক্ষের বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু এক পয়সাও খরচ হয় না। হাদিসের ভাষ্যমতে, বরকতময় বিয়ে যাতে সবচেয়ে খরচ কম হয়।

বরের আরেক ভাইয়ের বিয়ে প্রথা-প্রচলন মতে হয়। সে ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। আমি বলি, একবিয়ে করে ঋণগ্রস্থ হয়েছে। আরেকটি করলে শেষ হয়ে যাবে।

ঋণগ্রস্থের স্ত্রীর মল্ল ছিলো, তার মা-বাবা ও শ্বশুর-শ্বাশুরির চেষ্টা ছিলো। তার কি দোষ? রুটি কম পড়লে তো আমাদের ছোটো হতে হবে।

[আল ইতমাম লিনিয়ামাতিল ইসলাম মুলহাকায়ে মাহাসিনে ইসলামঃ পৃষ্ঠাঃ ২২৮]

আমার মেয়ে হলে যেভাবে বিয়ে দিতাম

যদি এমন সুযোগ আসতো তাহলে আমার খেয়াল হলো, আমি বিয়ের জন্য বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করতাম না। সফরে এতো টাকা নষ্ট করতাম না। ছেলেপক্ষকে লিখতাম– ছেলে, তার একজন মুরব্বি ও তার সেবক সব মিলে চার-পাঁচজন এখানে চলে এসো। এই বাড়িতে অথবা এর চেয়ে ভালো প্রশস্ত একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে তাদেরকে রাখতাম। মেয়েকে ঘরের কাপড় পরাতাম এবং ছেলেকে বাধ্য করতাম নিজ পোশাকে আসতে। বিয়ের অনুষ্ঠানে কাউকে বিশেষভাবে ডাকতাম না। মহল্লার মসজিদে সবাইকে নামাজ পড়তে নিয়ে যেতাম। নামাজের পর বলতাম, সবাই কিছুক্ষণ থাকুন। ঘোষণা ও সাক্ষ্যর জন্য এতোটুকু জমায়েত যথেষ্ট। নিজে অথবা অন্যকোনো আলেমের মাধ্যমে বিয়ে পড়িয়ে দিতাম। এক দুই টাকার খোরমা ছিটাতাম। এতে মসজিদে বিয়ে পড়ানোর সুন্নতও আমল হয়ে যাবে।

সেখান থেকে বাড়ি ফিরে তখনই অথবা যখন উপযুক্ত সময়, মেয়েকে উপহার ছাড়া ভাড়াবাড়িতে বিদায় দিতাম। একজন বিশ্বস্ত সেবিকা সঙ্গে দিয়ে দিতাম। দ্বিতীয়দিন ভাড়াবাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতাম। এক-দুইদিন রেখে এরপর আবার ভাড়াবাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম। যখন দেখতাম ছেলে-মেয়ে অন্ত রঙ্গ হয়ে গেছে তখন ছেলের সঙ্গে তার গ্রামে পাঠিয়ে দিতাম।

উপহার হিসেবে পাঁচটি পোশাক, পঞ্চাশ টাকার অলঙ্কার এবং পাঁচশো টাকার স্থাবর সম্পদ দিতাম। বাসনপত্র, লোটা, বাটি, খাট ও তোষক কিছুই দিতাম না। বর-কনের আত্মীয়দেরকে একটি কাপড়ের টুকরোও দিতাম। সারা জীবন বিভিন্ন সময়ে আমার যখন যা মন চাইতো তখন মেয়ে-জামাইকে তা দিতাম। আত্মীয়-স্বজন ও প্রচলন অনুযায়ী নয়। স্থাবর সম্পদ তাদের গ্রামে হলে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আর আমাদের গ্রামে হলে নিজে তার দেখা-শোনা করতাম। তার থেকে যে উপার্জন হতো তা ছয় মাস বা বছর শেষে হিসাব বুঝিয়ে করতাম।

তবে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি না। আমি শপথ করে বলি, আমি জোরও দিতে চাই না, বাধা দেয়াও পছন্দ করি না। শুধু নিজের খেয়াল প্রকাশ করলাম। অন্যকে বাধ্য বা বাধা দেবো না। যদি কোনো ব্যক্তি বৈধতার সীমার মধ্যে থেকে নিজের সাধ্য অনুযায়ী করে তাহলে খারাপ মনে করো না। কাউকে পাপী বলো না। শরিয়তের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনার উপযুক্ত মনে করো না।

অধ্যায় ।২০।
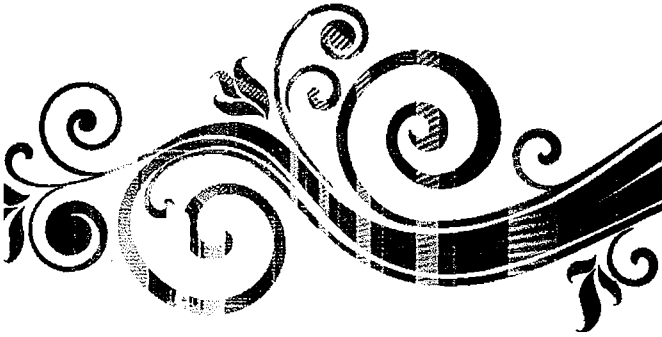
কন্যাদানের পর

অলঙ্কার, মেকআপ ও সাজ-সজ্জার শরয়িবিধান

একটি বিষয় নিরীক্ষার প্রয়োজন। যদি কোনো ব্যক্তি সৌন্দর্যের জন্য কোনো কিছু ব্যবহার করে যেমন, উত্তমপোশাক; তাহলে তা জায়েজ হবে কী-না? উত্তর হলো, জায়েজ। কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। যাতে দাম্ভিকরা সুযোগ পেয়ে যায়। বরং এখানে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। যা আমি কোরআন-হাদিস থেকে বুঝেছি।

তাহলো, উত্তমপোশাক যদি নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য অথবা অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা কারো সম্মানে পরিধান করে তাহলে জায়েজ। উত্তমপোশাক এই নিয়তে পরা হারাম যে, এতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে। অন্যের চোখে বড়ো হওয়া যাবে। মোটকথা পোশাক ইত্যাদির চারটি স্তর। এক. প্রয়োজন; দুই. আরামপ্রদ; তিন. সৌন্দর্য। এই তিনটি স্তর নির্দোষ। বরং প্রথম স্তর ওয়াজিব এবং চার. প্রদর্শন– যা হারাম। এই স্তর বিন্যাস ও বিধান পোশাকের সঙ্গে বিশেষিত নয়। প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে এই স্তর রয়েছে। এক. প্রয়োজন; দুই. আরামপ্রদ; তিন. সৌন্দর্য এবং চার. প্রদর্শন। শেষকথা অন্যের চোখে অবস্থান বাড়ানোর জন্য সাজ-সজ্জা করা হারাম। বস্তুত মৌলিকভাবে সাজ-সজ্জা করা হারাম নয়। [আততাবলিগঃ পৃষ্ঠাঃ ২৬ ও ৬৯ এবং ওয়াজু নিয়ামুল মারগুবাহ]

১. প্রয়োজনেরও স্তর রয়েছে। **এক.** যা ছাড়া কাজ চলে না। এটা শুধু নির্দোষ নয় বরং ওয়াজিব।

২. অনেক বিষয় ছাড়া কাজ চলে। কিন্তু তা হলে আরাম হয়। না হলে কষ্ট হবে তবে কাজ হয়ে যাবে। এমন জিনিসগ্রহণ করা জায়েজ।

৩. অনেক বিষয় এমন তা কোনো কাজে আসে না। তা না হলে কষ্টও হয়। তবে হলে আত্মতৃপ্তিলাভ করা যায়। আত্মতৃপ্তির জন্য নিজের সাধ্য অনুযায়ী কোনো জিনিসগ্রহণ করলে দোষের কিছু নেই। জায়েজ।

৪. অনেক জিনিস অন্যকে দেখানোর জন্য বা অন্যের চোখে বড়ো হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। যা হারাম।

প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের যে স্তর আমি বর্ণনা করলাম তা প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চালের ব্যাপারেও চুলার ব্যাপারেও।

কোনো জিনিসের প্রয়োজনের মাপকাঠি হলো, যা ছাড়া কষ্ট হয়। যা না হলে কষ্ট হয় না তা প্রয়োজন নয়। এখন যদি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আত্মতৃপ্তিলাভের নিয়ত করে তাহলে জায়েজ। আর অন্যের চোখে বড়ো হওয়ার নিয়ত থাকে তাহলে হারাম। এই অনুযায়ী আমল করো।

[গারিবুদ দুনিয়া ও আততাবলিগ: পৃষ্ঠা: ১৬৫-১৬৭]

নববধূর অপ্রয়োজনীয় লজ্জা

ভারতবর্ষে এমন বাজে প্রথা যে, বিয়ের পরও বর-কনের মাঝে পর্দা থেকে যায়। হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর বিদায়ের পরের দিন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তাঁর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, সামান্য পানি আনো। হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] নিজে উঠে গিয়ে পানিপাত্র নিয়ে আসেন। এরপর হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর কাছে পানি চান। যা থেকে জানা যায় হজরত ফাতেমা [রদিয়াল্লাহু আনহা] আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর সামনে পানি আনেন।

এর দ্বারা বুঝে আসে, নতুন বউয়ের এতো বেশি লজ্জা করা, চলা-ফেরা করা, নিজে কোনো কাজ করা দোষের মনে করা সুন্নতবিরোধী।

নিজের বউদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো সারা বছর মুখে হাত দিয়ে রাখে।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯১ ও মুনাজায়াতুল হাওয়া: পৃষ্ঠা: ৪৫২]

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর আলাদা থাকা

অনেক বুদ্ধিমান মানুষ কন্যাদানের সময় স্বামীকে বলে, সাবধান! এখন মেয়েকে কিছু বলো না। বিষয়টা খুবই বাজে। একটি কবিতার অর্থ–

তুমি আমাকে কাঠের পাটাতনের সঙ্গে বেঁধে নদীর গভীরে নিক্ষেপ করেছো
এবং বলছো, উড়তে থাকো আঁচল যেনো না ভিজে।

[আজলুল জাহিলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ৩৬৯]

বিয়ের পর স্ত্রীর কাছ থেকে সামান্য দূরত্ব কষ্টকর। ছেলেরা কী অভিযোগ করবে? তুমিও এমন সময় স্ত্রী থেকে দূরে ছিলে? [রুহুস সিয়াম: পৃষ্ঠা: ১৬৯]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাসররাতে নফল নামাজ

বাসর রাতে নফল নামাজ পড়ার কথা কোনো হাদিসে পাইনি। কিন্তু ওলামায়েকেরাম থেকে শুনেছি, প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করবে– "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম থেকে বাঁচিয়েছেন এবং হালাল প্রদান করে সাহায্য করেছেন।" এরপর দোয়া করবে। সুতরাং সুন্নত মনে না করে শুধু কৃতজ্ঞতা হিসেবে নামাজ আদায় করলে কোনো সমস্যা নেই। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৮২]

অনর্থক লজ্জা

শরিয়ত বুদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল করে এই হুকুম প্রদান করেছে– 'স্ত্রীর সামনে লজ্জা পরিহার করো।' এতো বেশি লজ্জা ভালো না যে, স্ত্রী স্বামীকে আর স্বামী স্ত্রীকে লজ্জা করবে।

লজ্জা-শরম ইত্যাদি ততোক্ষণ কাম্য যতোক্ষণ তা আল্লাহর নৈকট্যলাভের কারণ হয়। যখন তা আল্লাহ থেকে দূরে সরার কারণ হয় তা পরিহার করা উচিত। অনেক মানুষ অধিক লজ্জার কারণে স্ত্রীর সঙ্গে পেরে উঠে না। তাদের উচিত লজ্জার মাত্রা কমিয়ে ফেলা এবং মন খুলে হাসি-ঠাট্টা করা।

[আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২২২]

কিছু আদব-শিষ্টাচার

১. সালাম করবে, এতে ভালোবাসা বাড়বে। যেব্যক্তি প্রথমে সালাম করে সে বেশি সোয়াব পায়। চলন্তব্যক্তি বসাব্যক্তিকে। ছোটোরা বড়োকে সালাম করবে। করমর্দন করলে অন্তর পরিষ্কার হয়। [তালিমুদ্দিন: পৃষ্ঠা: ৪৮-৪৯]

২. কারো কাছে গেলে সালাম বা অন্যকোনোভাবে তাকে তোমার আগমনের কথা জানাও। জানানো ছাড়া চুপ করে এমনভাবে আড়ালে থেকো না যে, তিনি তোমাকে দেখতে পান না। [আদাবে জিন্দেগি: পৃষ্ঠা: ৪১]

৩. যখন সাক্ষাৎ করবে খোলামনে সাক্ষাৎ করবে। হাসিমুখে দেখা করা উচিত যাতে সে খুশি হয়। [তালিমুদ্দিন: পৃষ্ঠা: ৫১]

৪. পৃথিবীতে স্ত্রীর চেয়ে আপন কোনো বন্ধু হয় না। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা ইবাদত। কেননা মোমিনের অন্তর খুশি করা ইবাদত।

[হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ২২ ও আনফাসে ইসা: পৃষ্ঠা: ৩৮৯]

৫. হাদিসে এসেছে, স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়া সদকা। তার সোয়াব পাওয়া যায়। [রফউল ইলতিবাস: পৃষ্ঠা: ১৪৪]

৬. আত্মমর্যাদার দাবি হলো, স্ত্রীর মহর মাফের দাবি মেনে না নেয়া বরং তুমি তার প্রতি আন্তরিক হও। স্ত্রী যদি মাফ করে দেয় তবুও তা আদায় করে দেয়া উচিত। কেননা এটা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীর দয়াগ্রহণ করবে না। [আনফাসে ইসা: পৃষ্ঠা: ৩৮৯ ও হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩২৩]

মনের ভাব ও হাসি-ঠাট্টার প্রয়োজনীয়তা

যে হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক দ্বারা উদ্দেশ্যিত ব্যক্তির অন্তরের খুশি ও সঙ্কোচ দূর করা উদ্দেশ্য হয় তা কল্যাণকর। [আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮৯]

কারো মন খুশি করার জন্য হাসি-কৌতুক করলে সমস্যা নেই। কিন্তু দু'টি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। **এক.** মিথ্যা বলবে না। **দুই.** তার মনে কষ্ট দেবে না।

[তালিমুদ্দিন: পৃষ্ঠা: ৪৮-৪৯]

পুরুষের ভালোবাসা প্রকাশ করা উচিত

অনেক পুরুষের সন্দেহ হয়, পুরুষ ভালোবাসা প্রকাশ করে কিন্তু মহিলা ভালোবাসা প্রকাশ করে না। কিন্তু তার কারণ হলো, পুরুষের জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করা সৌন্দর্য। আর মহিলার জন্য তা দোষ। তার লজ্জা-শরম প্রতিবন্ধক হয়। তার অন্তরে ঠিকই সব থাকে। [আল ইফাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২০৮]

ভারতবর্ষ ও আরবের প্রথাগত পার্থক্য : একটি সতর্কতা

আরবের প্রথা হলো, স্বামী যখন বাসররাতে স্ত্রীর কাছে আসে তখন স্ত্রী স্বামীর সম্মানে দাঁড়ায়, সালাম করে। স্বামী নিজের অতিরিক্ত কাপড় যা ঝুলে থাকে তা নিয়ে ভদ্রতার সঙ্গে যথাযথ স্থানে রেখে দেয়। খাজা সাহেব বলেন, খুব ভালো কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য আমি তা পছন্দ করি না। কারণ, সেখানে এতে কোনো সঙ্কোচ থাকে না। কিন্তু বক্রস্বভাবের জন্য তাতে স্বাধীন ও নির্লজ্জ হয়ে যাবে। যা লজ্জার তা অবশিষ্ট রাখাটাই শ্রেয়।

স্ত্রীর কপালে সুরা ইখলাস লেখা

অনেক স্থানে স্ত্রীর কপালে 'কুলহু আল্লাহ' লেখার প্রচলন আছে। 'কুলহু আল্লাহ'-এর মধ্যে 'ইখলাস' তথা সততা ও একান্ততার অর্থ আছে। স্ত্রীর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মানুষ এই ধারণা থেকে

লিখে– স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা অন্তরঙ্গতা বজায় থাকবে। তারা ইখলাসের অর্থ ভালোবাসা বুঝেছে, নয়তো ভালোবাসার আয়াত লিখতো। প্রথমত ইখলাসের অর্থ ভালোবাসা বলা ভুল। আল্লাহর নামে অবশ্যই বরকত আছে কিন্তু সম্পর্ক খুঁজলে 'কুলহু আল্লাহ'-এর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যকোনো আয়াত যার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে তা পড়ে নেবে। আর যদি লিখতে হয় তাহলে সম্পর্ক আছে এমন আয়াত লেখা উচিত। এরপর কনের কপালে যে লিখবে সে তার মাহরাম [যার সঙ্গে বিয়ে বৈধ নয়] হতে হবে। অনেকে বিয়ে বৈধ এমন লোকের দ্বারা লেখায়। যা কখনো জায়েজ নয়। যার সংশোধন আবশ্যক।
[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৫৮]

বাসররাতের বিশেষ দোয়া

সুন্নত হলো, তার কপালের চুল ধরে আল্লাহর কাছে বরকতের দোয়া করা। এরপর বিসমিল্লাহ পড়ে নিচের দোয়া পড়া–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে তার [স্ত্রীর] এবং যা আমি অর্জন করেছি তার কল্যাণ কামনা করছি। আমি আপনার কাছে তার [স্ত্রীর] এবং তাকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে তার– অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।"

[মোসতাদরাকে হাকিম: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮৫]

এবং যখন মিলনের ইচ্ছা করবে তখন এই দোয়া পড়বে,

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন।" [নাসায়ি]

প্রথম দোয়ার বরকত হলো, স্ত্রী সবসময় অনুগত থাকবে। দ্বিতীয় দোয়ার বরকত হলো, সন্তান হলে পুণ্যবান হবে। শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে।

[জাদুল মাআদ ও ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৯০]

বাসররাতের ফজর নামাজের লক্ষ রাখা

স্ত্রী স্বামীকে নামাজ থেকে বিরত রাখে না। কিন্তু লক্ষ করবে, বাসররাতে কয়জন নামাজের প্রতি খেয়াল রাখে। অবস্থা হলো, এমন বর-কনেকে কী বলবো; বরযাত্রী এবং ঘরের কেউই নামাজ পড়ে না? আর সে সময় নববধূ

জড়পদার্থে পরিণত হয়। বৃদ্ধারা তাকে যেভাবে রাখে সেভাবে থাকতে হবে। তার ধর্মপরায়ণতার অবস্থা হয় নতুন বউকে দিয়ে পর্দার আড়ালে সীমাহীন লজ্জার কাজ করিয়ে নেয়। সবকিছুই হবে কিন্তু নামাজের সময় হলে নির্লজ্জতার এমন কাজ কীভাবে করাবে? নতুন বউ নিজেও বলতে পারে না। যদি কোনো নতুন বউ নামাজের কথা বলে এবং পানি চায় তাহলে বৃদ্ধারা হৈ চৈ জুড়ে দেয়। তার পেছনে লাগে। কিন্তু অন্তরে নামাজের ইচ্ছা থাকলে নামাজ তাকে অস্থির করে তোলে। নামাজ ছাড়া সে স্বস্তি পায় না, যাই হোক না কেনো।

[হুকুকুল জাওজাইন]

বাসররাতে নারীদের নির্লজ্জতা

প্রথমরাতে যখন বর-কনে একান্তে মিলিত হয় তখন মহিলারা কান পাতে। এটা সীমাহীন নির্লজ্জতা।

রাতে স্বামী-স্ত্রী অশ্লীল আচরণ করে। তখন নির্লজ্জ মহিলারা উঁকি দিয়ে তা দেখে। একহাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা অভিশাপের সীমায় প্রবেশ করে।

সকালেও এই নির্লজ্জতা হয়। বর-কনের বিছানা চাদর ইত্যাদি দেখে। কারো গোপন বিষয় জানা সাধারণভাবে হারাম। বিশেষ করে এমন অশ্লীল কথা প্রচার করা, যাতে সবাই জানতে পারে। কেমন নির্লজ্জতার কথা! আফসোস! বরের কাছে অনেক অশ্লীল কথা জিজ্ঞেস করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তা গোনাহ ও নির্লজ্জতার শামিল।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা ও ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৭১-৭৯]

অনেক এলাকায় বিশেষ করে গ্রাম্যঅঞ্চলে প্রথম রাতে মহিলারা কান পেতে বসে থাকে। কেননা এসব এলাকায় নিয়ম হলো, প্রথমরাতে স্ত্রী স্বামীকে কিছু বলে না। যদি বলে, তাহলে সকালে তা ছড়িয়ে পড়ে যে, সারারাত স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছে। মহিলাদের এমন করা, উঁকি মেরে দেখা নির্লজ্জতার শামিল।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ১৫৮]

কিছু প্রথা এমন আছে যা উল্লেখ করার যোগ্য নয়।

[আততাবলিগঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৭৮]

হজরত সাইয়েদ বেরলভি ও আব্দুলহক মোহাদ্দেসে দেহলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা]-এর ঘটনা

যখন হজরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর বিয়ের আকদ হলো। তখন তিনি ঘরে শোয়ার অনুমতি চান। কেননা বিয়ের আগে বাইরে ঘুমাতেন। শেষরাতে হজরতের গোসল করতে একটু দেরি হয়ে গেলো।

ফজরের জামাতের দ্বিতীয় রাকাতে এসে শামিল হন। নামাজ শেষে মাওলানা আব্দুলহক [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, মানুষ সুন্নতের অনুসারী বলে দাবি করে। অথচ তাকবিরেউলা তো দূরের কথা নামাজের রাকাত পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। আরো তাড়াতাড়ি কি গোসলের ব্যবস্থা করা যেতো না। উত্তরে সাইয়েদ সাহেব হজরত আব্দুল হক [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-কে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, মৌলভি সাহেব সামনে আর এমন হবে না। আমার বড়ো ত্রুটি হয়ে গেছে। আব্দুলহক তাঁর মুরিদ ছিলেন।

হজরত থানভি [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, যখন আমি আমার মতামতের ওপর চাপাচাপি করবো তখন আদবের সঙ্গে বলে দেবে। আর মেজাজ ভালো না থাকলে বলে বসো না– খুব মানবো! [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৮৯]

অধ্যায় । ২১ ।

ওলিমা [বিয়ে উপলক্ষে ছেলেপক্ষের আপ্যায়ন]

ওলিমার লাভ ও সীমা

নতুন কোনো নিয়ামত অর্জন হওয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও আনন্দের কারণ। মানুষকে অর্থব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের ইচ্ছাপূরণের ফলে দালশীলতার অভ্যাস ও স্বভাব গড়ে উঠে। কৃপণতা দূর হয়। এছাড়া আরো অনেক উপকার আছে। স্ত্রী এবং তার বংশের লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়। সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। কেননা তার জন্য খরচ করা হয়। ওলিমার জন্য লোক দাওয়াত করাই প্রমাণ করে স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর জন্য স্থান ও মর্যাদা রয়েছে।

এই জন্য রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ওলিমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, প্রলুব্ধ করেছেন। নিজেও তার ওপর আমল করেছেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] ওলিমার জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি। তবে মধ্যপন্থায় উত্তম।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] হজরত সুফিয়া [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওলিমাতে লোকদেরকে মালিদা [বিশেষ ধরনের আরবীয় খাবার] খাওয়ান। নিজের কোনো কোনো স্ত্রীর ওলিমা দুই মুদ [আরবীয় মাপের বিশেষ পরিমাণ] বার্লি দ্বারা করেন। নবিজি বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে সুন্নতওলিমাতে দাওয়াত দেয়া হবে তখন চলে আসবে।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২১১]

ওলিমার সুন্নতপদ্ধতি

ওলিমার সুন্নতপদ্ধতি হলো, কোনোপ্রকার কৃত্রিমতা ও দাম্ভিকতা ছাড়া নিজের সাধ্য অনুযায়ী সংক্ষেপে বিশেষ বিশেষ লোকদের ডেকে খাওয়ানো।

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৫৩]

ওলিমার সীমা ও শর্ত

ওলিমা সুন্নত হওয়ার জন্য ইসলাম নিচের সীমাগুলো নির্ধারণ করেছে।

১. অভাবীমানুষের অংশগ্রহণ।

২. নিজের সাধ্য অনুযায়ী হবে।

৩. সুদে ঋণ নিতে পারবে না।

৪. সুনাম ও প্রদর্শনপ্রিয়তার কোনো ইচ্ছা না থাকা।

৫. কৃত্রিমতা না থাকা।

৬. শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম]-এর ওলিমা

হজরত উম্মেসালমা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওলিমাতে বার্লি খাওয়ানো হয়। হজরত জয়নব বিনতে জাহাশ [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওলিমায় একটি বকরি জবাই করা হয়। মানুষকে গোস্ত-রুটি খাওয়ানো হয়। হজরত সুফিয়া [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর ওলিমা হয়েছিলো এভাবে, হজরত সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর কাছে যা ছিলো তা জড়ো করে ওলিমা করা হয়। হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] নিজের ওলিমা সম্পর্কে বলেন, কোনো উট জবাই করা হয়নি, না কোনো বকরি। হজরত সাদ ইবনে ওবাদা [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর বাড়ি থেকে সামান্য দুধ আসে তাই দিয়ে ওলিমা করা হয়। [ইসলাহুর রুসুম]

হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর ওলিমা

হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু] ওলিমা করেন। ওলিমাতে ছিলো, কয়েক সা [এক সা সমান সাড়ে তিন সের] বার্লি, কিছু খেজুর, কিছু মালিদা।

[ইসলাহুর রুসুমঃ পৃষ্ঠাঃ ৯৪]

আয়োজন করতে হবে হালাল উপার্জন থেকে

দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি বিষয় সবসময় খেয়াল রাখবে। নিজে হারাম খেলে খাও অন্যকে খাওয়াবে না। হারাম খেলে অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়। আল্লাহর ওলিগণ খবর পেয়ে যান। তাঁদের খুব কষ্ট হয়। এমনকি কখনো বমি হয়ে যায়। যেমন, মাওলানা মোজাফফর হোসাইন কান্ধলভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর প্রসিদ্ধ কারামাত [ওলিগণের বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা] ছিলো। মাওলানার কখনো হারাম খাবার হজম হয়নি। হয়তো বের হয়ে গেছে নয়তো অন্তরে অবশ্যই অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

খাবার এমন হওয়া উচিত যাতে হারামের কোনো সন্দেহ নেই। কেননা দাওয়াত করে খাওয়ানো ওয়াজিব নয়, সুন্নত। হারাম খাবার খাওয়ানো হারাম। সুতরাং যার কাছে নেই তার জন্য কাউকে দাওয়াত করা উচিত নয়। বিরিয়ানি খাওয়ার কী প্রয়োজন? সাধারণ খাবার খাওয়াও। হালাল খাও। কোনো মুসলমান ভাইকে হারাম খাওয়াবে না। নিজে খাইলে খাও।

[তাজিমুশ শাআয়ের মোলহাকায়ে সুন্নতে ইবরাহিমঃ পৃষ্ঠাঃ ২৩১]

অপমান ও দুর্নামের ভয়ে দাওয়াত দেয়া

একজন জিজ্ঞেস করে, লোকদেখানোর জন্য দাওয়াত দেয়ার বিধান কী? তিনি বলেন, সুনাম অর্জনের জন্য দাওয়াত দেয়া হারাম। কিন্তু অপমানের হাত থেকে

বাঁচার জন্য দাওয়াত দিলে সমস্যা নেই। শর্ত হলো, সাধ্যের বেশি এমন করতে পারবে না যে, ঋণী হয়ে যাবে। [হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৬]

ওলিমার সহজপদ্ধতি

এখন একটি ওলিমার গল্প শুনো। আমি কাউকে দাওয়াত না দিয়ে রান্না করে ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিই। একজন মহিলা খাবার ফেরত দিয়ে বলে, এটা আবার কেমন ওলিমা? আমি বলি, গ্রহণ না করলে তার কপাল খোয়াতে দাও। তার ধারণা ছিলো, প্রথাপালন করবে, আনন্দ-ফুর্তি করবে। আমাদের কী দরকার? ঘরে খাওয়াবো আর ফুর্তি করবে?

সকালবেলা সেই মহিলা আসে এবং বলে, রাতের খাবার আনো।

আমি বলি, খাবার রাতে শেষ হয়ে গেছে।

শুনে সে খুব মনখারাপ করে বলে, আমার ভাগ্য এতো ভালো, কোথায় এমন বরকতের খাবার জুটবে? দীনদার মানুষের উচিত অমুখাপেক্ষী হওয়া তাহলে দুনিয়াদাররা ঠিক হয়ে যায়। তাদেরকে যতো নাড়াবে তারা ততো বাড়বে।

[আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬১]

নাজায়েজ ওলিমা

ওলিমা সুন্নত। শর্ত আন্তরিক ও সংক্ষিপ্তভাবে হতে হবে। দাম্ভিকতা ও প্রচারের সঙ্গে নয়। নয়তো এমন ওলিমা জায়েজ নয়। হাদিসে এমন ওলিমাকে নিকৃষ্ট খাবার বলা হয়েছে। এমন ওলিমাও জায়েজ নয়। তা গ্রহণ করাও জায়েজ নয়। আত্মীয়-স্বজনকে যেসব খাবার খাওয়ানো হয় তার অধিকাংশ জায়েজ নয়। ধর্মপরায়ণ মানুষের উচিত নিজে প্রথাপালন না করা এবং যে অনুষ্ঠানে এসব পালন করা হয় তাতে কখনো অংশগ্রহণ না করা। সরাসরি অস্বীকার করা। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিপরীতে কোনো কাজে আসবে না।

[ইসলাহুর রুসুম: পৃষ্ঠা: ৯৩]

নিকৃষ্টতম ওলিমা

ওলিমা সুন্নত। আবার কখনো কখনো তা নিষিদ্ধও। যেমন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন–

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَىٰ إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ،

“নিকৃষ্ট খাবার সেই ওলিমার খাবার যাতে ধনীদের ডাকা হয় আর দরিদ্রদের বাদ দেয়া হয়।”

ওলিমা সুন্নত। কিন্তু আনুষঙ্গিক কারণে খারাপ হয়েছে। আফসোস! বর্তমানে অধিকাংশ ওলিমা এমন হয় যেখানে বংশের ধনীদের দাওয়াত করা হয়। দরিদ্রদের ডাকা হয় না। বরং এখান থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়। অথচ যে দরিদ্রকে ওলিমা থেকে বের করে দেয়া হয় তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রিজিক দেয়া হয় কেবল তোমাদের দুর্বলদের জন্য।" [বোখারি ও মুসলিম]

সুতরাং সীমাহীন নির্লজ্জতা হলো, যার জন্য রিজিক দেয়া হলো তাকে ঘাড়ধাক্কা দেয়া। অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'যদি মানুষের মধ্যে এমন বৃদ্ধলোক না থাকতো যাদের কোমর বাঁকা হয়ে গেছে, জন্তু-জানোয়ার না থাকতো, দুধের বাচ্চা না থাকতো তাহলে আল্লাহর আজাবের বৃষ্টি তোমাদের ওপর বর্ষিত হতো।' বুঝা গেলো, আল্লাহর শাস্তি থেকে বৃদ্ধ, শিশু ও অন্যান্য প্রাণীর কারণে বেঁচে আছি। [সুন্নতে ইবরাহিমঃ খণ্ডঃ ১৭, পৃষ্ঠাঃ ৩০]

নিকৃষ্টতম ওলিমায় অংশগ্রহণ করা

একহাদিসে দাম্ভিকদের ওলিমায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِئَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ

"রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এমন দুইব্যক্তির দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যারা পরস্পর অহঙ্কারপ্রকাশের জন্য খাবার খাওয়ায়। [বোখারি ও মুসলিম]

[আসবাবুল গাফলাতি মোলহাকায়ে দীন ও দুনিয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৮৪]

অতিরিক্ত লোক নিয়ে যাওয়া নাজায়েজ

বর্তমানে মানুষ দাওয়াতে নিজের সঙ্গে অনাহুত দুই তিনজনকে নিয়ে যায়। নিজের খোদাভীরুতার কারণে মেজবানকে জিজ্ঞেস করে নেয়, ভাই আমার সঙ্গে আরো দুইজন বা আরো তিনজন মানুষ এসেছে। ওই হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। একসাহাবি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে দাওয়াত করে। পথে একজন মানুষ কথা বলতে বলতে মেজবানের দরোজায় পৌঁছে যায়। তখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] জিজ্ঞেস করেন, আমার সঙ্গে একজন অতিরিক্ত লোক আছে ।সে আসবে কীনা বলো? লোকটি খুশিমনে গ্রহণ করেন।

মানুষ এই হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে অথচ এটা অযৌক্তিক তুলনা। যখন এটা দেখছো, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] অনুমতি নিয়েছেন তখন এটাও খেয়াল করবে জিজ্ঞেস করার আগে তিনি তার [মেজবানের] মধ্যে কেমন মেজাজ ও আমেজ তৈরি করেছেন। তা ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন মেজাজ।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সাহাবাদের মধ্যে স্বাধীন মেজাজ ও স্বত্ত্বা কীভাবে তৈরি করেছিলেন আমি তার একটি দৃষ্টান্ত দেই। এমন বিরল ও বড়ো দৃষ্টান্ত যার ধারে কাছের কোনো দৃষ্টান্ত এখন পাওয়া যায় না।

মুসলিমশরিফে বর্ণিত হয়েছে, একজন পার্সি ছিলো খুব ভালোঝোল রান্না করতো। একদিন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর দরবারে এসে বললো, আজ আমি খুব ভালোঝোল রান্না করেছি। পান করুন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বললেন, একশর্তে। আয়েশাও অংশগ্রহণ করবে। সে বললো, না, তিনি হলে হবে না।

চিন্তা করো! হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর প্রিয়া ছিলেন। তাঁর ব্যাপারেও কতোটা স্বাধীনতার সঙ্গে অস্বীকার করলো। এই রুচি ও অভ্যাস কীভাবে তৈরি হয়েছিলো? রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাদের তৈরি করেছিলেন এবং মেজাজের ভিত্তি করে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মেজবানের কাছে নিজের সঙ্গিনীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর বিশ্বাস ছিলো, যদি মনে চায় তাহলে গ্রহণ করবে নয়তো অস্বীকার করবে। এখন একথা কি ভাবা যায়?

সুতরাং আমাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে বা যার ব্যাপারে এই বিশ্বাস নেই সে মন চাইলে সম্মান দেখাবে না বা স্বাধীনভাবে অস্বীকার করবে– তাকে এভাবে জিজ্ঞেস করা কীভাবে জায়েজ? আর এমনভাবে জিজ্ঞেস করলে যদি সে অনুমতি দেয় তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তার উপর আমল করাও জায়েজ নয়। [হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪২৭-৪৩০]

নিমন্ত্রিতব্যক্তির বাইরে বাচ্চাদের নেয়াও বৈধ নয়

দাওয়াত করেছি অল্পলোককে, এসেছে বেশি। এমন রোগ এখন স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষ এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না যদিও মেজবানের বাড়িতে এতো আসবাব না থাকুক। একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন বিয়ে-শাদিতে একজন নিমন্ত্রিতব্যক্তি সঙ্গে দুইজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিয়ে যায়। তিনি একটি শিক্ষণীয় কাজ করলেন। একবার

দাওয়াতে গেলেন। সঙ্গে একটি বাছুরও নিয়ে গেলেন। যখন খাবার উপস্থাপন করা হলো তখন তিনি বাছুরের অংশও প্লেটে রাখলেন। মানুষ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কী করছেন?

তিনি বললেন, মানুষ নিজের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে আসে। আমার কোনো সন্তান নেই। আমি বাছুরকে ভালোবাসি। এজন্য তাকে নিয়ে এলাম। সবাই লজ্জিত হলো এবং সঙ্গে মানুষ নেয়ার প্রচলন থেমে গেলো।

হাদিসশরিফে এসেছে। একবার একব্যক্তি দাওয়াত ছাড়া রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সঙ্গে উপস্থিত হয়। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] মেজবানের বাড়িতে পৌঁছে তাকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে একজন মানুষ এসে পড়েছে। যদি তোমার অনুমতি হয় তাহলে অংশগ্রহণ করবে, নয়তো চলে যাবে। মেজবান অনুমতি দেয় এবং সে অংশ নেয়।

এমন সন্দেহ হতে পারে, লোকটি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সম্মানে তাকে অনুমতি দিয়েছে। তার উত্তর হলো, এমন বিষয়ে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন। তাদের মন চাইলে অনুমতি দিতো, নয়তো অস্বীকার করতো।

যেমন, হজরত বারিরা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর প্রসিদ্ধঘটনা। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত বারিরা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-এর কাছে মোগিছের জন্য সুপারিশ করেন যেনো তার বিয়ে গ্রহণ করেন। হজরত বারিরা [রদিয়াল্লাহু আনহা] যেহেতু জানতেন, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সুপারিশ চাপিয়ে দেন না তাই জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি হুকুম করছেন না সুপারিশ। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বললেন, হুকুম দিচ্ছি না, সুপারিশ করছি। তখন হজরত বারিরা [রদিয়াল্লাহু আনহা] অস্বীকার করেন। যেহেতু তিনি জানতেন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] অসন্তুষ্ট হবেন না তাই তিনি সাফ অস্বীকার করেন। [হুকুকুল মুয়াশারাত ও হুকুক ও ফারায়েজ: পৃষ্ঠা: ৪৯৬]

সুদখোর, ঘুষখোর ও প্রথাপূজারীদের দাওয়াত

প্রশ্ন: এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ সুদ খায়। তারা কৃষিকাজও করে। কারো কারো অর্ধেক আয় হালাল আর অর্ধেক হারাম। কারো অর্ধেকের বেশি হালাল। অর্ধেকের কম হারাম। কারো অবস্থা এর উল্টো। এদের বাড়িতে পর্দাও নেই। প্রচলিত মিলাদ ইত্যাদির মজলিস করে। এমন লোকের বাড়ি দাওয়াতগ্রহণ করা বৈধ কী-না?

উল্লেখ্য, এমন মজলিসে অংশগ্রহণ করলে অধিকাংশ সময় লোকদের সংশোধন হয়।

উত্তর : পর্দাহীনতা ও প্রচলিত মিলাদ, অন্যান্য গোনাহ ও বেদাতের সম্পদ হালাল ও হারাম হওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে দাওয়াত গ্রহণ না করাই ভিত্তিহীন। তবে দাওয়াতগ্রহণ না করার উদ্দেশ্য যদি সতর্ক ও সংশোধন করা হয় তাহলে বিরত থাকবে। আর যদি গ্রহণ করার দ্বারা আন্তরিকতা সৃষ্টি এবং উপদেশগ্রহণের আশা থাকে তাহলে গ্রহণ করা উত্তম।

তবে সুদ দ্বারা সম্পদ হারাম হয়। যদি অর্ধেক বা তার বেশি কারো সুদ হয় তাহলে হারাম হবে। আর অর্ধেকের কম হলে হারাম হবে না।

[ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১১৯]

যার অধিকাংশ আয় হারাম তার দাওয়াতগ্রহণের জায়েজপদ্ধতি

প্রশ্ন : যার অধিকাংশ সম্পদ বা অর্ধেক সম্পদ হারাম। সে যদি বলে, আমি আমার হালাল আয় থেকে আপ্যায়ন করি, হাদিয়া দিই। তাহলে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য হবে কী-না?

উত্তর : যদি অন্তর তার সত্যবলার প্রতি সাক্ষ্য দেয় তাহলে আমল করা জায়েজ, নয়তো জায়েজ নয়। আর যদি সে ঘুষের টাকায় খাওয়ায় তাহলে নম্রতার সঙ্গে অপারগতা জানিয়ে দেবে।

فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَيَتَحَرّٰى فِيْ خَبَرِ الْفَاسِقِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَخَبَرِ الْمَسْتُوْرِ ثُمَّ يَعْمَلُ بِغَالِبِ الظَّنِّ

"চিন্তা-ভাবনা করবে ফাসেক [প্রকাশ্যে পাপ করে এমন] ব্যক্তির সংবাদের ব্যাপারে, পানি নাপাক হওয়া এবং গোপন বা অপ্রকাশ্য কোনো বিষয়ের সংবাদ দিলে; এরপর নিজের মনের প্রবলধারণা অনুযায়ী আমল করবে।"

[দুররুল মুখতার: পৃষ্ঠা: ৩০৮ ও ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১২১]

সন্দেহপূর্ণ দাওয়াত

সন্দেহপূর্ণ সম্পদ ও সন্দেহপূর্ণ দাওয়াত—যেখানে হারামের সম্ভাবনা আছে; তা কখনো গ্রহণ করবে না। বিশেষ করে যেখানে দাওয়াতগ্রহণ করলে ইলম তথা আলেমের অপমান হয় সেখানে কখনো যাবে না।

[আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩১৬]

কিন্তু ভরামজলিসে মেজবানকে এভাবে অপমান করা যে, দুধ কোথা থেকে এলো, মাংস কীভাবে নিয়েছো— জিজ্ঞেস করা খোদাভীরুতার কলেরা ছাড়া কিছু নয়। অন্যকে অপমান করা নাজায়েজ। [আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮১]

কারো আয়ের ওপর ভরসা করা না গেলে করণীয়

যদি কারো আয়ের ওপর নিশ্চিন্ত না হওয়া যায় তাহলে তার দাওয়াতগ্রহণ করবে না। কোনো অজুহাতে অপারগতা পেশ করে দেবে। কিন্তু এ কথা বলবে না– তোমার আয় হারাম তাই দাওয়াতগ্রহণ করতে পারলাম না। এতে সে অন্তরে কষ্ট পাবে।

যদি কারো আয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ হয় তাহলে উত্তম হলো সবার সামনে দাওয়াতগ্রহণ করবে এবং পরে একান্তে বলবে, কিছু খাবারের ব্যাপারে আমার প্রতি খেয়াল রাখবেন। যেনো তার উপাদান হালাল উপার্জন থেকে হয়। [আনফাসে ইসা: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮১]

দাওয়াতে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিধান

১. বেশি বিচার-বিশ্লেষণ ও খোঁজ-খবরের প্রয়োজন নেই। প্রবলধারণা অনুযায়ী যার অধিকাংশ আয় হারাম তার দাওয়াতগ্রহণ করা নাজায়েজ। যেমন, যেব্যক্তি ঘুষ খায় তার দাওয়াতগ্রহণ করবে না।

তবে প্রবলধারণা অনুযায়ী যদি অধিকাংশ সম্পদ বৈধ হয় তাহলে জায়েজ। তবে শিক্ষা দেয়ার জন্য গ্রহণ না করা উত্তম।

২. যদি পাপের মজলিসে দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে গ্রহণ করবে না। যদি সেখানে যাওয়ার পর পাপের কাজ শুরু হয় যেমন, গান-বাজনা– যা অধিকাংশ বিয়েতে হয় এবং যদি তা সে যেখানে অবস্থান করছে সেখানেই হয় তবে উঠে চলে আসবে। আর যদি একটু ব্যবধানে হয় এবং মেহমান ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হয় তাহলে তখনই চলে আসবে। আর সে ধর্মীয় অনুসরণীয় ব্যক্তি না হলে খেয়েই চলে আসবে। [হুকুকুল মুয়াশারাত: পৃষ্ঠা: ৪৯৯]

দরিদ্রমানুষের দাওয়াতগ্রহণ করা উচিত

অনেক মানুষ অহঙ্কারবশত দরিদ্রমানুষের দাওয়াতগ্রহণ করে না। এই অহঙ্কার নিন্দনীয় ও দোষের। একটি ঘটনা মনে পড়ে। একজন দরিদ্রমানুষ একমৌলভি সাহেবকে দাওয়াত দেয়। মৌলভি সাহেব তার সঙ্গে দাওয়াত খেতে যাচ্ছিলো। পথে একজন রায় সাহেব জিজ্ঞেস করে, মৌলভি সাহেব! কোথায় যাচ্ছেন? মৌলভি সাহেব বলেন, এই ভিস্তি দাওয়াত দিয়েছে। তার বাড়ি যাচ্ছি। রায় সাহেব ভর্ৎসনা করতে লাগলেন– মৌলভি সাহেব! একেবারে জাত ডুবালেন। এমন লাঞ্ছনাগ্রহণ করলেন? ভিস্তির বাড়ি দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন। মৌলভি সাহেব একটা কৌশল অবলম্বন করে ভিস্তিকে বললেন, যদি তাকেও বাড়িতে নাও তাহলে যাবো, নয়তো যাবো না। ভিস্তি এখন রায় সাহেবের পিছু লাগলো।

তাকে কাকুতি-মিনতি করে অনুরোধ করতে লাগলো। প্রথমে অনেক আপত্তি জানালো। কিন্তু তোষামুদ আশ্চর্য জিনিস। তখন আরো মানুষ জমে গেলো। তারাও চাপাচাপি করতে লাগলো। শেষপর্যন্ত তার যেতে হলো। সেখানে গিয়ে দেখলো, গরিবমানুষ যতোটা সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করে আমির ও নবাবদের বাড়িতে ততোটা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ফলে বুঝতে পারলেন– সম্মান, ভালোবাসা ও প্রশান্তি পাওয়া যায় গরিবের কাছে গেলে, উঁচুশ্রেণীর কাছে নয়। এজন্য গরিবরা দাওয়াত দিলে ধনাঢ্যব্যক্তিদের তা অস্বীকার করা উচিত নয়।

[হুকুক ও ফারায়েজ: পৃষ্ঠা: ৪৯৮]

দাওয়াত কবুল করার জন্য কোনো বৈধশর্তারোপ করা

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মদিনায় অবস্থানকারী একজন পার্সি রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে দাওয়াত করেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, আমি ও আয়েশা উভয়ে যাবো। সে বললো, না, তা হবে না। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-ও বললেন, না।

এভাবে তিনবার তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এরপর সে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর শর্তগ্রহণ করে। তখন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহ আনহা] আগ-পিছ করে চলতে লাগলো। পার্সি উভয়কে সমান চর্বিযুক্ত খাবার পেশ করে।

[মুসলিম হজরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত]

শিক্ষা : ওপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা এই বিষয়টি জানা গেলো যে, যদি আমন্ত্রণগ্রহণের জন্য কোনো জায়েজ শর্ত দেয়া হয়। তাহলে তা কোনো মুসলমানের অধিকার খর্ব করা বা অসৌজন্যতা নয়। যেমন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] শর্ত দেন যদি আয়েশাকেও আমন্ত্রণ করো তাহলে আমি গ্রহণ করবো। আর পার্সিব্যক্তির গ্রহণ না করার কারণ সম্ভাবত খাবার একজনের ছিলো। সে চাচ্ছিলো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] তৃপ্তিভরে খান। পরে এই খেয়াল থেকে গ্রহণ করে ছিলো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর আত্মিকতৃপ্তি দৈহিক তথা খাদ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তখন পর্যন্ত পর্দার বিধান আসেনি। [আত তাশাররুফ বিমারিফাতি হাদিসিত তাসাউফ: পৃষ্ঠা: ৭৭]

বিয়েতে গরিবদের দাম্ভিকতা

অনেকের বোকামি হলো, তারা নিজের দারিদ্র ও নিঃস্ব অবস্থার ওপর গর্ব করে। ধনাঢ্যব্যক্তিদের দোষ বের করে। ধনীব্যক্তি গর্ব করলে একসময় সে তা থেকে বিরত থাকতে পারে। কেননা তার কাছে গর্ব করার জিনিস আছে। গরিব যার

পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই– সে কী নিয়ে গর্ব করে? এছাড়া সূক্ষ্ম একটি বিষয় হলো, তাদের গর্ব শুধু মুখেই নয় বরং কাজেও প্রকাশ পায়।
যদি কখনো বিয়ে-শাদি হয় তাহলে আমি ওইসব গরিবকেই বেশি গর্ব করতে দেখি। তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বড়ো মনে করে। অঙ্গ-ভঙ্গিতে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। এর কারণ, তারা মনে করে যদি তারা এমন না করে তাহলে লোকজন তাদেরকে ছোটো ও অপদস্থ মনে করবে। এমন ধারণা করবে যে, তারা আমাদের দাওয়াতের অপেক্ষায় বসে ছিলো। গরিবদের একটি কথা প্রসিদ্ধ। তারা বলে, 'কেউ সম্পদে ব্যস্ত আর কেউ ভণিতায় মত্ত।' অর্থাৎ দুই শ্রেণী দুইভাবে অহঙ্কার প্রকাশ করে।
আমার বুঝে আসে না, এমন ভণিতা করার অর্থ কী? কিন্তু তারা এতোটুকু তো স্বীকার করে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। কারণ, তারা নিজেদের উন্মত্ত বলেছে। উন্মত্ততা জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত জিনিস। আর বিবেক থাকলে এমন আচরণ কেনো করবে? হাদিসে এসেছে, আল্লাহতায়ালা তিনব্যক্তির ওপর খুব রাগান্বিত হন। তাদের একজন হলো, যেব্যক্তি গরিব অথচ দম্ভ করে। যেনো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এমন ব্যক্তিকে বলছেন, তোমার কাছে কি-ই বা আছে যে তুমি গর্ব করো। [আদাবে ইনসানিয়্যাত ও নিসয়ানুন নাস]

বহুবিয়ে

অধ্যায় ।২২।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহুবিয়ের কারণ

আল্লাহ্ভীতি এমন একটি প্রিয়বিষয়; প্রত্যেক মানুষের উচিত সবকিছুর ওপরে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া। আল্লাহ্ অনেককে বিত্ত-সম্পদের অধিকারী করেছেন। অনেককে অধিক যৌনশক্তি দান করেছেন। এমন পুরুষের একনারী যথেষ্ট হয় না। যদি তাকে দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ বিয়ে থেকে নিষেধ করা হয় তাহলে সে আল্লাহ্ভীতি ছেড়ে দিয়ে পাপে লিপ্ত হবে। আর ব্যভিচার এমন পাপ যা মানুষের অন্তর থেকে সবধরনের পবিত্রতার খেয়াল দূর করে দেয় এবং তাতে একভয়ংকর বিষ তৈরি করে দেয়। এজন্য অধিক যৌনশক্তির অধিকারী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক এমন উপায়গ্রহণ করা যাতে সে ব্যভিচারের মতো পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যা]

বহুবিয়ের আরেকটি উপকার

বহুবিয়ে থেকে বাধা দেয়ার কারণে অনেক সময় বিয়ের উদ্দেশ্য [বংশধারা অব্যাহত রাখা] অর্জিত হয় না। যেমন, স্ত্রী বন্ধ্যা হয় এবং তার বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার অযোগ্য। তখন বহুবিয়ে থেকে বাধা দিলে বংশধারা থেমে যাবে। এমন রোগ অনেক দম্পতির মধ্যে পাওয়া যায়। তখন বহুবিয়ে ছাড়া অন্যকোনোভাবে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। বংশধারা অব্যাহত রাখার এটাই একমাত্র পথ। এমন অবস্থায় পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেবে। [আল মাসালেহ]

যদি স্ত্রীর এমন কোনো রোগ দেখা দেয় যার কারণে স্বামী চিরদিনের জন্য বা দীর্ঘদিনের জন্য তার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না তখন বিয়ের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। [আল মাসালেহ]

হজরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] শেষজীবনে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তার কারণ ছিলো, হজরতের প্রথম স্ত্রী অন্ধ হয়ে যান। দ্বিতীয় স্ত্রী হজরতের সেবা করতো এবং প্রথম স্ত্রীরও সেবা করতো। এর দ্বারা

বুঝা যায়, নারী শুধু যৌনতার জন্য নয় বরং আরো অনেক কল্যাণ ও রহস্য আছে। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ৫৫৩]

দ্বিতীয় বিয়ের বৈধতা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য উপকারী

পুরুষের তুলনায় নারীর যৌনক্ষমতায় বার্ধক্যের ছোঁয়া আগে লাগে। সুতরাং অধিকাংশ সময় দেখা যায়, পুরুষের সামর্থ যখন পুরোপুরি অবশিষ্ট থাকে তখন নারী বৃদ্ধা হয়ে যায়। অনেক সময় পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা প্রথম বিয়ে করার মতো প্রয়োজন হয়।

যে বিধান বহুবিয়েকে বাধা দেয় তা সেসব সৌভাগ্যবান সুপুরুষ, যাদের সামর্থ বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে– তাদেরকে যৌনচাহিদাপূরণের জন্য ব্যভিচারের পথে ঠেলে দেয়।

আল্লাহতায়ালা নারীর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পুরুষকে আকর্ষণ করে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের জন্য এসব বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক। যদি নারীর মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য না থাকে বা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নারী-পুরুষের মাঝে সম্পর্ক গড়ে উঠে না। এমন অবস্থায় যদি স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়া না হয় তাহলে সে চেষ্টা করবে কীভাবে এই নারীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যদি সম্ভব না হয় তবে পাপে লিপ্ত হবে। অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। যখন সে নারীসঙ্গ থেকে সেই তৃপ্তিলাভ করতে পারবে না, মানুষের মধ্যে সত্ত্বাগত বা প্রাকৃতিকভাবে যার চাহিদা রয়েছে তখন সে তা অর্জন করার জন্য অন্যপথ খুঁজবে। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ১৯৬-২০০]

বহুবিয়ের প্রয়োজনীয়তা

স্ত্রী সবসময় স্বামীর শয্যাসঙ্গী হওয়ার যোগ্য থাকে না। প্রথমত প্রতিমাসে অবশ্যই কিছুদিন সে ঋতুবর্তী থাকে। তখন পুরুষের জন্য তার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত গর্ভধারণের সময়। বিশেষ করে গর্ভধারণের প্রথম দিনগুলোতে যখন তার নিজের ও বাচ্চার সুস্থতার জন্য পুরুষ থেকে দূরে থাকতে হয়। এই অবস্থা কয়েক মাস পর্যন্ত থাকে। এরপর যখন বাচ্চা প্রসব করে তারপরও কিছুদিন পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য স্বামী থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এই সময়গুলোতে স্ত্রীর জন্য আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিবন্ধকতা থাকে। স্বামীর জন্য তো কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। তখন যদি কোনো পুরুষের যৌনচাহিদা প্রবল হয় তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করা ছাড়া আর কী সমাধান আছে? যদি এমন সময় বা এ জাতীয় অন্যকোনো বিরতির সময় অন্য নারীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া না হয় তাহলে সে যৌনচাহিদাপূরণের জন্য অবশ্যই অবৈধমাধ্যমগ্রহণ করবে।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ১৯৫]

ইতিহাসের আলোকে বহুবিয়ের যৌক্তিকতা

অনেক সময় স্বয়ং নারীর জীবনে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যদি তখন আগে থেকে স্ত্রী আছে এমন লোকের বিয়ের সুযোগ না থাকে তাহলে সে পাপে লিপ্ত হবে। কেননা প্রতিবছর পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে বহু পুরুষের মৃত্যু হয়। আর তাদের স্ত্রী সম্পূর্ণ সামর্থবান থাকে। এমন ঘটনা সবসময় ঘটছে। যখন পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস তখন সংঘাত হতেই থাকবে এবং সবসময় পুরুষের সংখ্যা কমবে। নারীর সংখ্যা বাড়বে। এখন এসব অতিরিক্ত নারীর ব্যাপারে কী ভাববে? বহুবিয়ে নিষিদ্ধ হলে তাদের কী অবস্থা হবে? তাদের কাছে একথার কোনো উত্তর নেই যে, নারীর মনে পুরুষের প্রতি যে আসক্তি সৃষ্টি হবে, আল্লাহ যা তার প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা সে অবৈধ পন্থায় পূরণ করবে। বহুবিয়ে ছাড়া এমন কোনো পথ নেই যা তাদের প্রয়োজনপূরণ করতে পারবে। ব্রিটিশসাম্রাজ্যে বুয়েরিযুদ্ধের আগে বারো লাখ ঊনসত্তর হাজার তিনশো পঞ্চাশ [১২৬৯৩৫০] জন মহিলা এমন ছিলো একস্ত্রী নীতির কারণে যাদের ভাগ্যে কোনো পুরুষ জুটেনি।

ফ্রান্সে ১৯০০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রত্যেক একহাজার পুরুষের বিপরীতে নারী ছিলো একহাজার বত্রিশজন। সেমতে পুরো দেশে আট লাখ সাতাশি হাজার ছয়শো আটচল্লিশ নারী এমন ছিলো যাদের বিয়ে করার মতো কোনো পুরুষ ছিলো না।

সুইডেনে ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী একলাখ বাইশ হাজার আটশো সত্তরজন নারী, স্পেনে ১৮৯০ সালে চার লাখ সাতান্ন হাজার দুশো বাষট্টিজন নারী এবং অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯০ সালে ছয় লাখ চৌচল্লিশ হাজার সাতশো ছাপ্পান্নজন নারী পুরুষের তুলনায় বেশি ছিলো।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, যে নিয়ম মানুষের প্রয়োজনে প্রবর্তন করা হয় তা মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত কী-না। একথার ওপর গর্ব করা সহজ যে, আমরা বহুবিয়েকে মন্দ বলি। কিন্তু কমপক্ষে চল্লিশ লাখ নারীর জন্য কোন নিয়ম প্রবর্তন করা হলো–তার উত্তর দিন। কেননা একস্ত্রীনীতির কারণে ইউরোপে তাদের স্বামী মিলছে না।

যে আইন বহুবিয়েকে নিষেধ করে তা চল্লিশ লাখ নারীকে বলছে, তোমরা নিজেদের প্রকৃতির বিপরীত চলো। তোমাদের অন্তরে পুরুষের প্রতি কোনো মোহ বা আসক্তি সৃষ্টি হবে না। কিন্তু এটা অসম্ভব। ফলে তারা অবৈধপথ অবলম্বন করছে। ব্যভিচারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা ধারণা নয়, বাস্তবতা। এসব হলো বহুবিয়ে নিষিদ্ধের ফল। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ১৯৮]

শুধু চারজনের অনুমতি দেয়ার কারণ

এখন থাকলো চারজনের অধিক নারীকে বিয়ে করা কেনো নাজায়েজ। চিন্তা করলে বুঝে আসে, এটা আবশ্যক ছিলো যে, বিয়ের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেবে। যদি সীমা নির্ধারিত না হয় তাহলে মানুষ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান থেকে বের হয়ে হাজারো বিয়ে করার সুযোগ পাবে। এতে স্ত্রীদের ওপর এবং নিজের জীবনের ওপর অবিচার হবে। ভারসাম্য রাখতে পারবে না। প্রয়োজন চারজন দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। এজন্য চারের বেশিকে নাজায়েজ বলা হয়েছে।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ২০৩]

চারের অধিক বিয়ের অনুমতি না দেয়ার এটাও একটি কারণ, নারীদের যৌনচাহিদাপূরণ ও বিয়ের মূল উদ্দেশ্য সন্তান অর্জন করার জন্য প্রত্যেক পবিত্রতার মধ্যে কমপক্ষে একবার স্বামীর সঙ্গে বিছানায় যাওয়া উচিত। সুস্থ নারীদের প্রত্যেক মাসে একবার ঋতুস্রাব হয় এবং তারা পবিত্র হয়। আর মধ্যমশক্তির অধিকারী একজন পুরুষ সপ্তাহে একবার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেকে সুস্থ ধরে রাখতে পারে। অর্থাৎ মাসে চারবার। চার স্ত্রী থাকলে প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে প্রত্যেক পবিত্রতায় একবার মিলন হবে। এর থেকে বেশি স্ত্রী হলে বা পুরুষের বেশি পরিশ্রম হলে তার মধ্যে প্রজননক্ষমতা অক্ষত থাকবে না। অথবা স্ত্রীর অধিকার বা চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। নিয়ম সাধারণের প্রতি লক্ষ করে হয়। সুতরাং কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধিক শক্তির অধিকারী হওয়া এই যুক্তির পরিপন্থী নয়। যেহেতু রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] অধিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাকে সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে অনেক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছিলো তাই তিনি এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থানের অধিকারী।

[বাওয়াদিরুন নাওয়াদের: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮]

বহুবিয়ে শরিয়তের নির্দোষ-বৈধবিধান

বহুবিয়ে বৈধতা নির্দোষভাবে শরিয়তের অকাট্য দলিল [কোরআন] দ্বারা প্রমাণিত। আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত ছিলো। তাকে অপছন্দ করা, তা হারাম বলে বিশ্বাস করা বা দাবি করা। এ ব্যাপারে কোরআনে আয়াত বিকৃত করা সরাসরি নাস্তিকতা ও ধর্মচ্যুতির শামিল। মূলকাজ তথা বহুবিয়েতে অপছন্দের গন্ধও নেই। তার বৈধতাও ন্যায়পরায়ণতার শর্তের অধীন নয় বরং ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার না পাওয়ার বিশ্বাসও থাকে। তবুও বিয়ে শুদ্ধ ও কার্যকরী হবে। অনেক মানুষ ইউরোপের দেখা-দেখি বলে একের অধিক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিয়ে করা নাজায়েজ।

তাদের মনোবাসনা কেবল ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইচ্ছাকে সুন্দর মনে করা। তারা এই দাবিকে জোর করে কোরআনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা দু'টি আয়াতগ্রহণ করেছে। যার অর্থ বিকৃত করে তারা উদ্দেশ্যহাসিলের চেষ্টা করেছে। কিন্তু এটা সরাসরি নাস্তিকতা ও ধর্মচ্যুতির শামিল। [ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৭]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বহুবিয়ের প্রতিবন্ধকতা

বহুবিয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের কিছু প্রতিবন্ধকতা

যখন অবিচারের প্রবল আশঙ্কা থাকে তখন সত্ত্বাগতভাবে বহুবিয়ের জায়েজ ও পছন্দনীয় হলেও তা থেকে নিষেধ করা হবে। প্রমাণ কোরআনের আয়াত–

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"যদি তোমরা ভয় পাও তোমরা সুবিচার করতে পারবে না। তাহলে একটিতে যথেষ্ট করো।" [সুরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৩]

যদি আশঙ্কা থাকে সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না, তা দৈহিক কিংবা আত্মিক হোক বা আর্থিক হোক তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা অবশ্যই নিষিদ্ধ। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৪০]

স্ত্রীর ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে দ্বিতীয় বিয়ে করা অপছন্দনীয়

যদি পুরুষের পক্ষ থেকে অবিচারের ভয় না হয় কিন্তু নারীদের দ্বারা ভারসাম্য নষ্টের ভয় থাকে তখন বহুবিয়ে শরিয়তে নিষিদ্ধ তো নয়। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে এক স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দেয়া হবে। যেমনিভাবে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] হজরত জাবের [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে পরামর্শ দেন।

هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

"কোনো কুমারী মেয়ে কি ছিলো না। যে তোমার মনোরঞ্জন করতো আর তুমি তার মনোরঞ্জন করতে।"

[ইহয়াউ উলুমিদ্দীনঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৯৯; ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ২৮]

লালসায় পড়ে একাধিক বিয়ে করার নিন্দা

অনেক মানুষ বিনা প্রয়োজনে শুধু লালসায় পড়ে একাধিক বিয়ে করে এবং স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কারণ পুরুষের মধ্যে দীন বা সামর্থ কম।

অথবা এই জন্য যে, নারীদের মধ্যেও দীন বা জ্ঞান ও বিবেক কম। সুবিচার করতে না পারা পুরুষের জন্য স্পষ্টত শরিয়তের লঙ্ঘন। যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যেখানে অবিচারের প্রবলআশঙ্কা হয় সেখানে একাধিক বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয় এজন্য যে, নাজায়েজ কাজের ভূমিকাও নাজায়েজ। এমন সময়ও একাধিক বিয়ে থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ২৭]

সুবিচারের সামর্থ থাকার পরও বিনা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে না করা

সুবিচারের সামর্থ থাকলে পুরুষের অন্যকোনো বাধা না থাকলেও পেরেশানি তো বাড়বে। যা বাড়লে অনেক সময় দীনের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে ধর্মীয় কাজে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যখন এই ধারণা প্রবল হয় যে, একাধিক বিয়ে করলে এবং তাদের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে নিজে পেরেশানি বা অস্থিরতায় পড়ে যাবে এবং ধর্মীয় কাজে বিঘ্ন হবে তখন এমন পেরেশানি ও তার কারণ– বহুবিয়ে থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

যদিও বেঁচে থাকা শরিয়তে ওয়াজিব নয়। তবুও তা বিবেকের দাবি। অনর্থক অস্থিরতা টেনে আনা বিবেকবিরোধী। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ২৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বহুবিয়ের সংকট ও জটিলতা

উভয় স্ত্রীর মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করাই সবচেয়ে কঠিন

মানুষ যদি কারো শাসক না হয় অথবা ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেয় তবে তার জন্য এ গুণের দরকার নেই।

দ্বিতীয়ত এমন মানুষের শাসক হও যাদের সঙ্গে ন্যায় ও সুবিচার করতে শাসনরীতি ও নিয়মের অনুসরণ করতে পারবে। এটাও সহজ। কেননা তাকে কেবল একটি রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। যাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই।

বিপরীত হলো এমন ব্যক্তি যার একাধিক স্ত্রী হয়। তার অধীন এমন দুইব্যক্তি যারা তার প্রিয়। তারা আবার এমনই প্রিয়জন যাদের মাঝে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা ঝগড়া-বিবাদের সময়ের সঙ্গে বিশেষিত নয় বরং তাদের মধ্যে যদি ঝগড়াও না হয় তবু সবসময় শাসকের জন্য উভয়ের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। আর তাদের মধ্যে ঝগড়া হলে এই সংকট সৃষ্টি হয়, যদি সে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে প্রেমিকের ভূমিকা ছুটে যায়। তাদেরকে একত্রিত করা আগুন-পানি এক করার চেয়ে কম কঠিন নয়। এজন্য অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দীনদারির প্রয়োজন হয়। কেউ যদি করে থাকে তাহলে জানবে, যদি দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ চায় তাহলে তা এজন্য কঠিন যে, তার স্বামীত্ব শেষ করা বা তালাক দেয়া। শরিয়ত যাকে ঘৃণ্য বলেছে।

এরপর এই শাসনব্যবস্থার বৈঠকের কোনো নির্ধারিত সময় নেই। সবসময় তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সবসময় মোকাদ্দমার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নয়তো অনধিকারচর্চা আবশ্যক। যেমন বিচার বিষয়ে তথা ক্ষমতাগ্রহণ করার ব্যাপারে হাদিসে চরম হুঁশিয়ারি এসেছে। এটাও তার থেকে কম নয়। বরং ওপরে যা যুক্ত করেছি তা থেকে জানা যায়, কিছু বিবেচনায় এটা বিচারকার্য থেকে অনেক কঠিন। যখন তার ব্যাপারে হুঁশিয়ারির হুকুম এসেছে তখন এ ক্ষেত্রে সাহস দেখানো কীভাবে উচিত? [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৯০-৯৭]

একাধিক বিয়ের স্পর্শকাতরতা ও
হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর অভিজ্ঞতা

একাধিক স্ত্রীর অধিকারসমূহ এমন সূক্ষ্মবিষয় যেখানে না সবার চিন্তা পৌঁছায়, না তার পরিপালনের আশা করা যায়। তা সত্ত্বেও রাতে অবস্থান, পোশাক ও খাবারে সমতার অধিকারের কথা সবার জানা। তবু তার গুরুত্ব দেয়া হয় না। আর ফকিহগণ যেসব মাসয়ালা লিখেছেন তার প্রতিই বা কে লক্ষ করে? তারা লিখেন, যদি একস্ত্রীর কাছে মাগরিবের সময় উপস্থিত হয় আর অন্যজনের কাছে এশার সময় আসে তবে তা ইনসাফের পরিপন্থী।

আরো লিখেন, একজনের পালার সময় অন্যজনের সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ নয়, যদিও তা দিনের বেলা হোক। একজনের পালার সময় অন্যজনের কাছে না যাওয়াই উচিত।

যদি স্বামী অসুস্থ হয় এবং অন্যজনের কাছে যেতে না পারে। একজনের বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে সুস্থ হওয়ার পর দ্বিতীয়জনের কাছে এই পরিমাণ সময় থাকা আবশ্যক। লেনদেনের ক্ষেত্রেও এ পরিমাণ সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিবেচনা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব।

আমারও এমন কঠিন পরিস্থিতি আসে। যদি আল্লাহ ধর্মীয় জ্ঞান ও সমাধানের সুন্দরপদ্ধতি দান না করতেন তাহলে অবিচার থেকে বাঁচা কঠিন হতো। এটা স্পষ্ট, এই পরিমাণ ধর্মীয় জ্ঞান ও এই পরিমাণ গুরুত্ব সাধারণভাবে পাওয়া কঠিন। এছাড়াও প্রত্যেকব্যক্তির জন্য প্রবৃত্তির মোকাবেলা করা কঠিন। এমন অবস্থায় একাধিক বিয়ে করে শুধু শুধু অধিকার নষ্ট করে গোনাহগার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা গৌণ।

ওপর্যুক্ত অধিকারসমূহ ওয়াজিব ছিলো। কিছু অধিকার আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের; যা আদায় করা ওয়াজিব নয় কিন্তু তার প্রতি লক্ষ না করলে মন ভেঙ্গে যায়। যা সুসম্পর্কের অন্তরায় এবং খুব সূক্ষ্মবিষয়। এমন অধিকার পরিপালন করা কঠিন। যদি কোনোব্যক্তি বাস্তবতা ও লেনদেনসংক্রান্ত শরিয়তের বিধান আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে এবং সে অনুযায়ী করে তাহলে তার পরিণামের কথা মনে পড়ে যাবে এবং বহুবিয়ে থেকে তওবা করে নেবে। [ইসলাহে ইনকিলাব: পৃষ্ঠা: ৮৪]

কঠোর প্রয়োজন ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করার পরিণতি

বর্তমান অবস্থার আলোকে চূড়ান্ত অপরাগতা ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে কখনো না করা উচিত। আর অপারগতার ব্যাপারে নিজের মন বা আবেগ থেকে সিদ্ধান্ত নেবে

না বরং বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা করবে। এসব ব্যাপারে জ্ঞানীদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক।

পৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করা প্রথম স্ত্রীকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর পুনরায় চিন্তায় ফেলে দেয়া। আর সে যেহেতু মূর্খ তাই সে রঙ [রুদ্রমূর্তি] ধারণ করবে। সে রঙের ঝলকানি থেকে না স্বামী বাঁচতে পারবে না দ্বিতীয় স্ত্রী বাঁচতে পারবে। অনর্থক চিন্তার সাগরে বরং রক্তের নদীতে ঢেউ তুলবে। বিশেষ করে স্বামী যখন আলেম ও ধৈর্যশীল না হয়, ধর্মীয় জ্ঞান না থাকায় ন্যায় ও সমতার সীমা বুঝতে পারবে না। ধৈর্য না থাকায় সে সমতার সীমা রক্ষা করতে পারবে না। ফলে সে অবশ্যই অবিচারে লিপ্ত হবে। সাধারণত একাধিক বিবাহকারীরা অবিচার ও অত্যাচারের পাপে লিপ্ত হয়। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৮৩]

দুই বিয়ে করা পুলসিরাতে পা রাখার মতো

আমার কাছে দ্বিতীয় বিয়ে করার অনেক উপকারিতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেসব কল্যাণ অর্জন করা তেমনই কঠিন যেমন জান্নাতের জন্য পুলসিরাত পার হওয়া। যা হবে চুলের চেয়ে চিকন এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো। যে অতিক্রম করতে পারবে না সে সোজা জাহান্নামে পড়বে। এজন্য এমন সেতুতে উঠার ইচ্ছাই করবে না।

এই ঝুঁকি ও বিপদের মুহূর্ত অতিক্রম করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন দরকার তা সস্তা নয়। জ্ঞানের পূর্ণতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির পূর্ণতা, অন্তর্দৃষ্টি ও সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি; এইসব বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আবশ্যক।

যেহেতু একজন ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো গুণের সমন্বয় বিরল তাই বহুবিয়ের ফাঁদে পা দেয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের জাগতিক সুখ-শান্তি নষ্ট করা। অথবা পরকাল ও দীন-ধর্ম শেষ করা। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ পৃষ্ঠাঃ ৯০]

হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর অসিয়ত এবং একটি পরীক্ষিত পরামর্শ

কারো যেনো এই ভুলধারণা না হয়–আপনি নিজে কেনো উপদেশের বিপরীত কাজ করলেন? [হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দু'জন স্ত্রী ছিলেন] বিপরীত করার কারণেই এই চিন্তা ও বোধ আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এই কাজে আমার অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে। আর অভিজ্ঞব্যক্তিদের কথা অধিক গ্রহণযোগ্য। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমার ভাই ও বন্ধুদেরকে একাধিক বিয়ে থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিই। আমি যদি একাধিক বিয়ে না

করতাম তাহলে তোমরা নিষেধকে বেশি গুরুত্ব দিতে না। কিন্তু এই নিষেধ বিশেষ গুরুত্ব পাবে। সুতরাং তার ওপর আমল করা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তের বিধানও পরিবর্তন বা বিকৃত করা যাবে না। শরিয়তের বিধান হলো, সর্বাবস্থায় বহুবিয়ে গ্রহণযোগ্য, সুবিচার হোক বা না হোক। সুবিচার না করলে স্বামীই গোনাহগার হবে। [মালফুজাতঃ পৃষ্ঠাঃ ১৪১]

দ্বিতীয় বিয়ে কাকে করবে

একব্যক্তি আমার কাছে দ্বিতীয় বিয়ের পরামর্শ চায়। আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার কয়টা বাড়ি আছে? সে বললো, একটি। আমি বললাম, তোমার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে ভালো হবে না। সে জিজ্ঞেস করলো, কয়টা বাড়ি থাকা দরকার? আমি বললাম, তিনটি। সে বললো, তিনটি কেনো? আমি বললাম, দুই বাড়ি দুই স্ত্রীর থাকার জন্য। আর তৃতীয় বাড়ি এই জন্য যে, যখন উভয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবে তখন তুমি সেখানে একা থাকবে। যখন তুমি তাদের দুর্নাম করবে তখন তুমি কোথায় থাকবে? একথা শুনে থেমে যায়। [মালফুজাতঃ পৃষ্ঠাঃ ১৪১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকবে যদিও পছন্দ না হয়

উত্তম হলো, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করা, একস্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকা যদিও পছন্দ না হয়।

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তবে তোমরা হয়তো এমন জিনিস অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"

[সুরাঃ নিসা, আয়াত:১৯]

প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হলে দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণ করা

কিছু মানুষ শুধু এই কথার ওপর দ্বিতীয় বিয়ে করে 'তার সন্তান নেই।' অথচ বর্তমান যুগে বেশির ভাগ দ্বিতীয় বিয়ে বাড়াবাড়ির নামান্তর। কেননা শরিয়তের বিধান হচ্ছে–

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"যদি তোমরা ভয় পাও তোমরা সুবিচার করতে পারবে না তাহলে একটিই যথেষ্ট।" [সুরাঃ নিসা, আয়াত: ৩]

বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে সুবিচার হতে পারে। আমি কোনো মৌলভিকেও দেখি না সে দুই স্ত্রীর মাঝে পুরোপুরি সমতা রক্ষা করতে পারছে। দুনিয়াদাররা কীভাবে করবে? ফলে দ্বিতীয় বিয়ে করে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। কারণ, এখন মানুষের স্বভাবেই ন্যায়বিচার ও দয়া কম। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানুষ ন্যায়ের ধারে-কাছে যায় না।

এছাড়াও যে উদ্দেশ্যে বিয়ে করছে–সন্তানলাভ করা, তারই বা নিশ্চয়তা কী যে, দ্বিতীয় বিয়ে করলে তা অর্জন হবে? হতে পারে এই স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান হবে না। তখন কী করবে? আমি দেখেছি, একলোক নিজের স্ত্রীকে বন্ধ্যা মনে করে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। বিয়ের পর প্রথম স্ত্রীর সন্তান হয়েছে। অনর্থক একটি অজ্ঞাত ও সম্ভাব্য বিষয়ের জন্য নিজেকে ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লায় উঠানো উচিত নয়। যদি সমতা না হয় তাহলে আবার দুনিয়া-আখেরাতের বিপদ মাথার ওপর চেপে বসবে। মানুষ সন্তানের আশায় দ্বিতীয় বিয়ে করে। আর সন্তানের আশা এই জন্য করে যাতে নাম অবশিষ্ট থাকে। এখন নামের বাস্তবতা শুনো।

একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করো তোমার পরদাদার নাম কী? অধিকাংশ লোক বলতে পারবে না। যখন নিজের বংশধররা পরদাদার নাম জানে না তখন অন্যরা জানবে কী ছাই! এখন বলো, নাম কোথায় থাকলো? সন্তানের দ্বারা নাম বাকি থাকে না বরং সন্তান অযোগ্য হলে উল্টো দুর্নাম হয়। আর যদি নাম বাকিও থাকে তবুও নাম থাকা এমন কি জিনিস যার জন্য বৃহৎ আশা করা যায়? পৃথিবীর অবস্থা দেখে সান্ত্বনা নেবে। পৃথিবীতে যার সন্তান আছে সে কোনো না কোনো ঝামেলায় আছে। আর যদি এতেও সান্ত্বনা অর্জন না করা যায় তাহলে মনে করবে, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই আমার জন্য কল্যাণকর। জানা নেই, সন্তান হলে কেমন হতো! আর যদি এটাও ভাবতে না পারো তাহলে অন্তত এটা মনে করবে–সন্তান না হওয়ার পেছনে স্ত্রীর অপরাধ কী? অর্থাৎ তার কোনো অপরাধ নেই।

[ওয়াজে হুকুকু আহলিয়্যাত ও হুকুকুল জাওজাইন; পৃষ্ঠা: ৩৮]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রয়োজনীয় মাসয়ালা

দ্বিতীয় বিয়ের বিধান

বিনা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে করবে না। যদিও সমতা প্রতিষ্ঠায় আশাবাদী হও। কেননা বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিয়ে করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়। যদি এই ধারণা থেকে দ্বিতীয় বিয়ে না করো এতে প্রথম স্ত্রী দুশ্চিন্তায় পড়বে না। সোয়াব হবে। [ফতোয়ায়ে আলমগিরি]

আর যদি ইনসাফের ব্যাপারে আশাবাদী না হও তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করা পাপ।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"যদি তোমরা ভয় পাও তোমরা সুবিচার করতে পারবে না। তাহলে একটিই যথেষ্ট।" [সুরাঃ নিসা, আয়াতঃ ৩]

সমতার মাপকাঠি

মাসয়ালা-১ঃ ভরণ-পোষণ প্রদান ও মনোতুষ্টির জন্য রাতযাপনে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। সহবাসে নয়।

মাসয়ালা-২ঃ সহবাস, চুমু ও আলিঙ্গন করার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা মোস্তাহাব। ওয়াজিব নয়।

মাসয়ালা-৩ঃ তখন ওয়াজিব নয় যখন আগ্রহ ও আমেজ থাকে না। কেননা সে অপারগ। কিন্তু যখন আগ্রহ ও আমেজ থাকে; তখন অন্যের প্রতি বেশি এবং এর প্রতি কম আগ্রহ– এমন হলে, একমত অনুযায়ী সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব।

[ফতোয়ায়ে শামি]

মাসয়ালা-৪ঃ উপহার ও উপঢৌকন [আবশ্যক নয় এমন জিনিস] আদান-প্রদানে সমতা রক্ষা করা হানাফিমাজহাব অনুযায়ী ওয়াজিব।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৪৭]

হানাফিমাজহাব অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর উপহার আদান-প্রদানেও সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অন্যান্য মাজহাব অনুযায়ী কেবল অবশ্যকীয় জিনিসের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। হানাফিরা এ ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে।

[হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ১২৮]

ইবনে বাত্তাল মালেকি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] দৃঢ়তার সঙ্গে ওয়াজিব নয় বলেছেন। কিন্তু ইবনে বাত্তাল মালেকি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর দলিল ত্রুটিপূর্ণ। বাহ্যিক দলিল দ্বারা ওয়াজিবই মনে হয়।

[ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৪৮]

সফরের বিধান

মাসয়ালা-৫ঃ রাতযাপনে সমতার বিধান কেবল বাড়িতে বা কোথাও মুকিম [কোনো স্থানে পনেরো দিন বা বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করা] হলে। সফরে স্বামীর যাকে ইচ্ছা সঙ্গে নেবে। কিন্তু অভিযোগ দূর করতে লটারি করা উত্তম। মুকিমের বিধান বাড়িতে অবস্থানকারীর মতো।

মাসয়ালা-৬ঃ রাতের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে রাতে অবসর থাকে। কিন্তু যে রাতে কাজ করে যেমন, চৌকিদার ইত্যাদি তার দিনের বিধান অন্যের রাতের মতো। [ফতোয়ায়ে শামি]

প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থান দেয়া আবশ্যক

মাসয়ালা-৭ঃ বাসস্থানে সমতা বিধানের অর্থ হলো, প্রত্যেকের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। জোরপূর্বক একঘরে রাখা জায়েজ নয়। তবে যদি উভয়ে রাজি থাকে তাহলে উভয়ের সম্মতি পর্যন্ত জায়েজ।

মাসয়ালা-৮ঃ যার জন্য রাতে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব তার জন্য একজনের পালার সময় রাতে অন্যকে শরিক করা বৈধ নয়। অর্থাৎ অন্যজনের কাছে যাওয়া যাবে না।

মাসয়ালা-৯ঃ এটাও ঠিক নয় একজনের কাছে মাগরিবের পর যাবে আর অন্যজনের কাছে এশার পর। বরং উভয়ের মধ্যে সমতা করা আবশ্যক।

[ফতোয়ায়ে শামি]

মাসয়ালা-১০ঃ একইভাবে একরাতে উভয়ের কাছে কিছুসময় করে থাকাও ঠিক নয়।

মাসয়ালা-১১ঃ কিন্তু ৮, ৯ ও ১০ নং মাসয়ালার ক্ষেত্রে অপর স্ত্রী অনুমতি দিলে জায়েজ হবে।

মাসয়ালা-১২ঃ সন্তুষ্টির সঙ্গে যেমন একইরাতে উভয়ের কাছে থাকা জায়েজ তেমনি পালা শেষ করার পর আগের মতো বা ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন পালা নির্ধারণ করাও জায়েজ। [ফতোয়ায়ে শামি]

মাসয়ালা-১৩ঃ দিনের বেলা আসা-যাওয়ায় সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয় বরং সামান্য দেরি হলেও আসলে চলবে।

মাসয়ালা-১৪ঃ কোনো প্রয়োজনে একজনের কাছে যাওয়াও ঠিক আছে।

মাসয়ালা-১৫: যেদিন যার পালা নয় তার সঙ্গে দিনে সহবাস করাও ঠিক নয়।

মাসয়ালা-১৬: পালা নির্ধারণে পুরুষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে এতো দীর্ঘ পালা নির্ধারণ করা ঠিক নয় যাতে অন্যস্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করা কষ্টকর হয়। যেমন, একবছর করে। [ফতোয়ায়ে শামি]

মাসয়ালা-১৭: যদি অসুস্থতার কারণে একঘরে বেশি থাকে তাহলে সুস্থতার পর অপরজনের ঘরে ততোদিন থাকতে হবে। [ফতোয়ায়ে শামি]

মাসয়ালা-১৮: এমনিভাবে যদি একস্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে যায় তখন প্রয়োজনে তার ঘরে থাকলে কোনো সমস্যা নেই। [আলমগিরি]

এসব দিনের কাজা আদায় করা আবশ্যক।

মাসয়ালা-১৯: একস্ত্রী তার পালার দিন অন্যস্ত্রীকে দান করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে নিতে পারবে। [ইসলাহে ইনকিলাবঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ১৪৭]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একাধিক স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্কস্থাপনের উপায়

স্বামীর করণীয়

১. একজনের গোপন কথা অন্যজনের কাছে বলবে না।

২. উভয়ের খাওয়া-দাওয়া ও বাসস্থানের পৃথক ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে এক করা আগুন-বারুদ এক করার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

৩. একস্ত্রীর কাছ থেকে অন্যস্ত্রীর দোষ কখনো শুনবে না।

৪. একজনের প্রশংসা অন্যজনের কাছে করবে না।

৫. একজনের আলোচনা অন্যজনের কাছে করবে না এবং শুনবেও না। যদি একজন শুরু করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়ে অন্যকথা বলবে।

৬. একজন অন্যজন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইল বলবে না। তবে কঠোরতাও করবে না। নম্রতার সঙ্গে নিষেধ করবে।

৭. লেনদেনে কম-বেশির সন্দেহ হতে দেবে না। সবকিছু পুরোপুরি প্রকাশ করে দেবে।

৮. বাইরের নারীদের মিশতে কঠোরভাবে নিষেধ করবে। যেনো তারা অন্যজায়গার গল্প ও সমালোচনা করতে না পারে।

৯. আনন্দে মত্ত হয়ে একজনের অন্যজনের প্রতি ভালোবাসা কম বলে দাবি করবে না।

১০. সুযোগ হলে বলবে, অন্যজন তোমার প্রসংশা করছিলো।

১১. নম্রতার সঙ্গে সম্ভব হলে একজনকে দিয়ে অন্যজনের কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠাবে। যদি হয় ভালো।

প্রথমস্ত্রীর জন্য করণীয়

১. নতুন স্ত্রীকে হিংসা করবে না।

২. তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না।

৩. নিঃসঙ্কোচে নতুন স্ত্রীর সঙ্গে উত্তমআচরণ করবে। যাতে তার অন্তরে ভালোবাসা না জন্মালেও শত্রুতা তৈরি না হয়।

৪. স্বামীকে নিঃসঙ্কোচে এমন কোনো কথা বলবে না যা স্বামী তার সামনে বলা অপছন্দ করে। যেনো নতুন স্ত্রীও এমন বেয়াদবি না শেখে।

৫. স্বামীর কাছে নতুন স্ত্রীর কোনো দোষ বলবে না। কেউ তার প্রিয়জনের সমালোচনা কারো কাছ থেকে; বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে শুনতে পছন্দ করে না। এতে প্রথমস্ত্রীরই ক্ষতি হবে।

৬. নতুন স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করবে যেনো তার মুখ সবসময় প্রথমজনের সামনে বন্ধ থাকে।

৭. স্বামীর প্রতি আনুগত্য, সেবা ও আদব রক্ষা আগের তুলনায় বেশি করবে। যাতে তার অন্তর থেকে তোমার ভালোবাসা উঠে না যায়।

৮. যদি স্বামীর পক্ষ থেকে অধিকার আদায়ে কোনো ত্রুটি হয় এবং তা কষ্টের পর্যায়ে না পৌঁছে তবে তা মুখে আনবে না। আর কষ্টের পর্যায়ে পৌঁছে গেলে মেজাজ-মর্জি বুঝে আদবের সঙ্গে বলবে।

৯. নতুন স্ত্রীর আত্মীয় উত্তমআচরণ ও ব্যবহার করবে। যাতে নতুন স্ত্রীর অন্তরে স্থান করে নিতে পারো।

১০. কখনো কখনো নিজের পালার দিন নতুন স্ত্রীকে দেবে। যাতে স্বামীর অন্তরে মূল্যায়ন বাড়ে।

নতুন স্ত্রীর করণীয়

১. প্রথমস্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করবে যেমন নিজের বড়োবোনের সঙ্গে করো।

২. আমিই বেশি প্রিয়– এই ধারণা থেকে স্বামীর ওপর বেশি গর্ব বা তার সঙ্গে মান-অভিমান করো না, বরং সবসময় খুব ভালো করে মনে রাখবে, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে যে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা অন্তরে গেঁথে আছে মনের এই আবেগ কখনো তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

৩. স্বামীর কাছে কখনো পৃথক থাকার আবদার করবে না।

৪. স্বামী যদি পৃথক রাখতে শুরু করে তখন মাঝে মাঝে প্রথমস্ত্রীর কাছে যাবে। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে আনবে।

৫. স্বামীকে মন্ত্রণা দিয়ে প্রথম স্ত্রী থেকে বিমুখ করবে না।

৬. যদি প্রথম স্ত্রী কোনো কঠোর আচরণ বা বিদ্রূপ করে তবে তাকে একপ্রকার অপারগতা মনে করে ক্ষমা করে দেবে। স্বামীর কাছে কখনো অভিযোগ করবে না।

৭. প্রথমস্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের খুব সেবা-যত্ন করবে।

৮. বিশেষ করে প্রথমস্ত্রীর সন্তানের সঙ্গে এমন আচরণ করবে। যাতে প্রথমস্ত্রীর অন্তরে তার প্রতি অনুরাগ ও মূল্যায়ন তৈরি হয়।

৯. প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রথমস্ত্রীর পরামর্শ নেবে। এতে তার মনে কদর বাড়বে। তার অভিজ্ঞতাও বেশি। যা কাজে আসবে।

১০. যখন বাপের বাড়ি যাবে তখন তার সঙ্গে চিঠি-পত্রে যোগাযোগ রাখবে।

[ইসলাহে ইনকিলাব: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯]

স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ বিধান

অধ্যায় ।২৩।

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর কাছে যাওয়াই সোয়াব

হাদিসে এতোটুকু পর্যন্ত এসেছে, কোনো ব্যক্তি জৈবিকচাহিদা পূরণ করার জন্য স্ত্রীর কাছে গেলে সোয়াব হয়। কেউ একজন বলে, হে আল্লাহর রাসুল! সে তো নিজের চাহিদাপূরণের জন্য করবে। তার কেনো সোয়াব হবে? রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যদি নিজের চাহিদা অবৈধ স্থানে চরিতার্থ করতো তাহলে গোনাহ হতো কী-না? সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]! রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যখন তা বৈধস্থানে পূরণ করলো তখন সোয়াব হওয়াটাই স্বাভাবিক।

[আল হায়াত হাকিকাতে মাল ও জাহ: পৃষ্ঠা: ৫০১]

স্ত্রীর কাছে কোন নিয়তে যাবে

فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

"এখন তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা কামনা করো।" [সুরা: বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

স্ত্রীর সঙ্গ দ্বারা সন্তান কামনা করবে। যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মুসলমানের দুনিয়াই দীন। নিয়তের মাধ্যমে দুনিয়াকে দীন বানিয়ে নেয়া আবশ্যক। এই নিয়তে কোনো মুসলমান দুনিয়াদার হতে পারে না। যেমন, বিয়ে একটি জাগতিক বিষয়। কেবল মুসলমানের সঙ্গে বিশেষিত নয়। দীন শুধু মুসলমানের সঙ্গে বিশেষিত। আর বিয়ে কাফের ও মুসলমান উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।

বাহ্যত বিয়ে জাগতিক বিষয় মনে হয়। কিন্তু হাদিস থেকে জানা যায়, তাতেও নিয়ত করতে হবে যেনো পবিত্রতা রক্ষা পায়, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে না পড়ে, একাগ্রতার সঙ্গে ইবাদত করতে পারে– এভাবে নিয়ত করলে বিয়ে ইবাদতে পরিণত হবে।

সহবাসের পদ্ধতি

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ। তোমরা তোমাদের ক্ষেতে আগমন করো যেদিক থেকে খুশি।"

সহবাস করতে হবে যোনিপথে। কেননা তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ। বীর্য হলো বীজ আর সন্তান হলো ফসলের মতো। নিজের ক্ষেতে যেমন সবদিক থেকে প্রবেশ করা যায়। তেমন পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যে কোনোদিক থেকে আসার অনুমতি আছে। অর্থাৎ যেকোনো পদ্ধতিতে সহবাস করার অনুমতি আছে। কোলে করে হোক, পেছন থেকে, সামনে বসিয়ে, ওপরে উঠে, নিচে শুয়ে অথবা অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে হোক না কেনো সর্বাবস্থায় আসা যাবে ক্ষেতে। তা হলো যোনিপথ। কেননা পায়ুপথ ক্ষেততুল্য হতে পারে না। সুতরাং সেখানে মিলিত হওয়া জায়েজ নয়। পায়ুপথে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া হারাম।

এই আনন্দে এতো মত্ত হয়ো না যে, পরকাল ভুলে যাও। বরং পরকালের জন্য কিছু পুণ্যকাজ করো। আল্লাহকে ভয় পাও। এই বিশ্বাস রেখো, আল্লাহ্ তোমার সামনে উপস্থিত হবে। [বয়ানুল কোরআন : সুরাঃ বাকারা, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১২৯]

স্বামী-স্ত্রী একজন অপরের সতর দেখা

স্বামীর সামনে কোনো স্থানেরই পর্দা নেই। সে তোমার সামনে আর তুমি তার সামনে সারা শরীর খোলা জায়েজ। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এমন করা ভালো নয়। [বেহেশতি জেওরঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৪৯]

স্বামীর সামনে কোনো স্থান ঢাকা ওয়াজিব নয়। তবে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম।

قَالَتْ سَيِّدَتُنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَمْ يَرَ مِنِّيْ ذٰلِكَ الْمَوْضَعَ.

"হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন, তিনি কখনো আমার লজ্জাস্থান দেখেননি। আমি কখনো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর লজ্জাস্থান দেখিনি।" [মেশকাত]

وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا اِذَا جَامَعَ اَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ اَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ اِلٰى فَرْجِهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يُوْرِثُ الْعَمٰى قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ كَذَا فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ.

"হজরত ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রী বা দাসীর সঙ্গে সহবাস করে তখন যেনো সে তার যোনিপথের দিকে না তাকায়। কেননা তা অন্ধত্ব সৃষ্টি করে। আল্লামা ইবনে সালাহ [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, এই হাদিসের সনদ 'হাসান' বা উত্তম।"

স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখার ক্ষতি

নির্জনে বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়া ঠিক নয়। স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখাতো আরো লজ্জার বিষয়। অনেক জ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা অন্ধসন্তান জন্ম হয়। আর অন্ধ না হলেও নির্লজ্জ তো অবশ্যই হয়। কারণ, ওই বিশেষ মুহূর্তে যেমন আচরণ করা হয় সন্তানের মধ্যে তেমন স্বভাব তৈরি হয়। এজন্য জ্ঞানীরা বলেন, বীর্যপাতের সময় যদি স্বামী-স্ত্রী একজনের মধ্যে কোনো ভালোমানুষের কল্পনা আসে তাহলে সন্তান ভালো হয়। এজন্য প্রাকইসলামযুগে মানুষ তাদের শোয়ার ঘরে আলেম ও জ্ঞানীদের ছবি ঝুলিয়ে রাখতো। কিন্তু ইসলাম এসে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমাদের কাছে এমন ছবি আছে যা বাহ্যিক ছবির প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়।

হৃদয়ের আয়নায় আছে ছবি বন্ধুর
মাথা সামান্য ঝুঁকালেই তোমায় দেখতে পাই।

অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করলেই আল্লাহর কল্পনা করতে পারি।

সহবাসের সময় এই দোয়া পড়বে,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন।" [নাসায়ি]

আল্লাহর চেয়ে বড়ো কে আছে যার কল্পনা করা যেতে পারে? সে সময় শয়তানের কল্পনা করা উচিত নয়। [আততাহজিবঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৮৮]

সহবাসের সময় অন্যনারীর কল্পনা করা হারাম

যদি নিজের স্ত্রীর কাছে যাও এবং সহবাসের সময় অন্য নারীর কল্পনা করো তাহলে তা হারাম হবে। [মালফুজাতে আশরাফিয়া; পৃষ্ঠাঃ ৯৭]

সহবাসের সময় জিকির ও দোয়া পড়া

প্রস্রাব, খায়খানা ও সহবাসের সময় মুখে জিকির নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্তরের জিকির [স্মরণ] নিষিদ্ধ নয়। সব সময় তার অনুমতি আছে।

যদি কেউ বলে, অন্তরে জিকিরের অর্থ কী? শরিয়তে তার কোনো প্রমাণ আছে? আমি বলি, হাদিস এই প্রশ্নের অবসান করেছে। হাদিস শরিফে এসেছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْ كُلِّ اَحْيَانٍ.

"রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতেন।" সর্বদার মধ্যে পেশাব, পায়খানা ও সহবাসের সময়ও অন্তর্ভুক্ত। তবে এটা ঠিক, এমন সময় মুখে জিকির করা মাকরুহ। সুতরাং 'সর্বদা' দ্বারা বুঝে আসে সে সময় ও সে স্থানে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] অন্তরে স্মরণ করতেন।

এমন সময় অন্তরের জিকির অব্যাহত থাকা সম্ভব। এখন অন্তরের স্মরণকে জিকির না বলা জিকিরের স্মরণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেয়া। যেখানে মুখে জিকির সম্ভব নয় সেখানে অন্তরের জিকির অব্যাহত রাখবে। অর্থাৎ কল্পনা রাখবে, মনোযোগ রাখবে। যদি সে সময়ের কোনো বিশেষ দোয়া প্রমাণিত থাকে তাহলে তা মনে মনে পড়বে, মুখে পড়বে না। সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ কাম্য। যেখানে যেভাবে সম্ভব সেখানে সেভাবে করবে।

[জরুরতে তাবলিগ: পৃষ্ঠা: ২৬৬ থেকে ২৭৭]

বিশেষ বিশেষ দোয়া

স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দোয়া

যখন স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম একান্তে মিলিত হবে তখন স্ত্রীর কপালের চুল ধরে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে তার (স্ত্রীর) এবং তাকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে তার কল্যাণ কামনা করছি। আমি আপনার কাছে তার [স্ত্রীর] এবং তাকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।"

[মোসতাদরাকে হাকিম: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৮৫]

সহবাসের দোয়া

যখন সহবাসের দোয়া করবে তখন এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকেও শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ রাখুন।" [নাসায়ি]

বীর্যপাতের সময়ে পড়ার দোয়া

বীর্যপাতের সময় এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا.

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে সে সন্তান দান করবেন তাতে শয়তানের কোনো অংশ রাখবেন না।" [মোনাজাতে মকবুল]

সহবাস কম করা 'মোজাহাদার' অন্তর্গত নয়

সুফিগণ স্ত্রীর সঙ্গে কম মিলিত হওয়াকে মোজাহাদা [আল্লাহর জন্য সুখ পরিহার ও কষ্টের অনুশীলন করা]-এর অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ সহবাস সমস্ত আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক। এমনকি তারা অধিক মিলনকেও নিষেধ করেননি। হ্যাঁ, অন্যকারণে নিষেধ করেছেন। মোজাহাদার অংশ হিসেবে নিষেধ করেননি। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ১৯৪]

অধিক পরিমাণ সহবাস করা তাকওয়াপরিপন্থী নয়

পৃথিবীতে সবচেয়ে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক কাজ সঙ্গম। কিন্তু ইসলামিশরিয়ত তা বিয়ের অধীনে করার নির্দেশ দিয়েছে। হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ-

"হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ রাখে, তার উচিত বিয়ে করা। কেননা তা দৃষ্টি অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে।" [মেশকাত]

এ হাদিসে কেবল জৈবিকচাহিদাপূরণের জন্য বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়নি। বরং আনন্দলাভ করাও উদ্দেশ্য। নয়তো জৈবিকচাহিদাপূরণের অনেক উপায় আছে। এজন্য সন্ন্যাস্য বা নারীর সঙ্গ পুরোপুরি ত্যাগ করা নপুংসক বা খোজা হওয়ার শামিল।

কিছু সাহাবা [রদিয়াল্লাহু আনহুম] নিজেদের থেকে অথবা পাদ্রিদের দেখে খোজা হওয়ার অনুমতি চান। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] কঠোরভাবে তা থেকে নিষেধ করেন।

এছাড়াও শরিয়ত আজল [সঙ্গমের পর বীর্যপাতের পূর্বক্ষণে পৃথক হয়ে যাওয়া যাতে বাইরে বীর্যপাত হয়] করতে নিষেধ করেছে। কেননা তাতে পুরোপুরি আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। যদি বিয়ে দ্বারা কেবল জৈবিকচাহিদা পূরণ করা উদ্দেশ্য হতো তাহলে আজল নিষেধ করা হতো না।

হাদিসে বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সন্তানলাভের জন্য। কিন্তু সন্তানলাভ করা নির্ভর করে আনন্দলাভের ওপর। আর কোনো শর্তাধীন বিষয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা শর্তের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার নামান্তর। বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার পর শরিয়ত অধিক পরিমাণ সঙ্গম করা থেকে নিষেধ করেনি।

যেখানে শরিয়ত খাবারের কম-বেশি পরিমাণ সম্পর্কে একটি সীমা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসে এসেছে, পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবার দ্বারা পরিপূর্ণ

করবে, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা, অপর এক তৃতীয়াংশ বাতাস দ্বারা পরিপূর্ণ করবে। সেখানে অধিক সঙ্গমের ব্যাপারে শরিয়ত কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করেনি। কারণ, এটা সম্পূর্ণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়। চিকিৎসাবিদরা এই বিষয়ে আলোচনা করেন।
ওপরের আলোচনা দ্বারা বুঝে আসে, অধিক পরিমাণ সঙ্গম করলে আত্মিক অবস্থার কোনো ক্ষতি হয় না। নয়তো শরিয়ত এ বিষয়ে আলোচনা করতো (যেমন খাবারের বিষয়ে করেছে)। [বারাকাতে রমজান: পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৫]

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] ও ক'জন সাহাবায়েকেরামের আমল

শরিয়তের অনুসারীদের দেখো! তাদের মধ্যে সবার উর্ধ্বে ছিলেন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]। তিনি খাবার কম খেতেন কিন্তু অল্পসহবাসের প্রতি লক্ষ রাখেননি। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর নয়জন স্ত্রী এবং দুইজন দাসী ছিলো। মোট এগারোজন। কখনো কখনো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] একরাতে সবার সঙ্গে মিলিত হতেন। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর যৌনশক্তিও সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম] বলেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর মধ্যে ত্রিশজন পুরুষের শক্তি রয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায় চল্লিশজন পুরুষের শক্তির কথাও রয়েছে। এজন্য আল্লাহতায়ালা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-কে অধিক পরিমাণ স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন। বরং রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] যে নয়জনে যথেষ্ট করেছেন তা রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর ধৈর্য ছিলো। নয়তো নিজশক্তি অনুযায়ী ত্রিশ-চল্লিশজন স্ত্রী রাখা উচিত ছিলো। মূলকথা, অধিক সঙ্গম থেকে বিরত ছিলেন না। যদি তা আত্মিক অবস্থার জন্য ক্ষতিকর হতো তবে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] তা পরিহার করতেন।
এবার রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম]-এর সাহাবি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-এর আমল দেখো! হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] রমজান মাসে ইফতারের পর থেকে এশার মধ্যবর্তী সময়ে এগারোজন নারীর সঙ্গে মিলিত হতেন। তাদের মধ্যে দাসীও ছিলো। সাহাবাদের আমলে এশার নামাজ দেরি করে পড়তেন। এজন্য তিনি যথেষ্ট সময় পেতেন। অধিক সঙ্গমের ব্যাপারে সাহাবাদের আমল এমন ছিলো।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] এমন বুজুর্গ ছিলেন যিনি সুন্নতের আনুগত্য, দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদতে সাহাবায়েকেরাম [রদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তার আমল দ্বারাও বুঝে আসে, অধিক সঙ্গম না ইবাদত ও আত্মিক সাধনার পরিপন্থী, না আত্মিক অবস্থার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং অধিক সঙ্গম ক্ষতিকর এই বিশ্বাস রাখা ধর্মে বেদাত প্রবর্তনের অন্তর্ভুক্ত। [বারাকাতে রমজানঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৭]

অধিক সঙ্গমের ক্ষেত্রে নিজের সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখা

হজরত আবুহোরায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, শক্তিশালীমোমিন আল্লাহর কাছে দুর্বলমোমিনের তুলনায় উত্তম ও প্রিয়। [তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ]

যখন শক্তি আল্লাহর কাছে এতোটা প্রিয় তখন তা অবশিষ্ট রাখা, বৃদ্ধি করা এবং যে কাজের দ্বারা শক্তি খর্ব হয় তা পরিহার করাই কাম্য। এর মধ্যে কম ঘুমানো, কম খাওয়া, নিজের সামর্থের চেয়ে বেশি পরিমাণ স্ত্রী সহবাস করা অথবা এমন জিনিস খাওয়া যার দ্বারা অসুস্থ হয়ে পড়বে বা বাছ-বিচার না করা যাতে অসুখ বাড়ে, দুর্বলতা আসে এমন সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। সবগুলোই পরিহার করা উচিত।

হজরত উম্মেমানজার [রদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] একবার হজরত আলি [রদিয়াল্লাহু আনহু]-কে বলেন, এই খেজুর খেও না, তোমার দুর্বলতা আছে।

তাৎপর্য : এই হাদিসে বাছ-বিচার না করার থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কারণ, আমাদের জীবনের মালিকও আল্লাহতায়ালা। যা আমানতস্বরূপ আমাদেরকে দান করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর বিধান অনুযায়ী তা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। জীবন সুরক্ষার তিনটি স্তর। এক. স্বাস্থ্য সুরক্ষা; দুই. শক্তি সুরক্ষা এবং তিন. মানসিক স্থিরতা রক্ষা করা। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় এমন কোনো কাজ করবে না যাতে জীবন-শরীর অস্থির হয়ে উঠে। কেননা এই তিনটি জিনিসে ত্রুটি আসলে ধর্মীয় কাজের সাহস থাকে না। অন্যান্য দুর্বল ও অসহায় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না। এমনকি কখনো অকৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যহারা হয়ে ইমান হারিয়ে ফেলে।

[হায়াতুল মুসলিমিনঃ পৃষ্ঠাঃ ৯৯]

অধিক সঙ্গমের ক্ষতি

শরিয়তের বৈধপন্থায় এবং স্ত্রীর সঙ্গে অধিক পরিমাণ সঙ্গম করলে ক্ষতি আছে। কেননা এতে শরীরের আমেজ ও সতেজতা ক্ষয় হতে থাকে। বুজুর্গগণ এ কাজ

থেকে নিষেধ করেছেন। কোনো কাজে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। স্বাস্থ্যের সতেজতার অনেক মূল্য দেয়া উচিত। যখন কামভাব প্রতিহত করা হয় তখন শরীরে এক প্রকার প্রফুল্লতা তৈরি হয়। সেই প্রফুল্লতা সংরক্ষণ করে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা উচিত।

ইমাম গাজ্জালির উপদেশ

ইমাম গাজ্জালি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] লিখেছেন, যেব্যক্তি সুস্থ এবং ভারসাম্যপূর্ণ যৌনশক্তির অধিকারী, তার জন্য প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে শক্তিবর্ধক ও ওষুধ খেয়ে যৌনশক্তি বাড়ানো এমন যে, কোনো সাপ বা বিচ্ছু নীরবে বসেছিলো; তাকে গিয়ে খোঁচানো শুরু করা– আমাকে দংশন করো! ধনীদের মধ্যে এর প্রতি প্রবল ঝোঁক থাকে। আমি এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি যে, বৈধভাবে যৌনচাহিদা পূরণে বাড়াবাড়ি করলে আত্মিক অবস্থার ক্ষতি হয়। আর শারীরিক ক্ষতিও হয়।

[হুসনুল আজিজঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪০৬]

স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সীমা

অধিক সঙ্গমের কোনো সীমা শরিয়ত নির্ধারণ করে দেয়নি। শরিয়ত এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই করেনি। এটা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়। এই বিষয়ে চিকিৎসাবিদগণ আলোচনা করেন। কিন্তু অধিক মিলনের আগে প্রত্যেকব্যক্তি নিজের শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ করবে। কেননা অপচয় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়। [তাকলিলুল মানামঃ পৃষ্ঠাঃ ৪৬]

কতোদিনে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে

প্রচণ্ড চাহিদা ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত নয়। মধ্যমশক্তির অধিকারী একজন পুরুষ সপ্তাহে একবার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে পারে। মাসে চারবার। এর চেয়ে বেশি হলে তা পুরুষের জন্য ক্লান্তিকর হবে। তার প্রজননক্ষমতা নষ্ট হবে। অথবা স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করতে পারবে না।

[বাওয়াদিরুন নাওয়াদেরঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৮]

ওষুধ খেয়ে যৌনশক্তি বাড়ানোর ক্ষতি

যারা যৌনশক্তিবর্ধকওষুধ খেয়ে সঙ্গমের শক্তি বাড়ায় তারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ধ্বংস করে। তাদের জন্য নিয়ম হলো, খুব বেশি চাহিদা না হলে স্ত্রীর কাছে যাবে না। যৌনশক্তিবর্ধকে শক্তি বাড়ে না, উত্তেজনা হয়। কাম ও চাহিদা বাড়ে কেবল। জলাতঙ্ক রোগ হলে যেমন যতো পানিই পান করুক পিপাসা

মিটে না, এসব লোক তেমন একাধিকবার সহবাস করলেও তাদের চাহিদা শেষ হয় না। এটা সুস্থতার প্রমাণ নয় বরং মারাত্মক রোগ। যার পরিণতি ভয়াবহ।

[আততাবলিগ, তাকলিলুত তয়াম: খণ্ড: ২২, পৃষ্ঠা: ৫৭]

গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

প্রত্যেক জিনিস স্ব-স্ব স্থানে রাখাই বড়ো যোগ্যতা। আমার কাছে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ওপর কষ্ট ও পরিশ্রম চাপিয়ে নেবে না। এতে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে, অনেকে পাগল হয়ে গেছে, অনেকে মারা গেছে। স্বাস্থ্য ও জীবনের খুব সুরক্ষা প্রয়োজন। এটা এমন জিনিস যা খুব সহজ নয়।

সুস্থতার সামনে আনন্দ ও মজা কী? কয়দিন পর মজা সাজায় পরিণত হবে। শারীরিক সতেজতার খুব মূল্যায়ন করা দরকার। বৈধপন্থায় যৌনচাহিদা পূরণে বাড়াবাড়ি করলেও ক্ষতি হয়। এতে শরীরের সতেজতা ও আমেজ নষ্ট হয়। বুজুর্গগণ এ থেকে নিষেধ করেছেন।

[হুসনুল আজিজ: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২২ ও ৪০৫]

ভারসাম্য রক্ষার উপকারিতা

ভারসাম্য রক্ষা করে সহবাস করলে তা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, আত্মতৃপ্তিকর, আরামদায়ক এবং আনন্দময়। সেই সঙ্গে অক্লান্তিকর ও উভয় জগতে উন্নতি লাভের মাধ্যম। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ১৯৪]

নারীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের পর পরস্পরের ভালোবাসা গাঢ় হয়। নারীর চোখে পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সে মনে করে, এই পুরুষ নপুংসুক নয়।

[আল কামাল ফিদ্দীন: পৃষ্ঠা: ২৭১]

অধিক সহবাসের ফলে যে রোগের সৃষ্টি হয়

সহবাস একটি স্বাস্থ্যসম্মত কাজ। বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবশ্যক। কিন্তু অধিক পরিমাণ দৈহিক মিলন এসব রোগের সৃষ্টি করে।

১. দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে।
২. শ্রবণশক্তি লোপ করে।
৩. মাথা ঘোরা ও কাঁপুনি।
৪. কোমর ব্যথা।
৫. মূত্রাশয়ের যন্ত্রণা।
৬. ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র।
৭. পাকস্থলির দুর্বলতা।
৮. হৃদরোগ বা হার্টের দুর্বলতা।

যাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল বা পাকস্থলির দুর্বলতা অথবা বুকের কোনো রোগ আছে তার জন্য অধিক পরিমাণ সহবাস করা খুবই ক্ষতিকর।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৭৮৭]

গুরুত্বপূর্ণ হুঁশিয়ারি ও উপদেশ

ফায়দা-১

১. সহবাসের উত্তম সময় হলো খাওয়ার অন্তত তিন ঘণ্টা পর।

২. পেট ভরা বা খালি অবস্থায় এবং ক্লান্ত শরীরে সহবাস করা ক্ষতিকর।

৩. সহবাস শেষে সঙ্গে সঙ্গে পানি পান করা ক্ষতিকর। বিশেষ করে ঠাণ্ডা পানি পান করা।

ফায়দা-২

সহবাসের পর কোনো শক্তিবর্ধক যেমন দুধ, গাজরের হালুয়া বা ডিম খেয়ে নেবে। অথবা কোনো চিকিৎসকের পরামর্শে উত্তেজক পানি পান করবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারি জিনিস হলো, এমন দুধ যাতে শুকনো আদা বা শুকনো খেজুর দিয়ে জ্বালানো হয়েছে।

যদি সবসময় এ নিয়মের অনুবর্তী হয়ে চলতে পারো তাহলে এখনো যা শোনা যায়–কখনো দুর্বল হবে না। কাঁপুনি ইত্যাদি রোগ কখনো হবে না।

ফায়দা-৩

অধিক সহবাসের ফলে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার ঠাণ্ডা ও গরম থেকে বেঁচে থাকা উচিত। নিয়মিত ঘুমাবে। রক্ত বৃদ্ধি ও শীর্ণতা দূর করার চেষ্টা করবে। যেমন, দুধ পান, গাজরের হালুয়া, অর্ধসিদ্ধ ডিম খাবে।

আর যদি হস্তমৈথুনের ফলে দুর্বলতা অনুভব হয় তাহলে সে মাথায় ও কোমরে বরং সারাশরীরে চামেলি ফুলের তেল বা বাবুনা [এক প্রকার দানা]-এর তেল মালিশ করবে।

অধিক সহবাসের ফলে দৃষ্টিশক্তি যার কমে গেছে সে মাথায় বাদামের তেল বা বনফশার তেল বা চামেলি ফুলের তেল মালিশ করবে। চোখে বুলায়েবান্ধ [এক প্রকার ওষুধ] ও গোলাপজলের ফোটা দেবে।

কাপুনি রোগ হলে চিকিৎসা হলো, দুই তোলা মধু নেবে এবং চান্দিফুলের তিনটি পাতা নিয়ে খুব ভালো করে চূর্ণ করে চেটে খাবে।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৭৮৭]

কিছু মুহূর্তে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া আবশ্যক

যদি কোনো নারীর ওপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নেবে। যদি তার কিছু কল্পনা মনে থেকে যায় তাহলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে। এতে মনের কুচিন্তা দূর হয়ে যায়। [তালিমুদ্দিন]

যে হাদিসে অপরিচিত মহিলার প্রতি আসক্ত হওয়ার চিকিৎসাস্বরূপ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে বলা হয়েছে তাতে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে–

فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِيْ مَعَهَا

"নিশ্চয় তার সঙ্গে যা আছে এর মধ্যেও তা আছে।" [মেশকাত]

মাওলানা ইয়াকুব নানুতাভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এর একআশ্চর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তা হলো, ব্যবহার্য জিনিস তিন প্রকার। **এক.** যা দ্বারা কেবল প্রয়োজন মেটানো উদ্দেশ্য। স্বাদ বা মজা পাওয়া নয়। যেমন, পায়খানা করা; **দুই.** যা দ্বারা স্বাদ লাভ করা উদ্দেশ্য। যেমন, তৃষ্ণা না থাকার পরও খুব সুগন্ধি শরবত পান করা। যেমন জান্নাতে হবে এবং **তিন.** যার মধ্যে উভয়ের সমন্বয় ঘটেছে।

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] এই হাদিসে বলেছেন, সহবাসের দ্বারা উদ্দেশ্য অধিক পরিমাণে মনের তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করা। কিন্তু যখন অন্যের ধ্যান করে নিয়েছো তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য প্রয়োজন মেটানো। এতে প্রশান্তি আছে। কিন্তু যখন তার উদ্দেশ্য প্রয়োজন মেটানো সেখানে নিজের স্ত্রী ও অন্যনারী সমান।

ব্যাভিচারীর উদ্দেশ্য হয় উপভোগ করা। এজন্য সারা পৃথিবীর সবনারী যদি তার শয্যাসঙ্গী হয় আর একজন অবশিষ্ট থাকে তবুও সে ভাববে, না জানি তার মধ্যে কী মজা ও উপভোগ্যতা আছে! ফলে সে সবসময় চিন্তিত থাকে। বিপরীত যে প্রয়োজন মেটানোকে মূলউদ্দেশ্য মনে করে সে অনেক তৃপ্ত থাকে। নিজের অধিকারের মধ্যে অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতিই সন্তুষ্ট থাকে।

[আল কালামুল হাসান, পৃষ্ঠা: ১২০]

নারীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ

১. নারীদের উচিত স্বামীর আনুগত্য করে তাকে সন্তুষ্ট রাখা। তার নির্দেশ উপেক্ষা না করা। বিশেষ করে যখন বিছানায় ডাকে।

[বেহেশতি জেওরঃ খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩০১]

২. রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাজে ডাকে তখন অবশ্যই তার কাছে আসবে। যদি রান্না ঘরে থাকে তবু আসবে। উদ্দেশ্য হলো, যতো দরকারি কাজ থাকুক সব ফেলে চলে আসবে।

৩. রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে পাশে শোয়ার জন্য ডাকে এবং সে না আসে। স্বামী যদি রাগ নিয়ে শুয়ে থাকে তবে সকাল পর্যন্ত সব ফেরেশতা ওই মহিলার ওপর অভিশাপ করতে থাকে।

৪. রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম] বলেন, যখন কোনো স্ত্রী স্বামীকে কষ্ট দেয় তখন জান্নাতে যে হুর তার স্ত্রী হবে সে অভিশাপ করে বলে, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না। সে তোমার মেহমান। কিছুদিনের মধ্যে সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩০১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হায়েজ [ঋতুস্রাব] অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া

১. প্রতিমাসে মেয়েলোকের যোনিপথে যে রক্ত আসে তাকে হায়েজ বা ঋতুস্রাব বলে। ঋতুর সর্বনিম্ন সময় তিন দিন তিন রাত। সর্বোচ্চ সময় দশ দিন দশ রাত। যদি কারো তিন দিন তিন রাতের চেয়ে কম রক্ত আসে তবে তা ঋতু নয়। ইস্তেহাজা [অসুস্থতার কারণে যা আসে]। তার কোনো রোগের কারণে এমন হবে। যদি দশ দিন দশ রাতের বেশি রক্ত আসে তবে দশ দিনের বেশি যে কয় দিন হবে তা অসুস্থতা। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৬]

২. আল্লাহতায়ালা বলেন–

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

"তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে হায়েজ [ঋতু] সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যাবে। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে [এবং অপবিত্রতার কোনো সন্দেহও থাকবে না] তখন গমন করো, যেভাবে তোমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন [অর্থাৎ যোনিপথে]। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী ও যারা পবিত্রতা বজায় রাখে তাদেরকে পছন্দ করেন।"

[সুরা: বাকারা, আয়াত: ২২২; বয়ানুল কোরআন: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২৯]

ঋতুবর্তী অবস্থায় স্ত্রী উপভোগের সীমা

মাসয়ালা :

১. ঋতুবর্তী অবস্থায় নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্ত্রীর শরীর দেখা ও ছোঁয়াও ঠিক নয়।

২. ঋতুস্রাব অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়া বৈধ নয়। দৈহিক মিলন ছাড়া বাকি সব বৈধ। যেমন, একসঙ্গে খাওয়া, পান করা, শোয়া ইত্যাদি।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫৭]

৩. ঋতুস্রাব অবস্থায় উপভোগের দু'টি অবস্থা। **এক.** পুরুষ আনন্দলাভ করবে এবং কাজও তার পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে। **দুই.** স্ত্রী আনন্দলাভ করবে এবং কাজও তার পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে। যদি স্বামী আনন্দলাভ করে তার বিধান উপরে চলে গেছে। আর যদি স্ত্রী আনন্দলাভ করলে তার বিধান হলো, স্ত্রীর জন্য স্বামীর নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত দেখা, ছোঁয়া, চুমু খাওয়া ইত্যাদি জায়েজ। কিন্তু স্ত্রীর জন্য বৈধ নয় নিজের হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্বামীর কোনো অঙ্গের সঙ্গে ছোঁয়াবে বা ঘষবে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮২]

মাসয়ালা : ঋতুস্রাব ও প্রসবপরবর্তী সময় স্ত্রীর নাভি ও দুই উরু দেখা অথবা কোনো কাপড়ের আড়াল ছাড়া নিজের কোনো অঙ্গ তাতে ছোঁয়ানো বা সহবাস করা হারাম।

মাসয়ালা : ঋতুস্রাব ও প্রসবপরবর্তী অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু খাওয়া, তার উচ্ছিষ্ট পানি ইত্যাদি পান করা, তাকে জড়িয়ে ধরে শোয়া, নাভির ওপরের অংশ এবং উরুর নিচে শরীর ছোঁয়ানো–যদিও কাপড় না থাকে; নাভি ও উরুর মধ্যভাগে কাপড় রেখে শরীর ছোঁয়ানো জায়েজ। বরং ঋতুর কারণে স্ত্রী থেকে পৃথক বিছানায় শোয়া এবং তার সঙ্গ থেকে দূরে থাকা মাকরুহ।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৬৯১]

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসায়ালা

১. ঋতুস্রাবের দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর স্রাব থামলে সঙ্গে সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ। যদি অভ্যাস অনুযায়ী দশদিনের আগে স্রাব বন্ধ হয় এবং সে গোসল করে নেয় অথবা একওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তখন সহবাস করা জায়েজ। যদি দশদিনের আগে ঋতু বন্ধ হয় কিন্তু অভ্যাসের দিন পূর্ণ না হয়; যেমন, সাতদিন ঋতু আসে কিন্তু ছয়দিনে স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তবে সাতদিন পূর্ণ না হলে সহবাস করা জায়েজ নয়।

[বয়ানুল কোরআন: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৯]

২. কারো অভ্যাস পাঁচ বা নয়দিন। যতোদিন অভ্যাস ততোদিন স্রাব এসে তা বন্ধ হয়ে যায় তবে স্ত্রী গোসল না করা পর্যন্ত সহবাস করা জায়েজ নয়। যদি স্ত্রী গোসল না করে এমতাবস্থায় একওয়াক্ত নামাজের সময় কেটে যায় তখন সহবাস করা জায়েজ। তার আগে নয়।

৩. যদি অভ্যাস পাঁচদিনের হয় কিন্তু স্রাব আসে চারদিন তবে গোসল করে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু পাঁচদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা জায়েজ নয়। কেননা এখনো পুনরায় স্রাব আসার সম্ভাবনা আছে।

৪. যদি দশদিন দশরাত পূর্ণ হয় তবে স্রাব বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহবাস করতে পারবে; গোসল করুক বা না করুক।
৫. যদি এক-দুইদিন স্রাব এসে তা বন্ধ হয়ে যায় তবে গোসল করা ওয়াজিব নয়। ওজু করে নামাজ পড়বে কিন্তু সহবাস করা জায়েজ নয়।

[বেহেশতি জেওর]

হায়েজ অবস্থায় সহবাস করার কাফফারা

কাফফারা হলো, যা এমন কোনো কাজের পরিবর্তে বা জরিমানাস্বরূপ দেয়া হয় তা মূলত জায়েজ কিন্তু প্রাসঙ্গিক কোনো কারণে তা হারাম হয়ে গেছে। যেমন, রমজানের রোজা রেখে বা ইহরাম অবস্থায় অথবা হায়েজ অবস্থায় সহবাস করা।
কাফফারার ব্যাপারে শরিয়তের বিধান হলো, যেসব বিষয় শরিয়তে বৈধ এবং কোনো কারণবশত হারাম হয়েছে তাতে কাফফারা দিতে হয়। আর যে বিষয় সবসময়ের জন্য হারাম; যেমন, ব্যভিচার করা ইত্যাদি, তাতে লিপ্ত হলে হদ [শরিয়তকর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি] ও তাজির [শাসক কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। যা সর্বনিম্ন হদের চেয়ে কম হয়।] প্রয়োগ করা হয়।

কাফফারা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

"হজরত ইবনে আব্বাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] থেকে বর্ণনা করেন, যেব্যক্তি ঋতু অবস্থায় সহবাস করে, সে যেনো এক দিনার অথবা অর্ধদিনার দান করে। [মোসতাদরাকে হাকিম: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৩৮; আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ২৩৯-২৪০]
যদি প্রবল যৌনচাহিদার ফলে হায়েজ অবস্থায় সহবাস হয়ে যায় তাহলে খুব তওবা করবে। যদি কিছু দানও করো তবে তা উত্তম।

[বয়ানুল কোরআন: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৯]

ইস্তেহাজা [ঋতুকালীন অসুস্থতা] অবস্থায় সহবাসের বিধান

তিনদিন তিনরাতের কম বা দশদিন দশরাতের বেশি যে রক্ত দেখা যায় শরিয়ত তাকে ইস্তেহাজা বলে। [বেহেশতি জেওর: পৃষ্ঠা: ৫৭]
ইস্তেহাজার বিধান নাক দিয়ে রক্ত পড়ার বিধানের মতো। যা পড়তে থাকে, বন্ধ হয় না। এমন নারী নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে। তার সঙ্গে সহবাসও করা যাবে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬১]

প্রসবপরবর্তীকালীন অবস্থায় সহবাসের বিধান

সন্তান প্রসবের পর যোনিপথে যে রক্ত আসে তাকে নেফাস [প্রসবপরবর্তীকাল] বলা হয়। নেফাস সর্বোচ্চ চল্লিশদিন হয়। কমের কোনো সীমা নেই।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২]

রক্ত যদি চল্লিশদিনের বেশি হয় এবং মহিলার প্রথম বাচ্চা হয় তাহলে চল্লিশদিন নেফাস ধরা হবে। অতিরিক্ত দিনগুলো ইস্তেহাজা হবে। যদি প্রথম বাচ্চা না হয় বরং আগেও তার সন্তান প্রসব হয়েছিলো, তার নেফাসের সময়কাল জানা আছে তখন তার যতোদিন স্বাভাবিকভাবে এটা হয় ততোদিন নেফাস ধরা হবে। অতিরিক্ত দিন ইস্তেহাজা হবে। যদি চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর নেফাস বন্ধ হয়ে যায় অথচ অভ্যাস ছিলো উদারণস্বরূপ ত্রিশ দিন তখন চল্লিশ দিনই নেফাস হবে। ধরা হবে তার অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে।

নেফাস অবস্থায় রোজা, নামাজ ও সহবাসের বিধান ঋতুর মতো।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬২]

চল্লিশদিনের কমে নেফাস বন্ধ হলে তার বিধান

প্রশ্ন: যে নারীর প্রথম বাচ্চা হয়েছে এবং চারদিন স্রাব এসে বন্ধ হয়ে গেছে, একদিন একরাত বন্ধ থাকার পর পরদিন তার জন্য স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ হবে কি? কারণ, প্রথম বাচ্চা হওয়ায় তার অভ্যাস জানা নেই। না-কি স্বামী চল্লিশ দিন অপেক্ষা করবে?

উত্তর: যেহেতু এ বিষয়ে ঋতু এবং নেফাসের বিধান এক তাই ওপর্যুক্ত অবস্থায় সহবাস করা জায়েজ। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮৫]

স্ত্রীর হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কাম জাগলে করণীয়

প্রশ্ন: জায়েদের সহবাসের প্রচণ্ড চাহিদা রয়েছে অথচ তার স্ত্রী ঋতুবর্তী–এমন অবস্থায় সে কী করবে?

উত্তর: স্ত্রীর পায়ের গোছা ইত্যাদিতে ঘষে বীর্যপাত করবে বা হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত করবে। কিন্তু স্ত্রীর উরু বা তৎসংলগ্ন স্থান ইত্যাদি স্পর্শ করবে না।

[দুররে মোখতার ও ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৫১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গর্ভবতী অবস্থায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া

নারীরা সবসময় স্বামীর শয্যাসঙ্গী হওয়ার যোগ্য থাকে না। কেননা গর্ভধারণের সময়; বিশেষ করে গর্ভধারণের শুরুর দিকে তার নিজের ও বাচ্চার সুস্থতার জন্য স্বামীর সঙ্গে সহবাস থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এই অবস্থা কয়েক মাস পর্যন্ত থাকে। এরপর প্রসব করলে পুনরায় আবার কয়েক মাস স্বামীর সঙ্গে সহবাস থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২০৩]

গর্ভবতীর সঙ্গে সহবাসের ক্ষতি

স্ত্রী যখন গর্ভবতী হয় তখন যদি কোনো উদ্যমী ও উত্তেজিত ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে তবে গর্ভের সন্তানের ওপর কুপ্রভাব পড়ে এবং গর্ভপাতের ভয় থাকে। এজন্য তখন স্ত্রীকে বিশ্রাম দেবে। সহবাস পরিহার করবে।

গর্ভবতীর সঙ্গে সহবাস করতে নিষেধ করার কারণ দুটি। **এক.** গর্ভপাতের ভয় এবং **দুই.** এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম নেবে তার স্বভাব-চরিত্রে বাবা-মায়ের কামুকতা মিশে সে দুশ্চরিত্রের অধিকারী হবে। কেননা কামুকতার প্রভাব গর্ভের সন্তানের ওপর অবশ্যই পড়ে এবং তা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এ ছাড়া শরিয়তের কোনো বাধা নেই অর্থাৎ এমন অবস্থায় সহবাস করা জায়েজ।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২০৩]

দুগ্ধদানকারীর নারীর সঙ্গে সহবাস

সন্তানকে দুধপান করায় এমন নারীর সঙ্গে সহবাস করা [কিছু বিবেচনায়] বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু ডাক্তারগণ এই ক্ষতিপূরণের জন্য কিছু ওষুধের সঙ্গে কিছু পদ্ধতির কথা বলেন। ফলে তা আর ক্ষতিকর নেই।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা]

জন্মনিয়ন্ত্রণপদ্ধতিগ্রহণ করা

প্রশ্নঃ অনেক নারীর শরীর দুর্বল থাকে। ঘন ঘন বাচ্চা হওয়ার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। দুধ নষ্ট হওয়ায় রোগা হয়ে যায়। এমন অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধ খাওয়া জায়েজ আছে কী?

উত্তর: জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ীপদ্ধতিগ্রহণ করা কোনো প্রকার কারণ বা সমস্যা ছাড়া নিষিদ্ধ। তবে ওপর্যুক্ত অবস্থায় গ্রহণযোগ্য কারণ ও অপারগতা থাকায় জন্মনিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ খাওয়া জায়েজ আছে। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪]

গর্ভপাত করার বিধান

বিনা প্রয়োজনে গর্ভপাত করা নাজায়েজ। যতোদিন গর্ভের সন্তানের ভেতর জীবন না আসে ততোদিন পর্যন্ত প্রয়োজনে ও অপারগ হয়ে গর্ভপাত করা জায়েজ। যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা জীবন আসার সম্ভাবনাও থাকে তবে সাধারণভাবে গর্ভপাত করা হারাম। তাতে নিরাপরাধ মানুষ হত্যার পাপ হবে। যদি জীবন আসার পর গর্ভপাত করে এবং বাচ্চা মৃত বের হয় তবে পাঁচশো দিরহাম জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার অর্থ পিতা লাভ করবে। আর যদি জীবিত বের হয় তবে পুরোপুরি 'দিয়ত' আদায় করতে হবে। অর্থাৎ খুনের বদলে খুন অথবা মানুষ হত্যার কাফফারা দিতে হবে।

যদি বাচ্চার মধ্যে জীবন না আসে এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ থাকে তবে গর্ভপাত করা জায়েজ। অর্থাৎ যদি মহিলা বা বাচ্চার এই গর্ভ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে গর্ভপাত জায়েজ। নয়তো নাজায়েজ। গ্রহণযোগ্য কারণের এটাই ব্যাখ্যা।

মোটকথা, কবিরাগোনাহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক গোনাহ হচ্ছে জীবিত সন্তান গর্ভপাত করা। এর চেয়ে গর্ভস্রাব করা ও জন্মনিয়ন্ত্রকওষুধ খাওয়া কম পাপের। তবে গ্রহণযোগ্য কারণ থাকলে গর্ভস্রাব করা ও জন্মনিয়ন্ত্রকওষুধ খাওয়া জায়েজ। আর জীবিত সন্তান গর্ভপাত করা সর্বাবস্থায় হারাম। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ৪]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলাৎকার করা

বলাৎকার তথা পায়ুপথে যৌনচাহিদা পূরণ করার নোংরামি কোরআন-হাদিস ও যুক্তি উভয়ভাবে প্রমাণিত। সুস্থপ্রকৃতি নিজেই এই কাজ অস্বীকার করে। মন্দপ্রকৃতির মানুষ ছাড়া কেউ এই পথে পা বাড়াতে পারে না।

[দীন ও দুনিয়া: পৃষ্ঠা: ২৭২]

এটা অনেক পুরনো রোগ। সর্বপ্রথম হজরত লুত [আলায়হিস সালাম]-এর গোত্রের মধ্যে এই ব্যাধি সৃষ্টি হয়। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে।

[দাওয়াতে আবদিয়্যাত: পৃষ্ঠা: ৩৪]

এই নোংরামি সর্বপ্রথম হজরত লুত [আলায়হিস সালাম]-এর গোত্রের মধ্যে ছড়ায়। তাদের আগের মানুষের মধ্যে এর অস্তিত্ব ছিলো না।

হজরত লুত [আলায়হিস সালাম]-কে সডম [বর্তমান ইসরাইল ও জর্দান সীমান্ত বর্তী মৃতসাগর এলাকায়] শহরে বাস করার এবং শহরের মানুষকে পথপ্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়। তারা ছিলো সমকামিতায় অভ্যস্ত। তাদের আগে এই কাজ কেউ করেনি। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ - إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوْنَ - فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ - وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ

“এবং আমি লুতকে প্রেরণ করি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের আগে পৃথিবীতে কেউ করেনি? তোমরা কামতাড়িত হয়ে পুরুষের কাছে গমন করো নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। এরপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম। কিন্তু তার স্ত্রী ছাড়া; সে তাদের মাঝেই রয়ে গেলো। যারা রয়ে গিয়েছিলো আমি তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর দেখো পাপীদের পরিণতি কেমন হয়।”

[সুরা: আরাফ, আয়াত: ৮০-৮১ ও ৮৩-৮৪]

তাদের ব্যাপারে দু'টি শাস্তির বিবরণ পাওয়া যায়। **এক.** ভূপৃষ্ঠ উল্টিয়ে দেয়া। **দুই.** পাথরের বৃষ্টি। প্রথমে ভূমি উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তারা যখন মাটির নিচে পড়ে গেছে তাদেরকে পাথরচাপা দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যারা লোকালয়ে ছিলো তাদেরকে মাটি উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে আর যারা বাইরে ছিলো তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হবে! নিঃসন্দেহে এই ঘটনা শিক্ষণীয়। [বয়ানুল কোরআন]

সে সময় মানুষের মধ্যে এই ব্যাধি মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ তো মূলপাপেই লিপ্ত হতো। কেউ আবার অন্যপুরুষ বা নারীর প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে তাকাতো। হাদিসে এসেছে–

وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْقَلْبُ يَتَمَنَّى وَيَشْتَهِي

"জিহ্বাও ব্যাভিচার করে। তার ব্যাভিচার হলো কথা এবং অন্তর কামনা বা বাসনা করে।" [মোসতাকরাকে হাকিমঃ খণ্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৪]

এর মধ্যে হাত দিয়ে ছোঁয়া, কুদৃষ্টিতে তাকানো সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মন খুশি করার জন্য কোনো সুদর্শন ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কথাবলাও ব্যভিচার ও সমকামিতার শামিল। অন্তরের ব্যাভিচার হলো কল্পনা করে করে স্বাদ নেয়া। ব্যাভিচারের যেমন ব্যাখ্যা রয়েছে সমকামিতারও ব্যাখ্যা রয়েছে।

[দাওয়াতে আবদিয়্যাতঃ খণ্ডঃ ৯, পৃষ্ঠাঃ ১১৮]

নিজ স্ত্রীকে বলাৎকার করা

স্ত্রীর পায়ুপথে মিলিত হওয়া হারাম। বলাৎকার এমন একটি অভ্যাস যা মানবজাতির বংশধারাকে ধ্বংস করে। পদ্ধতির ফলে মানুষ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা বিকৃত করে তার বিপরীতে অবৈধপথে নিজের চাহিদা পূরণ করে। এজন্য এই কাজের মন্দত্ব ও তার নিন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি মানুষের প্রকৃতিতে মিশে গেছে। পাপিষ্ঠব্যক্তিরাই এমন কাজ করে। তবে তারাও তাকে জায়েজ মনে করে না। যদি তাদেরকে এমন কাজের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে তারা লজ্জায় মৃত্যুকামনা করে। হ্যাঁ, যারা সুস্থপ্রকৃতির ধারা থেকে সরে গেছে তাদের কোনো লজ্জা অবশিষ্ট থাকে না। তারা নিঃসঙ্কোচে এমন কাজে লিপ্ত হয়। [বয়ানুল কোরআনঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১২৯]

বলাৎকারকারীর ওপরে শরিয়ত কোনো কাফফারা নির্ধারণ করেনি। কাফফারা নির্ধারণ না করার কারণ হলো, যেকাজ সত্ত্বাগতভাবে পাপ কাফফারা তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কাফফারা এমন বিষয়ে প্রভাব ফেলে যা সত্ত্বাগতভাবে নির্দোষ কিন্তু প্রাসঙ্গিক কোনো কারণে হারাম হয়েছে। বলাৎকার ও সমকামিতা এমন পাপ যার জন্য শাস্তি নির্ধারিত। কাফফারা যথেষ্ট নয়।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ২৩৬ থেকে ২৩৯]

অধ্যায় । ২৪ ।

গোসল ও পবিত্রতা

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ

ঋতুস্রাবের পর গোসল

ঋতুর রক্তকে আল্লাহতায়ালা অশূচি ও ময়লা বলেছেন। আর যে ময়লা দ্বারা দেহ বারবার মলিন হয় তার দ্বারা মানবাত্মা অপবিত্র হয়। দ্বিতীয়ত রক্ত প্রবাহিত হলে অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মরগগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। যখন গোসল করে তখন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন হয়। রগগুলো সতেজতা ফিরে পায়। তাতে আগের কর্মশক্তি ফিরে আসে।

এই অপবিত্রতার কারণে আল্লাহতায়ালা ঋতুবর্তী নারীদের সম্পর্কে বলেন–

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"কাজেই তোমরা ঋতু অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যাবে।'

[সুরাঃ বাকার, আয়াত: ২২২; আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৭]

বীর্যপাতের পর গোসলের কারণ

বীর্যপাতের পর গোসল ওয়াজিব হওয়া ইসলামিশরিয়তের সৌন্দর্য ও আল্লাহর প্রজ্ঞা, অনুগ্রহ ও কল্যাণকামিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা বীর্য পুরো শরীর থেকে বের হয়। এজন্য আল্লাহ বীর্যের নাম سُلَالَةٍ বা নির্যাস রেখেছেন। বর্ণিত হচ্ছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

"আমি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস দ্বারা।"

[সুরাঃ মোমিনুন, আয়াত:১২]

অর্থাৎ আমি মানুষকে মাটির নির্যাস তথা খাদ্য দ্বারা তৈরি করেছি। প্রথমে মাটি, এরপর তার মাধ্যমে খাদ্যশষ্য হয়। অতঃপর আমি তা থেকে বীর্য তৈরি করি।

[বয়ানুল কোরআনঃ খণ্ডঃ ৭, পৃষ্ঠাঃ ৮৭]

বীর্য মানুষের সারাদেহ থেকে নির্যাসিত। যা সারাদেহে প্রবাহিত হয়ে পেছন দিয়ে নিচে নেমে আসে। যৌনাঙ্গ দ্বারা বের হয়ে যায়। বীর্যপাতের ফলে শরীর অনেক দুর্বল হয়ে যায়। খুব দুর্বলতা অনুভূত হয়। পানি ব্যবহার করলে দুর্বলতা কেটে যায়।

এছাড়া বীর্যপাত হলে শরীরের সমস্ত সূক্ষ্মছিদ্র খুলে যায়। কখনো কখনো ঘাম ঝরে। ঘামের সঙ্গে শরীর অভ্যন্তরীণ কিছু উপাদান বের হয়ে আসে। যা ছিদ্রের

মুখে অবস্থান করে। যদি তা ধোয়া না হয় তাহলে ভয়ংকর রোগ হওয়ার আশংকা আছে। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৮-৩৯]

সহবাসের পর গোসলের উপকারিকতা

মানুষ যখন সহবাস থেকে অবসর হয় তখন তার মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সংকীর্ণ অবস্থার মধ্যে সে পড়ে যায়। চিন্তা ও মানসিক সংকীর্ণতা তাকে পেয়ে বসে। নিজেকে খুব তুচ্ছ ও নিচু মনে হয়। যখন উভয় প্রকার অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। নিজের শরীর ডলে গোসল করে এবং ভালো কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি মাখে তখন সংকীর্ণভাব দূর হয়ে যায়। তার পরিবর্তে অনেক আনন্দ ও সতেজতা অনুভূত হয়। প্রথম অবস্থাকে حَدَث বা অপবিত্র বলে। দ্বিতীয় অবস্থাকে طَهَارَة বা পবিত্র বলে।

বীর্যপাতের ফলে শরীরে ক্লান্তি, দুর্বলতা ও অলসতা সৃষ্টি হয়। গোসলের ফলে অন্তরে শক্তি, প্রফুল্লতা ও আনন্দ সঞ্চারিত হয়। শরীর সতেজ হয়। হজরত আবুজর [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, ফরজ গোসলের পর মনে হয় যেনো নিজের ওপর থেকে পাহাড় নামানো হলো। এটা প্রত্যেক সুস্থপ্রকৃতি ও স্বভাবের অধিকারী মানুষ অনুভব করে।

অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ লিখেন, সহবাসের পর গোসল করলে তা দেহের ক্ষয় হওয়া শক্তি ফিরিয়ে আনে। দুর্বলতা দূর করে। ফরজ গোসল দেহ ও আত্মার জন্য অত্যন্ত উপকারী। গোসল না করে অপবিত্র অবস্থায় থাকা দেহ ও আত্মার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই গোসলের উপকারিতা সম্পর্কে বিবেক ও সুস্থপ্রকৃতির যথেষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। [আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৮-৩৯]

অন্যান্য উপকারিতা

গোসল ফরজ হলে ফেরেশতারা অনেক দূরে চলে যায়। গোসল করলে দূরত্ব দূর হয়। এজন্য অনেক সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে, মানুষ ঘুমালে তার আত্মা আকাশে উঠে যায়। যদি পবিত্র হয় তাহলে সেজদা করার অনুমতি পায়। আর অপবিত্র [গোসল ফরজ] হলে সেজদা করার অনুমতি পায় না। এ কারণে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] বলেন, 'যদি অপবিত্র শরীরে ঘুমাতে হয় তাহলে অন্তত ওজু করে নেবে।'

সহবাসের দ্বারা মানুষ আনন্দ পায়। আনন্দে ডুবে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়। এটা দূর করার জন্য গোসল করা হয়।

[আল মাসালিহুল আকলিয়্যাঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোসলের স্থান ও পদ্ধতি

গোসল দাঁড়িয়ে করবে না বসে

গোসল এমন স্থানে করা উচিত যেখানে তাকে কেউ দেখবে না। যদি এমন নির্জন স্থানে গোসল করে যেখানে কেউ তাকে দেখে না তবে সেখানে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যাবে। চাই দাঁড়িয়ে গোসল করুক বা বসে গোসল করুক; গোসলখানা ছাদ ঢাকা থাকুক বা না থাকুক কিন্তু বসে গোসল করা উত্তম। কেননা এতে পর্দা বেশি রক্ষা পায়। কিন্তু নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর অন্যনারীর সামনে খোলাও গোনাহ্। বেশিরভাগ মহিলা অন্যনারীর সামনে পুরো উলঙ্গ হয়ে গোসল করে। এটা খুব লজ্জার কথা। [বেহেশতি জেওর: পৃষ্ঠা: ৫২]

প্রশ্ন : পুরুষ ও নারীদের জন্য দাঁড়িয়ে বা বসে গোসল করার বিধানের ব্যাপারে আলেমগণ কি একমত না মতভিন্নতা আছে? জানা যায়, রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] হজরত আয়েশা [রদিয়াল্লাহু আনহা]-কে বসে গোসল করতে বলেন।

উত্তর : পুরুষ ও নারীদের গোসল করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওলামায়েকেরাম একমত। তাহলো, দাঁড়িয়ে ও বসে উভয়ভাবেই জায়েজ। তবে পর্দার কথা বিবেচনা করে বসে গোসল করা উত্তম।

মুফাসসিরগণ أَنَّى شِئْتُمْ -এর ব্যাখ্যা করেছেন مِنْ قِيَامٍ وَقُعُوْدٍ দাঁড়িয়ে বা বসে। আর গোসলের অবস্থান তো আরো নিচে। অর্থাৎ যেখানে সঙ্গমই দাঁড়িয়ে বসে উভয়ভাবে করা জায়েজ সেখানে গোসল আরো ভালোভাবে জায়েজ।

মাসয়ালা : যদি কারো ওপর গোসল করা ফরজ হয় এবং সে গোসল করার জন্য কোনো আড়াল না পায়। তখন শরিয়তের বিধান হলো, পুরুষের সামনে পুরুষের উলঙ্গ হয়ে [প্রয়োজনে] গোসল করা ওয়াজিব। এমনিভাবে নারীর সামনে নারীর উলঙ্গ হয়ে [প্রয়োজনে] গোসল করা ওয়াজিব। আর পুরুষের সামনে নারীর এবং নারীর সামনে পুরুষের গোসল করা হারাম বরং এমন সময় তায়াম্মুম করবে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ২৯১]

গোসলের সুন্নতপদ্ধতি

গোসলকারীর প্রথমকাজ উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। এরপর লজ্জাস্থান ধোয়া। হাতে ও লজ্জাস্থানে নাপাকি থাকুক বা না থাকুক। এরপর শরীরের কোথাও নাপাকি থাকলে তা দূর করা। এরপর ওজু করা। যদি কোনো চৌকি বা পাথরের ওপর অর্থাৎ এমন স্থানে গোসল করে যেখানে পানির ছিটা আসে না, গড়িয়ে চলে যায় তবে ওজু করার সময় পাও ধুয়ে নেবে। আর যদি এমন স্থান হয় যেখানে পায়ে পানি লাগে তবে গোসলের পর আবার পা ধুতে হবে। সুতরাং এমন অবস্থায় ওজু করবে কিন্তু প্রথমে পা ধুবে না। ওজুর পর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে। এরপর তিনবার ডান কাধে। তিনবার বাম কাধে। এরপর এমনভাবে পানি ঢালবে যেনো সারাশরীরে পানি গড়িয়ে পড়ে। এরপর ওইস্থান থেকে সরে অন্যস্থানে গিয়ে পা ধুবে। যদি ওজুর সময় পা ধোয়া হয় তাহলে ধোয়ার দরকার নেই। গোসল করার সময় প্রথমে সারা শরীরে ভালোভাবে হাত বুলাবে এরপর পানি ঢালবে যেনো সবজায়গায় ভালোভাবে পানি পৌঁছে যায়। হজরত থানভি [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] বলেন, আমি গোসলের উত্তমপদ্ধতি বর্ণনা করলাম। এটাই সুন্নতিগোসল। এখানে কিছু জিনিস ফরজ। যা ছাড়া গোসল হয় না। মানুষ অপবিত্র থেকে যায়। কিছু জিনিস সুন্নত। যা করলে সোয়াব পাওয়া যায়। না করলেও ওজু হয়ে যায়।

গোসলের ফরজ তিনটি–

১. এমনভাবে কুলি করা যেনো সারা মুখে পানি পৌঁছে যায়।

২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি দেয়া এবং

৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫২]

গোসলের সময় দোয়া ও জিকির

যখন সারাশরীরে পানি পৌঁছে যায় তখন কুলি করে নাকে পানি দিলে ওজু হয়ে যায়। ওজুর নিয়ত করুক বা না করুক।

এমনিভাবে গোসলের সময় কালেমা পড়া বা পড়ে পানিতে ফু দেয়া আবশ্যক নয়। মন চাইলে পড়বে নয়তো পড়বে না। সর্বাবস্থায় মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। বরং গোসলের সময় কালেমা বা অন্যকোনো দোয়া না পড়াই উত্তম। গোসলের সময় কোনো কিছু পড়ার প্রমাণ শরিয়তে নেই। এই জন্য গোসলের সময় কিছু পড়বে না। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৭]

গোসলের সময় কথা বলা

গোসলের সময় বিনা প্রয়োজনে কথা বলা উচিত নয়।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৬]

প্রশ্নঃ 'আগলাতুল আওয়াম' গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, গোসলখানা ও পায়খানায় গিয়ে কথা বলা মানুষ হারাম মনে করে। অথচ এর কোনো ভিত্তি নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না।
মেশকাতশরিফে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে–

لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ

"দুইজন ব্যক্তি যেনো একসঙ্গে তাদের সতর [যে স্থান ঢেকে রাখা আবশ্যক] খুলে পরস্পর কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কেননা এতে আল্লাহতায়ালা ক্রুদ্ধ হন।"
এই হাদিস দ্বারা জানা যায়, সতর খুলে কথা বললে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন। গোসলখানা, বিশেষ করে পায়খানায় সতর খোলা থাকে।
উত্তর : এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য দুইব্যক্তি এমনভাবে উলঙ্গ হওয়া যাতে একজন অপরজনের লজ্জাস্থান দেখতে পায়। নয়তো দুইব্যক্তির কথা বলতো না। বাক্যটা হতো এমন, اَلرَّجُلُ يَضْرِبُ الْغَائِطَ

[ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৫৮]

মোটকথা, বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে না। প্রয়োজনে কথা বলার অবকাশ আছে।

গোসলের সময় নারীদের লজ্জাস্থানের বাইরের অংশ ধোয়াই যথেষ্ট

প্রশ্ন : গোসলের সময় নারীদের যোনিপথের ভেতরের অংশ আঙ্গুল দিয়ে তিনবার পবিত্র করা ফরজ না সুন্নত? এভাবে পবিত্র করা ছাড়া গোসল হয় কী না। অনেক আলেম বলেন, যোনিপথের ভেতরের অংশ আঙ্গুল দিয়ে পরিষ্কার না করলে গোসল হবে। তাদের কথা সঠিক না ভুল?
উত্তরঃ এমন করা ফরজও নয়, সুন্নতও নয়। আবশ্যক বলা ভুল।

فِى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ لَا تُدْخِلُ اِصْبَاعَهَا فِىْ قُبُلِهَا بِهٖ يُفْتٰى

"নারীরা লজ্জাস্থানে আঙ্গুল ঢুকাবে না। এটার ওপরই ফতোয়া।'

[ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৪]

গোসলের সময় চুলের খোঁপা খোলার প্রয়োজন নেই

যদি চুলের খোঁপা করা না থাকে তাহলে সমস্ত চুল এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক। যদি একটি চুলের গোড়া পরিমাণ শুকনো থাকে তবে গোসল

হবে না। কিন্তু চুল যদি খোপা করা থাকে তবে চুল ভেজানো আবশ্যক নয়। কিন্তু চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। পশমের একটি গোড়াও যেনো শুকনো না থাকে। খোপা না খুলে যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো না যায়, তবে খোপা খুলে ফেলবে এবং চুল ভেজাবে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৭]

প্রশ্ন : যখন গোসল ফরজ হয়, তখন নারীর চুল খোলা ছিলো। পরে চুল খোপা করে। এখন এই নারীর জন্য গোসলের সময় চুলের গোড়া ভেজানো যথেষ্ট না-কি খোপা খোলা ওয়াজিব? সম্ভবত হায়েজের গোসলের সময় চুলের খোপা ভিজিয়ে নেয়া এবং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানোই যথেষ্ট। স্ত্রীসহবাস এবং ঋতুপরবর্তী গোসলের মধ্যে সম্ভবত কোনো পার্থক্য নেই। শরিয়তের সঠিক বিধান কী?

উত্তর :

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُوْلَ الشَّعْرِ

"চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলে গোসলের সময় নারীদের জন্য চুলের খোপা বা বেণী খোলা আবশ্যক নয়।' [হেদায়: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১১]

ওইউদ্ধৃতি দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝা যায়। **এক.** গোসলের সময় চুল বাঁধা থাকলে খোলা আবশ্যক নয়। চাই, গোসল ফরজ হওয়ার সময় চুল থাকুক না কেনো। **দুই.** ফরজ গোসলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গোসল স্ত্রীসহবাসে পরের হোক বা হায়েজের হোক। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৪]

কিছু প্রয়োজনীয় কথা

১. গোসল করার সময় কেবলার দিকে মুখ করবে না।

২. পানি বেশি খরচ করবে না। আবার এতো কমও ব্যবহার করবে না যে, গোসল ভালোভাবে করা না যায়।

৩. গোসলের পর কোনো কাপড় দিয়ে শরীর মুছে নেবে এবং খুব দ্রুত শরীর ঢেকে নেবে। ওজু করার সময় যদি পা ধোয়া না হয়, তবে গোসলের স্থান থেকে সড়ে গিয়ে প্রথমে শরীর ঢাকবে এরপর পা ধুবে।

৪. নাকফুল, কানের দুল ও হাতের চুড়ি খুব ভালোভাবে নাড়াবে। যেনো ছিদ্রের মধ্যে ভালোভাবে পানি পৌঁছে যায়। যদি কানে দুল না-ও থাকে তবুও ছিদ্রের মধ্যে ভালোভাবে পানি পৌঁছাবে। এমন যেনো না হয় পানি পৌঁছলো না এবং গোসল হলো না। আংটি ও চুড়ি ঢিলা হলেও নাড়াবে, তবে নাড়ানো ওয়াজিব নয়, মোস্তাহাব। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাদের ওপর গোসল ফরজ

কিছু জরুরি পরিভাষা

যৌন উত্তাপের শুরু দিকে যে পানি বের হয় এবং যা বের হওয়ার পর উত্তাপ কমে যায় না বরং বেড়ে যায় তাকে মজি বা কামরস বলা হয়। পরিতৃপ্ত হওয়ার পর উত্তাপ শেষে যে পানি বের হয় তাকে মনি [বীর্য] বলা হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও চেনার উপায় হলো, মনি বের হওয়ার পর তৃপ্তি আসে। উত্তাপ শেষ হয়ে যায়। আর কামরস বের হওয়ার পর উত্তাপ কমে না বরং বেড়ে যায়। মজি পাতলা হয়, মনি গাঢ় হয়।

মজি বের হলে গোসল ফরজ হয় না কিন্তু ওজু ভেঙ্গে যায়। বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হয়।

১. ঘুমে বা জাগ্রত অবস্থায় যৌনউত্তাপের সঙ্গে বীর্য বের হলে নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর গোসল ওয়াজিব। চাই তা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে হোক বা শুধু চিন্তা ও কল্পনার কারণে হোক। যেভাবেই বের হোক–সর্বাবস্থায় গোসল ওয়াজিব।

২. যখন পুরুষের যৌনাঙ্গের সুপারি [পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ] ভেতরে প্রবেশ করে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন মনি বের না হলেও গোসল ওয়াজিব। সুপারি নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলেও গোসল ফরজ। আবার পায়ুপথে প্রবেশ করলেও গোসল করা ফরজ। তবে, পায়ুপথে মিলিত হওয়া অনেক বড়ো গোনাহের কাজ।

৩. নারীর সামনের রাস্তা দিয়ে প্রতিমাসে যে রক্ত বের হয় তাকে হায়েজ বলে। হায়েজ বন্ধ হলে তাদের উপর গোসল করা ওয়াজিব। সন্তান প্রসব করার পর যে স্রাব বের হয় তাকে নেফাস বলে। নেফাস বন্ধ হলেও গোসল করা ওয়াজিব।

মূলকথা চার জিনিস দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়–

১. যৌনউত্তাপের সঙ্গে বীর্য বের হলে।

২. পুরুষের সুপারি ভেতরে চলে গেলে।

৩. হায়েজের রক্ত বন্ধ হলে।

৪. নেফাসের রক্ত বন্ধ হলে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৫]

চার কারণে গোসল ফরজ হয়

১. যৌনউত্তাপের সময় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শরীর থেকে বীর্য বের হওয়া। ঘুমে থাকুক বা জাগ্রত। হুঁশে থাকুক বা বেহুঁশ হোক। কোনো চিন্তা বা কল্পনা করে। বিশেষ অঙ্গ নাড়াচাড়া করে বা অন্যউপায়ে।

২. যৌনউত্তাপের সঙ্গে কোনো পুরুষের যৌনাঙ্গের মাথা কোনো জীবিত নারীর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করা বা কোনো মানুষের পায়ুপথে প্রবেশ করা; সে পুরুষ হোক বা নারী অথবা হিজড়া হোক; বীর্য বের হোক বা না হোক– উভয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে উভয়ের ওপর গোসল ফরজ। নয়তো শুধু প্রাপ্তবয়স্কব্যক্তির উপর।

৩. ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর।

৪. নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর। [বেহেশতি জেওর]

জরুরি মাসয়ালা

১. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সঙ্গে কেউ সহবাস করলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু অভ্যাস করার জন্য গোসল করবে। পুরুষের উপর গোসল করা ওয়াজিব।

২. যদি সামান্য পরিমাণ বীর্য বের হয়, এরপর গোসলের পর পুনরায় মনি বের হয়, তবে আবার গোসল করা ওয়াজিব।

৩. যদি গোসলের পর স্ত্রীর যৌনাঙ্গ দিয়ে স্বামীর বীর্য বের হয়, যা ভেতরে থেকে গিয়েছিলো তবে গোসল করতে হবে না। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৫]

৪. **প্রশ্ন :** কেউ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলো। এরপর প্রস্রাব করে ভালোভাবে গোসল করে নেয়। এরপর যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন আবার বীর্য বা কামরসের ফোটা আসে। এমন ব্যক্তির উপর কি গোসল করা ওয়াজিব?

উত্তর: সে সময় যদি তার যৌনাঙ্গ উত্তপ্ত না হয়, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যৌনাঙ্গ উত্তপ্ত হলে এবং তার মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি হলে গোসল করা ওয়াজিব। [ইমদাদুল ফতোয়া]

৫. যদি কারো যৌনাঙ্গ দিয়ে কিছু বীর্য বের হয় এবং সে গোসল করে নেয়। গোসলের পর তার যৌনাঙ্গ দিয়ে আবার কিছু বীর্য বের হয় তখন তার প্রথম গোসল বাতিল হয়ে যাবে এবং তার উপর দ্বিতীয়বার গোসল করা ফরজ। শর্ত হলো, অবশিষ্ট বীর্য ঘুমানো, পেশাব করা এবং চল্লিশ পা বা তার চেয়ে বেশি হাঁটার আগে বের হতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বীর্য বের হওয়ার আগে সে যদি কোনো নামাজ আদায় করে থাকে, তবে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৬. পেশাবের পর বীর্য বের হলেও গোসল ফরজ হবে। যদি তা যৌনউত্তাপের সঙ্গে বের হয়। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ২৮৮]

যে অবস্থায় গোসল ফরজ নয়

১. বীর্য যদি যৌনউত্তাপের সঙ্গে বের না হয় তবে গোসল ফরজ নয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি বোঝা উঠাচ্ছে বা ওপর থেকে পড়ে গেলো, কেউ তাকে আঘাত করলো বা ব্যথার কারণে তার বীর্য যৌনউত্তাপ ছাড়াই বের হয়ে গেলো, তবে তার ওপর গোসল ফরজ নয়।

২. যদি কোনো পুরুষ নিজের বিশেষ অঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে সহবাস করে, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। শর্ত হলো, কাপড় এতো মোটা হবে যে, শরীরের উত্তাপ ও সহবাসের মজা পাওয়া যায় না। সতর্কতা হলো, সুপারি প্রবেশের কারণে গোসল ওয়াজিব হবে।

৩. যদি কোনো পুরুষ সুপারির অংশের চেয়ে কম পরিমাণ প্রবেশ করায় তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।

৪. কামরস ও রোগজনিত পানি বের হওয়ার দ্বারা গোসল ফরজ হয় না।

৫. অনিয়মিত ঋতুর দ্বারা গোসল ফরজ হয় না।

৬. যেব্যক্তির সবসময় বীর্য বের হওয়ার রোগ আছে, বীর্য বের হওয়ার দ্বারা তার গোসল ওয়াজিব হবে না।

স্বপ্নদোষের মাসয়ালা

১. ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলে যদি শরীরে বা কাপড়ে বীর্য লেগে থাকতে দেখে তবে গোসল করা ওয়াজিব। চাই ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখুক বা না দেখুক।

২. স্বপ্নে পুরুষের পাশে বা নারীর পাশে শুতে দেখে বা সহবাসের স্বপ্ন দেখে এবং আনন্দ পায় কিন্তু বীর্য বের হয় না, তবে গোসল করা ওয়াজিব নয়। আর বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে। যদি কাপড়ে আর্দ্রতা অনুভূত হয় কিন্তু মনে করতে পারে না বা বুঝতে পারে না এটা মনি [বীর্য] না মজি [বীর্য থেকে পাতলা শুক্ররস যা বীর্য বের হওয়ার আগে বের হয়], তখনও গোসল করা ওয়াজিব।

৩. স্বামী-স্ত্রী দু'জন এক খাটে শুয়ে আছে। ঘুম ভেঙ্গে বিছানার চাদরে বীর্যের দাগ দেখে কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কেউ স্বপ্ন দেখার কথা মনে করতে পারে না, তখন উভয়ে গোসল করে নেবে। কেননা জানা নেই কার বীর্য।

৪. অসুস্থতা ও অন্যকোনো কারণে কোনোপ্রকার কামভাব ও উত্তেজনা ছাড়া নিজে নিজে বীর্য বের হয়ে আসলে গোসল ওয়াজিব নয়। তবে ওজু ভেঙ্গে যাবে।

[বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৬]

পানির মতো পাতলা মনি ও মজির বিধান

প্রশ্ন: একব্যক্তির বীর্য অনেক পাতলা। সে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ করার সময় তার বীর্য ক্ষিপ্রতা ছাড়া বের হয়ে যায়। এই ব্যক্তি কি গোসল করা ছাড়া নামাজ আদায় করতে পারবে না-কি গোসল করা ওয়াজিব?

উত্তম : গোসল করা ওয়াজিব। [ইমদাদুল ফতোয়া: পৃষ্ঠা: ৫৭]

প্রশ্ন : বর্তমানে স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে বীর্য অনেক পাতলা হয়। যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় তবে কি ঘষা ও ডলার দ্বারা কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে না-কি ধোয়ার প্রয়োজন আছে? মজি যদি কাপড়ে লাগে তবে তা ঘষে উঠালে যথেষ্ট না-কি ধোয়া আবশ্যক?

উত্তর : 'দুররে মুখতার' গ্রন্থের প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী বীর্য পাতলা হলে ঘষার দ্বারা পবিত্র হয়। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় মজি ধোয়া ওয়াজিব। [ইমদাদুল ফতোয়া: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২৪]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যাদের ওপর গোসল ওয়াজিব তাদের জন্য কিছু বিধান

১. যার ওপর গোসল করা ওয়াজিব তার জন্য কোরআনশরিফ ছোঁয়া, তেলওয়াত করা, মসজিদে যাওয়া নাজায়েজ।

২. আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা, কালেমা পড়া, দরুদশরিফ পড়া জায়েজ।

৩. তাফসিরের গ্রন্থাদি ওজু ও গোসল ছাড়া ছোঁয়া মাকরুহ। অনুবাদসহ কোরআনশরিফ ছোঁয়া সম্পূর্ণ হারাম। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৭৬]

৪. যে নারী হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় থাকে অথবা তার ওপরে গোসল করা ফরজ– তার জন্য মসজিদের যাওয়া, কাবাশরিফ তওয়াফ করা, কোরআনশরিফ তেলাওয়াত করা এবং ছোঁয়া অবৈধ।

৫. যদি কোরআনশরিফ গেলাফ বা রুমাল জড়ানো থাকে তবে কোরআনশরিফ ছোঁয়া ও উঠানো জায়েজ।

৬. জামার হাতা দিয়ে এবং পরিহিত উড়নার আঁচল দিয়ে কোরআনশরিফ ধরা ও উঠানো বৈধ নয়, তবে শরীর থেকে পৃথক কোনো কাপড় হলে যেমন, রুমাল ইত্যাদি দিয়ে উঠানো জায়েজ।

৭. যদি পুরো সুরা ফাতেহা দোয়ার নিয়তে পড়ে এবং এমন অন্যান্য দোয়া যা কোরআনশরিফে এসেছে তা দোয়ার নিয়তে পড়ে, তেলওয়াতের নিয়তে না পড়ে তবে জায়েজ। তাতে কোনো গোনাহ হবে না। দোয়ায়ে কুনুত পড়াও জায়েজ।

৮. কালেমা ও দরুদশরিফ পড়া, আল্লাহর নাম নেয়া অথবা অন্যকোনো ওজিফা পড়া জায়েজ।

৯. যদি কোনো নারী মেয়েদের কোরআনশরিফ পড়ায়, এমন অবস্থায় তার জন্য থেমে থেমে পড়া জায়েজ। সে নাজেরা (দেখে) পড়ানোর সময় এক আয়াত পুরো পড়বে না, বরং এক দুই শব্দর পর শ্বাস ছেড়ে দেবে। থেমে থেমে আয়াত বলে দেবে।

১০. হায়েজের সময় মোস্তাহাব হলো, নামাজের সময় হলে ওজু করে কোনো পবিত্র স্থানে কিছুক্ষণ বসে বসে আল্লাহর জিকির করবে। যাতে নামাজের অভ্যাস ছুটে না যায়। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৬৩]

মূলবিধান

১. জুনুবি ব্যক্তি [যার উপর গোসল ফরজ] ও হায়েজামহিলার জন্য কোরআনশরিফ পড়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। এটাও জানা গেছে যে, একআয়াত পুরোপুরি পড়া নাজায়েজ।

২. হাদিস পড়া জায়েজ। এ ব্যাপারেও কোনো মতভিন্নতা নেই।

৩. একআয়াতের কম পড়া কোনো কোনো ফকিহ'র কাছে নাজায়েজ।

৪. যদি কোরআনশরিফ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে পড়া না হয় বরং দোয়ার উদ্দেশ্যে পড়া হয় এবং তাতে দোয়ার অর্থ থাকে তবে অধিকাংশ আলেমের কাছে জায়েজ। কেউ কেউ এর উপর ফতোয়া দেননি।

৫. আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য কোরআন-হাদিসের দোয়াসমূহ হায়েজানারী পড়তে পারবে। তবে কোরআনে বর্ণিত দোয়াগুলো দোয়ার নিয়তে পড়বে। তেলওয়াতের নিয়তে পড়বে না। যেখানে এই সতর্কতার ভরসা পাওয়া না যায় সেখানে নিষেধ করাই নিপারদ।

জুনুবি [যার ওপর গোসল ফরজ] ও হায়েজার বিধানে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের বিধানসমূহ এক। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৯০]

নাপাকশরীরে চুল ও নখ কাটা মাকরুহ

প্রশ্ন : জুনুবি [যার ওপর গোসল ফরজ] অবস্থায় গোঁফ ছাটা, চুল কাটা, নখ কাটা জায়েজ আছে কী? এই বক্তব্য কি ঠিক, যদি এমন অবস্থায় গোসলের আগে চুল ও নখ কাটা হয় তবে চুল ও নখ অপবিত্র থেকে যাবে। কেয়ামতের দিন তারা অভিযোগ করবে– আমাদেরকে অপবিত্র অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

উত্তর : 'হেদায়াতুন নুর' গ্রন্থে মাওলানা সাদুল্লা লিখেন, 'অপবিত্র অবস্থায় গোঁফ ও নখ কাটা মাকরুহ।'

এর দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়টি মাকরুহ বলে জানা যায়। কিন্তু তার পেছনে যে দলিল দেয়া হয়েছে কোথাও তার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বাহ্যত এটা ঠিকও নয়। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৫৮]

'তাহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ' গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্ট মাকরুহ বলা হয়েছে। এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, জুনুবি [যার ওপর গোসল ফরজ] অবস্থায় যে চুল কাটা হবে কেয়ামতের দিন তা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে।

يُكْرَهُ قَصُّ الْأَظْفَارِ فِيْ حَالَتِ الْجَنَابَةِ كَذَا إِزَالَةُ الشَّعْرِ لِمَا رَوٰى خَالِدٌ مَرْفُوْعًا مَنْ تَنَوَّرَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ جَاءَتْهُ كُلُّ شَعْرَةٍ فَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلْهُ لِمَ ضَيَّعَنِيْ وَلَمْ يَغْسِلْنِيْ كَذَا فِيْ شَرْحِ شِرْعَةِ الْإِسْلَامِ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوٰى وَغَيْرِه

"জুনুবি [যার ওপর গোসল ফরজ] অবস্থায় নখকাটা মাকরুহ। এমনিভাবে চুলকাটাও। প্রমাণ যা খালেদ থেকে 'মারফু' সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেব্যক্তি [ফরজ] গোসল করার আগে পরিচ্ছন্ন হয় [শরীরের অবাঞ্ছিত লোম থেকে] কেয়ামতের দিন তার প্রত্যেকটি চুল উপস্থিত হবে এবং অভিযোগ করবে, হে আল্লাহ! কেনো আমাকে পবিত্র না করে কাটা হলো?" [মারাকিল ফালাহঃ পৃষ্ঠাঃ ২৮৬]

গোসল করলে যদি রোগের ভয় থাকে

১. যদি অসুস্থতার কারণে পানি ক্ষতিকর হয় অর্থাৎ ওজু বা গোসল করলে রোগের প্রকটতা বেড়ে যাবে বা সুঁস্থ হতে দেরি হবে তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। কিন্তু যদি ঠাণ্ডা পানি ক্ষতিকর হয়, গরম পানিতে সমস্যা না থাকে তবে পানি গরম করে গোসল করা ওয়াজিব। এরপরও যদি গরম পানি পাওয়া না যায় তখন তায়াম্মুম করা যাবে।

২. যেভাবে ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ তেমনিভাবে অপারগতার সময় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ। এমনিভাবে যেনারী ঋতু ও নেফাস থেকে পবিত্র হয়েছে তার জন্য অপারগ হলে তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। ওজু ও গোসলের তায়াম্মুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের পদ্ধতি এক।

৩. তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো, পবিত্র মাটির ওপর দুই হাত রাখবে, এরপর সেখান থেকে হাত উঠিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাছেহ করবে। দ্বিতীয়বার পুনরায় মাটির ওপর দুই হাত রাখবে এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। চুড়ি, কঙ্কণ ইত্যাদির নিচের অংশ ভালোভাবে মাসেহ করবে। যদি তার ধারণা অনুযায়ী এক নখ পরিমাণ জায়গাও শুকনো থাকে তবে তায়াম্মুম হবে না। আংটি খুলে ফেলবে যেনো তার নিচের অংশ বাকি না থাকে। যখন এই দুটি কাজ করবে তখন তায়াম্মুম সম্পন্ন হবে। মাটিতে হাত রাখার পর হাতে মাটি লাগলে তা ঝেড়ে ফেলবে যেনো মুখে মাটি লেগে না যায়।

৪. যদি গোসল করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় আর ওজু করা ক্ষতিকর না হয় তবে তায়াম্মুম করবে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতাস্বরূপ ওজু করবে। যদি কারো ওজু ও গোসল উভয়ের প্রয়োজন হয় এবং উভয়টার ব্যাপারে অপারগ হয়। তবে সে একবারই তায়াম্মুম করবে, দুইবার করার প্রয়োজন নেই।

[বেহেশতি জেওরঃ পৃষ্ঠাঃ ৬৮]

রেলভ্রমণের সময় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার বিধান

প্রশ্নঃ রেল ইত্যাদিতে ভ্রমণ করার সময় যদি গোসলের প্রয়োজন হয় এবং পানি না পাওয়া যায় তখন তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করা যাবে কী-না? স্টেশনে যদিও প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায় কিন্তু রেলে গোসল করা কঠিন। এমন অবস্থায় তায়াম্মুমের সুযোগ আছে কি?

উত্তরঃ স্টেশনে গোসল করা কঠিন নয়। প্লাটফর্মে লুঙ্গি [বা কোনো কাপড়] টানিয়ে বসে ভিস্তিকে টাকা দিয়ে বলবে মশক দিয়ে ওপর থেকে পানি ঢেলে দিতে। এর আগে রেলের গোসলখানা বা টয়লেটে গিয়ে উরু ও শরীর পবিত্র করে নেবে। পাত্রে পানি নিয়ে অথবা যদি পানির পাইপ থাকে তবে রেলের গোসলখানা ও টয়লেটে গোসল করা সম্ভব। শুধু সাহসের প্রয়োজন। এমন অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৭৫]

লিকুরিয়া বা ক্ষয়রোগের বিধান

প্রশ্নঃ অধিকাংশ নারীর সাদা তরল পদার্থ সবসময় ঝরতে থাকে। তা কি পবিত্র, না অপবিত্র? এমন অবস্থায় নামাজ বৈধ কি? তা বের হলে ওজু ভেঙ্গে যায় না থাকে?
উত্তর : যোনিপথে নির্গত পদার্থ তিন প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের বিধান ভিন্ন।
১. যা যোনিপথের বাইরের অংশ থেকে বের হয়– তা মূলত ঘাম। শরিয়তের দৃষ্টিতে তা পবিত্র।
২. যা যোনিপথের ভেতর অর্থাৎ তার প্রথম অংশ জরায়ু থেকে বের হয়– এমন পদার্থকে কামরস ও রোগজনিত রস বলা হয়। তা অপবিত্র।
৩. যা যোনিপথের মূল ভেতর থেকে বের হয়। এর পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে– তা ঘাম না কামরস। তার অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। সতর্কতা হলো অপবিত্র ধরা।

মূলকথাঃ
১. যৌনাঙ্গের বাইরের অংশ যা গোসলের সময় ধোয়া ফরজ, তা থেকে নির্গত তরল পদার্থ পবিত্র।
২. যৌনাঙ্গের ভেতরের অংশ যা গোসলের সময় ধোয়া আবশ্যক নয়, তা থেকে নির্গত তরল পদার্থ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। সতর্কতা হলো অপবিত্র ধরা।
৩. যে অংশ যৌনাঙ্গের ভেতরও নয় বাইরও নয়, বরং ভেতরের প্রথম অংশ জরায়ু। তা থেকে নির্গত তরলপদার্থ অপবিত্র।
যৌনাঙ্গের মূল ভেতরের ব্যাপারে ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মত হলো, তা পবিত্র। ইমাম আবুইউসুফ ও মোহাম্মদ [রহিমাহুমাল্লাহ]-এর মতে অপবিত্র।
প্রশ্নেযুক্ত আর্দ্রতা–নারীরা যে বিষয়ে সাধারণত অভিযোগ করে তা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা অপবিত্র।
তবে গবেষকগণ নিশ্চিত হন যে, এটা প্রথম প্রকার তাহলে পবিত্র হবে। আর যদি তৃতীয় প্রকারের প্রমাণ পান তাহলে সতর্কতাস্বরূপ তা ওজু ভঙ্গকারী ও অপবিত্র ধরা হবে। আর যদি সবসময় ঝরতে থাকে তবে তা অপারগতা ধরে নেয়া হবে। [ইমদাদুল ফতোয়াঃ পৃষ্ঠাঃ ১০৮, ১১২ ও ১২১]

সারকথা

যে তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ে, তা যেখান থেকেই নির্গত হোক–অপবিত্র ও ওজু ভঙ্গকারী। নারীদের অধিকাংশ সময় যে সাদা পদার্থ ঝরে তা অপবিত্র ও ওজু ভঙ্গকারী। যখন তা গড়িয়ে যৌনাঙ্গের বাইরে চলে আসে তখন ওজু ভেঙ্গে যাবে। যৌনাঙ্গের ভেতরের যে পদার্থ নিয়ে ইমাম আবুহানিফা [রহমাতুল্লাহি আলায়হি] এবং ইমাম আবুইউসুফ ও মোহাম্মদ [রহিমাহুমাল্লাহ]-এর মাঝে মতভেদ রয়েছে তা নিজে নিজে কখনো বের হয় না। কিন্তু এই সাদাপদার্থ সবসময় ঝরতে থাকলে নারীকে অপারগ ধরা হবে।

[ইমদাদুল ফতোয়া; খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১১২]

অপারগব্যক্তির পরিচয় ও তার বিধান

১. যেব্যক্তির এমন কোনো ক্ষত থাকে যা থেকে সবসময় [রক্ত বা রস] ঝরতে থাকে, কখনো বন্ধ হয় না অথবা কোনো নারীর লিকুরিয়া বা ক্ষয়রোগ থাকে, যা থেকে সবসময় রস ঝরতে থাকে অথবা প্রস্রাবের দোষ থাকে– সবসময় ফোটা পড়তে থাকে; এতোটুকু অবসর পায় না যে, পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করবে।

২. কোনো মানুষকে তখনই অপারগ ধরা হবে যখন তার ওপর পুরো একওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। অথচ এতোটুকু সময় পায় না যখন পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করবে। যদি সে পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করার সুযোগ পায় তবে তাকে অপারগ ধরা হবে না। যখন একওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ সে নামাজ আদায়ের সুযোগ পায় তখন সে অপারগ বলে গণ্য হবে না। তার বিধান হলো, সে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন ওজু করবে। এরপর যখন নতুন ওয়াক্ত আসবে তখন তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া শর্ত নয়, বরং পুরো সময়ে যদি একবার বের হয়ে বন্ধ হয়ে যায় তবুও তাকে অপারগ ধরা হবে। কিন্তু পরে যদি পুরো একওয়াক্ত সময় রক্ত বের না হয় তবে সে আর অপারগ গণ্য হবে না।

৩. অপারগব্যক্তির বিধান হলো, সে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওজু করবে। যতোক্ষণ ওয়াক্ত থাকবে ততোক্ষণ ওজু থাকবে। কিন্তু নির্ধারিত রোগ ছাড়া অন্যকানো ওজুভাঙ্গার কারণ পাওয়া গেলে ওজু ভেঙ্গে যাবে। পুনরায় ওজু করতে হবে। যখন এই ওয়াক্ত শেষ হবে তখন অন্যওয়াক্তের জন্য ওজু করবে। এরপর যখন সে ওয়াক্ত শেষ হবে তখন নতুন ওয়াক্তের জন্য ওজু করবে। এভাবে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ওজু করবে। এই ওজু দ্বারা ফরজ ও নফল যে নামাজ ইচ্ছা পড়বে। [বেহেশতি জেওর: খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৫৪]

সমাপ্ত